একটি সোনা মন

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং সম্প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি ॥

তপতী রায়

শ্রীগুরু লাইব্রেরী

কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি. এস্.-সি.
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর :
শ্রীনিত্যানন্দ পাত্র
ভারতী প্রেস
১৪, হরিপদ দত্ত লেন
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদশিল্পী :
শ্রীফণীভূষণ মজুমদার

প্রচ্ছদমুদ্রণ :—
ফাইন প্রিণ্টার্স প্রাঃ লিঃ

মূল্য—৬·০০

একটি সোনা মন

রচনাকাল—১৩৬২

লেখিকার অন্যান্য রচনা

সকালের সাতরং

আরেক আকাশ (যন্ত্রস্থ)

কুয়াশার স্বপ্ন (যন্ত্রস্থ)

৺শিখর বাসিনী দেবী
মায়ের কাব্য প্রতিভার স্মরণে

২৫শে বৈশাখ, ১৩৭০
মোরাভিলা। দার্জিলিং

চুল বাঁধবার সময় কথাটা ফের মনে করিয়ে দিলেন সুধাময়ী মেয়েকে।

বুঝেছি বাবা, বুঝেছি, আর বলতে হবে না।

টুক্‌লা ঝাঁঝিয়ে উঠল।

খালি ঐ এককথা। বড় হয়েছ আর বড় হয়েছ—এ মানায় না, সে মানায় না! বাবা রে বাবা।

ও আবার কি কথার ধরন? ওপাশ থেকে দিদিমা বলে উঠলেন।

মেয়ে বড় হলে মায়ের কত ভাবনা তা কি করে বুঝবে ভাই? আগে ছেলেমেয়ে হ'ক। এখন তো খালি, গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ান।

সুধাময়ী টুক্‌লার বিনুনির ফিতেগুলিতে ফুলবাঁধা শেষ করে, চিরুণী দুটো নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর চুলগুলো চিরুণী থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে জানলা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন।

ততক্ষণে মার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে এক দৌড়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে টুক্‌লা।

'শান্তি, এই শান্তি-ই-ই'!

কি রে?

পাশের বাড়ীর জানলায় টুক্‌লার সমবয়সী শান্তি এসে দাঁড়াল।

আজ কি জামা পর্‌বি রে? কোন্ ফ্রক্‌টা?

তুই?

আমি ফ্রিল দেওয়া ভায়োলেট অর্গাণ্ডি।

আমি তাহলে কি পরব? যেটা ভেবেছিলাম সেটা যে তোর সঙ্গে মোটেই ম্যাচ করবে না।

কোন্‌টা?

ঠিক আছে,

একটু ভেবে বলল শান্তি—

আমি হলুদে ফ্রিল দেওয়াটা পরব। তবু ফ্রিলে ফ্রিলে একটু ম্যাচ হবে কি বল?

হ্যাঁ, হ্যাঁ!

উৎসাহ পেল টুক্‌লা।

তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নে কিন্তু। দেরী করিস্‌নি। দোল্লার চার্জ তাহলে পাব না। তাড়াতাড়ি মুখ ধুতে বসে গেল টুক্‌লা সাবান নিয়ে।

যাবি তো পার্কে খেলতে। অত মুখ ঘষাঘষির দরকার কি?

দিদিমা বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন।

বারে! পার্কে বুঝি লোকজন আসে না? নোংরা হয়ে কোথাও যাওয়া যায়?

বুঝি না বাবা অত। কে তোমার এত সাজ দেখবে? তেমন বন্ধুও জুটেছে সব। সব কিছু চুলোয় গেল; খালি জামা-কাপড়ের গল্প।

ক্ষতি কি?

হাসল টুক্‌লা মুখ ধুতে ধুতে।

ক্ষতি আর কি? নেই কাজ তো খই ভাজ্‌। দিদিমা ছড়া কাটলেন।

আর আমাদের সময়ে? ও বয়সে আমরা ছেলে-পুলের মা হয়ে পঞ্চাশ জন লোকের হাঁড়ি ঠেলেছি।

সাবান দানিটা জল ঝেড়ে তাকে তুলে রাখতে রাখতে হেসে উঠল টুক্‌লা।

ও দিদিমা। তোমাদের সময় যে কবে বদলে গেছে। খবর রাখ না তো, তাই রিপভ্যান্ উইংকিলের অবস্থা হয়েছে।

কি জানি বাপু তোদের ব্যাপার! কিছু বললেই অম্‌নি ইংরেজী বুক্‌নি করবি।

গজ্ গজ্ করতে লাগলেন দিদিমা।

সন্ধ্যাবেলা পার্ক থেকে খুব খুশী মনেই ফিরল টুক্‌লা। দুটো দোল্লার চার্জ আজ ও পেয়েছিল। তা ছাড়া গোল্লা ছুটে অনিমাদের দলকে ওরা হারিয়েছে পাঁচ গোল্লায়। একবারও ওকে ছুঁতে পারেনি ওরা, পাঁচবারই টুক্‌লা গোল্লা, পাঁচবারই পাকা পেয়ে গেছে। টুক্‌লাকে দৌড়ে হারাবে সাধ্য কি অনিমাদের?

গুনগুন করে একটা গান গাইতে গাইতে ঢুকল টুক্‌লা বাড়ীতে। কিন্তু ঢুকেই তার গুনগুনানি বন্ধ হয়ে গেল। তাকে নিয়েই এখনও মা আর দিদিমাতে আলোচনা চলছে দেখে মন খারাপ হয়ে গেল।

রান্নাঘরে—সুধাময়ী ঠাকুরকে রাতের রান্নার নির্দেশ দিচ্ছিলেন। দালানে নীচু জলচৌকিতে বসে দিদিমা তাঁর দৈনন্দিন রুটীনের জপের মালা হাতে জপ করছিলেন আর মাঝে মাঝে টুক্‌লার স্বভাবের সমালোচনা করছিলেন।

মা কি শুন্‌ছিলেন? বোঝা গেল না।

এই যে এলেন!

কথাটা বলেই দিদিমা আবার চোখ বুজে জপ করতে লাগলেন।

সব বুঝতে পেরেছে টুক্‌লা। এত কি? রাগ হল ভারী। দিদিমার কি কোন কাজ নেই? মা তো শুনছেও না। তবু বলা

চাই। জপ করছ, তাই কর না বাপু। পরকালের কাজ হোক। তা নয়। টুকুলা কি করল, কোথায় গেল, কি পরল, এই সব চিন্তা। আর তা ছাড়া টুকুলা কি বোঝে না? এই রাগের উপলক্ষ্য যে কেবল আজকের বিকেলের সাজগোজের গল্প আর বেড়ান নয় তা টুকুলা ভাল ভাবেই জানে।

সকাল বেলা ছাদ থেকে পাশের বাড়ীর বিকাশদার সঙ্গে ঘন্টাখানেক ওর গল্প করাটাই দিদিমার অসহ্য ঠেকেছে। আশ্চর্য লাগে টুকুলার! কতবার যে ডেকেছেন দিদিমা ঐ সময়টুকুর মধ্যে নেহাৎই অকারণে তা টুকুলা বলতে পারে না। কি হয়েছে বাবা এতে? রাগ করবারই বা কি আছে দিদিমার? হ্যাঁ, সে তো দিদিমাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছে বিকাশদার সঙ্গে গল্প করতে তার ভাল লাগে। তা এতে দিদিমার এত বলাবলির কি আছে? টুকুলা তো ভেবে পায় না। আর মা তো কই কিছু মনে করে না? মা আসলে বেশ ভাল লোক। মনে মনে ভাবল টুকুলা। খালি ঐ দিদিমাদের কথায় মাঝে মাঝে যেন কেমন শাসন করে।

জুতোর স্ট্রাপটা খুলে পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে জোরে জোরে শব্দ করে দিদিমাকে আরও একটু রাগাল। তারপর পা ধুতে ধুতে একবার আড়চোখে তাকাল দিদিমার দিকে।

দিদিমা জপের মালা ঘুরিয়েই চলেছে। যেন কিছু জানে না।

আশ্চর্য! মা তো এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ও পায় না। দিদিমাই মাথায় ঢোকায় এসব। দিদিমা অবশ্য নিজের নয়। মায়ের ভালপিসী। তবু মা তাকে এত মান্যি করে আর ভালবাসে যে টুকুলাদেরও তাই করতে হয়। তাছাড়া আসলে দিদিমা লোকটা তো মন্দ নয়। ভাবল টুকুলা। টুকুলাকে তো এমনিতে ভালই বাসে। টুকুলাও কি ভালবাসে না? তবে দিদিমা বেজায় সেকেলে। সেটা টুকুলার পছন্দ হয় না।

যাকুগে। সব ভাবনা ঝেড়ে ফেলতে চাইল সে।

বুড়িকে রাগাবার জন্য এবার বেশ জোরে জোরে একটা গান করতে করতে ওপরে উঠে গেল টুক্‌লা।

ওর আর ওর দিদি অমিতার পড়ার ঘর দোতলার কোণের দিকে।

এক মনে পড়ার টেবিলে বসে পড়ছিল অমিতা। চেহারার সাদৃশ্য থাকলেও টুক্‌লার ঠিক উল্টো স্বভাব অমিতার। তার অপূর্ব মুখশ্রী তার মিষ্টি মনেরই যেন পরিচয় দেয়। দিদিমা অমিতার বিরুদ্ধে কখনও কোন কথা বলেন না।

টুক্‌লাকে চীৎকার করে গান গেয়ে ঢুকতে দেখে হেসে ফেলল অমিতা।

কি রে এখন ফেরা হল? মা জানে?

হ্যাঁ—

দিদিমা দেখেছে?

স-ব্বা-ই!

মা বলেছে না সন্ধ্যের আগে ফিরে আসতে? দেখবি বকুনি খাবি।

কি করে? আমি তো সন্ধ্যে করেনি? আমি বলে কখন এসেছি। হাত মুখ ধুয়ে জল খেয়ে এখন ঘরে ঢুকছি।

আহা এই তো বাড়ী ঢুকলি।

তাতে কি? পার্ক থেকে এসেছি তো কখন? সন্ধ্যের কত আগে। বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে শান্তির সঙ্গে গল্প করছিলাম।

এত গল্প করতেও পারিস। বক্তিয়ার খিলজী। কিসের কথা এত বলিস্ রে?

তুই সুবিনয়দার সঙ্গে এত কিসের গল্প করিস্ রে?

আড়চোখে ওর দিকে একবার তাকিয়ে নিজের পড়ার টেবিলে গিয়ে বসল টুক্‌লা।

টুক্‌লা ভারী ফাজিল হয়েছিস তুই।

গম্ভীর হয়ে আবার বই-এ চোখ দিল অমিতা।

টেবিলের সমস্ত দেরাজগুলো একে একে খুলল টুক্‌লা, তারপর—সেগুলো দেখে নিয়ে আবার ঢুকিয়ে রেখে টেবিলের ওপর থেকেই একখানা বই তুলে নিয়ে পাতা উল্টিয়ে গুনগুন করে পড়া আরম্ভ করল।

এই দিদি! জানিস আজ ভারী মজা হয়েছে।

আঃ টুক্‌লা কি হচ্ছে? আমায় পড়তে দিবি না।

অত পড়ে না যাঃ।

অমিতার কাছে সরে এল চেয়ার ছেড়ে তারপর ওর হাত থেকে বইটা কেড়ে নিয়ে নিজের টেবিলে চলে এসে বলল—

অত বেশী পড়লে মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

টুক্‌লা এটা কি হল?

কোন্‌টা?

বই নেওয়াটা?

ওঃ শুনবি না তো তাহলে?

বইটা দে আগে।

নাও তোমার বই।

ছুঁড়ে দিল বইটা দিদির দিকে।

ও বাবাঃ রাগ হল? আচ্ছা বল তোর কি কথা আছে।

বইটা কুড়িয়ে নিয়ে টেবিলে রেখে ওর দিকে মুখ করে বসল অমিতা।

জানিস দিদি পদ্মপুকুরের ছেলেরা আজ আমাদের পাড়ার ছেলেদের কাছে খুব মার খেয়েছে। বেশ হয়েছে।

তাতে তোর কি?

মানে ? আমরাই তো উপলক্ষ্য ?

সে আবার কি ?

বারে ! খেলার পর আমি শান্তি আর রমা একটা চক্কর দিয়ে আসবার জন্য বেড়াচ্ছিলাম আর সেই সময় ওদের মধ্যে কে জানি কি রিমার্ক পাস করেছে। ব্যস্ অজয়দার নজরে পড়তে যা অবস্থা। ভাবতেও হাসি পাচ্ছে রে।

হাসতে হাসতে চেয়ারে গড়িয়ে পড়ল টুক্‌লা।

এতে হাসির কি আছে ? অজয়দার কি তাতে ! অজয়দার এই পাড়ার সেল্‌ফ এ্যাপয়েনটেড্ লোক্যাল গার্জেনগিরি একটুও ভাল লাগে না আমার।

কেন ?

বিশ্রী লাগে আমার। ভগবান্ যেন সব মেয়েদের রক্ষা করার দায়িত্ব ওর ঘাড়ে চাপিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এই তো সেদিন সু·····

কি রে থামলি কেন ?

না কিছু না।

ফেলে রাখা বইটা আবার তুলে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করল অমিতা।

জানি সব জানি।

আরও জোরে হেসে উঠল টুক্‌লা। সত্যি অজয়দার সঙ্গে লাগতে গেল কেন ? নারে ?

টুক্‌লা !

প্রায় ধমকাল নমিতা।

কিন্তু তাতে কাজ হল উল্টো।

চেয়ারের একটি মাত্র পায়ায় ভর করে চেয়ারটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে আরও হাসতে লাগল টুক্‌লা।

বেচারা সুবিনয়দা—বেচারা। তারপর চীৎকার করে একটা গান ধরল।

কি হচ্ছে তোমাদের ?

সুধাময়ী ঘরে ঢুকলেন।

মেয়েদের পড়ার ঘরটা বাড়ীর একপাশে হওয়ার এই অসুবিধা। চোখের সামনে না থাকলে কখনও শাসনে রাখা যায় ? তবু তো এখন মেয়েরা বড় হওয়ার পরে কর্তাকে বলে ওপরে পড়ার ব্যবস্থা করেছেন। না হলে নীচে তো একদণ্ডও পড়া হত না।

বিশেষ করে টুক্‌লার। কতদিন বারান্দা থেকে উনি দেখেছেন, মাস্টার মশায় ঘরে বসে, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে টুক্‌লা রকে এক্কা দোক্কা খেলছে। এই মেয়েকে নিয়েই বেশী ভাবনা সুধাময়ীর।

পড়ার সময় গান কিসের টুক্‌লা ? বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন সুধাময়ী।

"মাগো"! এসে জড়িয়ে ধরল টুক্‌লা মাকে।

আজ মোটে পড়তে ইচ্ছে করছে না।

ও আবার কি কথা ? কাল ইস্কুল নেই ?

আছে মা—কিন্তু।

মা।

অমিতা গম্ভীর হয়ে বলল।

ওর কথা জানি না। আমার পড়া আছে। টুক্‌লা ঘরে থাকলে কারও পড়া সম্ভব নয়। এ আমি বলে দিলাম।

গলা থেকে টুক্‌লার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন সুধাময়ী।

টুক্‌লা তুমি বইপত্তর নিয়ে আমার ঘরে চলে এস।

সুধাময়ীর শরীর ভাল নয়। সংসারের কাজ-কর্ম করবার জন্য লোকের অভাব নেই। কিন্তু দেখাশোনা তদারক না করলে সুধাময়ী শান্তি পান না। এতেই তিনি হাঁপিয়ে ওঠেন। তবু

কুটনো কোটা থেকে মেয়েদের চুলবাঁধা পর্যন্ত নিজে না করলে শান্তি পান না। শুধু সন্ধ্যাবেলার পর আর কোন কাজ করতে পারেন না। খুব ক্লান্ত লাগে নিজেকে। গা ধুয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে বই পড়েন, কেউ আসলে গল্প করেন, কর্তা অফিস থেকে না ফেরা পর্যন্ত।

টেবিল থেকে বই খাতা নিতে নিতে আপত্তি জানাল টুক্‌লা।

তোমার ঘরে তো আবার এখনি কেউ এসে পড়বে। তখন আবার বলবে যাতো টুক্‌লা ও ঘরে যা। এত বইপত্তর নিয়ে আমি মরি।

মরতে তোমায় হবে না। থাক অত দোকানপাট সাজিয়ে তোমায় নিতে হবে না। একখানা বই নাও। সেটুকুর তুছত্তর পড়লে আমি বাঁচি!

হেসে ফেলে একখানা বই-ই নিল টুক্‌লা।

বাবা রে বাবা—এত ওঠা বসা করলে কারও পড়া হয়।

পড়া তোমার অমনিতেও হবে না। মাঝ থেকে অমিকেও পড়তে দিতে না। এসো আমার ঘরে।

সুধাময়ী চলে গেলেন।

দিদিকে একটু জিভ দেখিয়ে বইটা নিয়ে দিদির মাথায় টোকা মেরে মার পিছু পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল টুক্‌লা।

মায়ের ঘরে ঢুকে দিদিমাকে দেখে আবার সন্ধ্যাবেলার কথা মনে পড়ল টুক্‌লার। দিদিমার দিকে না তাকিয়ে সোজা বাবার টেবিলের সামনে বসে বই খুলে পড়তে লাগল টুক্‌লা।

টুক্‌লা দিদি আমার ওপর রেগে আছে রে সুধা।

দিদিমা হাসতে লাগলেন।

রাগ অত সস্তা নয় টুকুলার। অত সহজে সে কখনও রাগে না।
মুখখানা কিন্তু তখনও গম্ভীর টুকুলার। ঘোরাঘুরি করে মা হাঁপাচ্ছিলেন। ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ে আস্তে আস্তে বললেন—
সে কথা ঠিক ভালপিসী। টুকুলা আমার রাগতে জানে না। ও আমার পাগলা মেয়ে। তাই তো আমার ভয়। কার হাতে পড়বে, হয় তো সে বুঝতে পারবে না ওকে, ওর তো কিছুর ঠিক নেই।
ভাল ধীর স্থির পাত্তর দেখে বিয়ে দিতে হবে। তাছাড়া টুকুলা দিদিই কি চিরদিন এমনি থাকবে? আপনিই সব ঠিক হয়ে যাবে।
হলেই ভাল—মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।
হবে বৈ কি? ঐ সব নাচুনে বন্ধুদের সংস্রব ত্যাগ করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি তো তাই বলি, যে বয়সের যা। ওকে আগে শাড়ী ধরাও দেখি। এ বয়সে আর ফ্রক মানায় না সুধা।
মা!
বই থেকে চোখ না তুলেই বলল টুকুলা। এতে পড়া হয় কারও?
তোর এদিকে কান দেবার দরকার কি? তুই তোর নিজের পড়া করনা।
মা ধমক দিলেন টুকুলাকে। তারপর দিদিমার দিকে ফিরে বললেন—
আমি তো জানি ভালপিসী। সবই বুঝি। কিন্তু ওর বাবাই যে আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে মাথা খেয়েছে। ছেলে তো হল না। তাই মেয়েদের দিয়ে ছেলের সাধ মেটাচ্ছে।
তা বলে প্রকৃতিকে কি অমান্যি করতে পারবে? মেয়ে মেয়েই। ইচ্ছে করলে, আর বললেই তো মেয়েমানুষ পুরুষ হয়ে যাবে না। মেয়েদের কাজই হল শান্তভাবে ঘর-গেরস্থালি করা।
এখন সে সব আইডিয়া বদলেছে দিদিমা—টুকুলা না বলে থাকতে পারল না।

এখন আর কোন মেয়ে···

তুই থামতো! কেবল পাকা পাকা কথা। এই বুঝি তোমার পড়া হচ্ছে?

বারে! এতে বুঝি কারও পড়া হয়?

টুক্‌লা হেসে জিজ্ঞেস করল মাকে।

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ হল।

জামাই বুঝি এলেন।

দিদিমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

টেবিল থেকে উঠে এগিয়ে এল টুক্‌লা দরজার দিকে।

বাবা—

কি ব্যাপার টুক্‌লা-মার কি হচ্ছে এ ঘরে? হাত থেকে প্যাকেটগুলো নামাতে নামাতে বললেন বাবা।

কি আবার, অমিকে পড়তে দিচ্ছে না, নিজেও পড়বে না, তাই এ ঘরে চোখের সামনে এনে পড়াচ্ছি।

তোমার শরীর কেমন?

প্রসন্নবাবু জিজ্ঞেস করলেন সুধাময়ীকে।

ভালো।

কি বাবা এগুলো?

টুক্‌লা প্যাকেটগুলো নাড়াচাড়া করে দেখতে দেখতে বলল:

এগুলো ফল। আর এই প্যাকেটটা তোর মায়ের জন্য।

ফলগুলো মিট্‌সেফে রেখে আয় টুক্‌লা, যা। মা বললেন।

না হয় মতির মাকে ডাক। তুই পারবি না।

বারে! তোমার তো ধারণা আমি কিছুই পারি না।

না না ও বেশ পারবে, তুমি উঠ না।

প্রসন্নবাবু ত্রস্ত হয়ে বলে উঠলেন।

মতির মাকে ডেকে ফলগুলো মিট্‌সেফে রেখে দিয়ে আর ও ঘরে ঢুক্‌ল না টুক্‌লা। ওঘরে যা পড়া হবে তাও বেশ বুঝে

পারছে। দিদি বেচারা তখন থেকে একলা পড়ছে। ও সেই ঘরেই গিয়ে চুপচাপ পড়বে। দিদিকে ডিস্‌টার্ব করবে না।

একমনে লিখে যাচ্ছে অমিতা। টুক্‌লা ঘরে ঢুকতেই চম্‌কে উঠে কাগজটা মুড়ে দেরাজের মধ্যে চালান করে দিল।

ও খুব তো পড়ছিস দিদি! এই জন্যে বুঝি আমি ঘরে থাকলে অসুবিধে? তা আমাকে দেখে আর লুকোলি কেন? লেখ না। লিখছিলি তো সুবিনয়দাকে চিঠি।

হ্যাঁ তোকে বলেছে।

আরে এখন না বলিস, পরে তো আমাকে বলতেই হবে। আমি ছাড়া আর কে দূতী হবে বল?

পাকাম করিস না টুক্‌লা।

তুই তো আমাকে পাকিয়ে ছাড়লি দিদি। হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল টুক্‌লা।

সেদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছিল। বাবা অফিস যাবার সময় গাড়ী করেই স্কুলে পৌঁছে দিলেন।

আজ বৃষ্টির জন্য পার্কে যাওয়া হবে না ভেবে টুক্‌লার মন বড় খারাপ। আজ দিনটাই মাটি। ইস্কুল থেকে ফিরল রিকসা করে। মা তো খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। গরম জলে পা ধোও, আদা দিয়ে ঘি দিয়ে খাও, মাথা মোছ, সব তো হল। এবার? এখন আর কি করার আছে? মানে হয় কোন এই বৃষ্টির? সারারাত ধরে হ'না বাপু কে বারণ করছে? তা না ঠিক পার্কে যাবার সময় পর্যন্ত বৃষ্টি। অবশ্য ইস্কুল থেকে ফেরবার পথে বৃষ্টিটা ভালই লেগেছে। ইচ্ছে করেই রিকসার ঢাকা খুলে ও আর শান্তি কষে ভিজে নিয়েছে। মা তো বুঝতেও পারেনি কি করে অত ভিজল ও। জানবে কি করে?

শান্তিদের জানলাও বন্ধ। বারান্দায় দাঁড়াবার উপায় নেই। বৃষ্টির ঝাট আসছে। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল। দিদিকে দেখতে পাচ্ছে না। কোথায় কে জানে। হয়তো স্নানের ঘরে শাওয়ার খুলে গা ধুচ্ছে। ওঃ যা সময় নেয় দিদি! মা, দিদিমা, উমাশশী আর ফুটকি-মাসীমার সঙ্গে গ্রাবু খেলতে বসেছে। বাবা না আসা অবধি চলবে ওদের খেলা।

নাঃ এভাবে আর পারা যায় না। টুক্‌লা অধৈর্য হয়ে উঠল। এভাবে একা একা সারা সন্ধ্যেটা কাটান অসহ্য লাগছে। তাছাড়া শান্তিকে একটা দরকারী কথা বলা হয়নি।

মায়ের ঘরে ঢুকে চুপটি করে মায়ের পাশে বসে রইল টুক্‌লা। একটু পরেই বলল— মা!

কি রে ?

তাস খেলতে খেলতে বললেন সুধাময়ী।

মাগো। বল রাগ করবে না ?

অত ভূমিকা কিসের ?

তাসের দিকেই চোখ রেখে বললেন সুধাময়ী।

মা বলছিলাম যে, শান্তিদের বাড়ী একটু যাব মা; ছাতা মাথায় দিয়ে যাব, কিছু হবে না মা। যাই ?

ভালপিসি! রংএর চোদ্দ কি বেরিয়ে গেছে ?

ওর কথার উত্তর দিলেন না মা।

মাগো বল না। যাই ?

আচ্ছা যাও। কিন্তু তাড়াতাড়ি এস, দেরী কর না মোটে।

এই বৃষ্টিতেও মেয়ের বেরোন চাই।

দিদিমার পছন্দ হল না মায়ের মত দেওয়াটা।

আহা আমার একটা দরকারী কাজ আছে।

কাজ তো ভারী।

ফুটকি-মাসীমা টিপ্পনী কাটলেন।

ওদের কথা গায়ে না মেখে প্রায় দৌড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল টুক্‌লা।

মেয়ে যেন চরকী ঘুরছে।

মেয়ে আমার পাগলা।

হেসে সব কথার যবনিকা টানলেন সুধাময়ী।

কিন্তু আবার কয়েকদিন বাদেই যখন রমাদের বাড়ী বেরোতে চাইল টুক্‌লা তখন রীতিমত আপত্তি করলেন সুধাময়ী।

না না এই বৃষ্টির মধ্যে ?

বৃষ্টি পড়েছে তো কি হয়েছে মা ?

সে আবার কি ? না না রোজ ভাল না এই তো সেদিন বৃষ্টি মাথায় করে বেরোলে। তোমার বাবা জানেন না তাই।

বাবা জানলে কিছুই হবে না। আমি বাবাকে বলবো মা বাবা কিছু বলবেন না দেখো।

সে তো জানি।

দিদিমা টিপ্পনী কাটলেন।

বাপের তো সবেতেই হ্যাঁ। একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধ।

দিদিমার কথায় কান দিল না টুক্‌লা। মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল।

মাগো। লক্ষ্মী মা আমার—যাই ? সত্যি বলছি রমার সঙ্গে একটা ভী—ষণ দরকারী আর জরুরী কথা আছে।

এই বৃষ্টিতে সে কথা না হলে নয় ? তোমার কাল থেকে সর্দি হয়ে গেছে না।

কই সেরে গেছে তো ?

নাক টেনে দেখাল টুক্‌লা।

মা হেসে ফেললেন।

এই তো হেসেছ ?

জোরে জড়িয়ে ধরল মাকে টুক্‌লা।

কিছু হবে না মা। বৃষ্টি কমে গেছে। আমার বড্ড দরকার তাই—যাই মা ?

যাও !—অনিচ্ছা সত্ত্বেও মত দিলেন সুধাময়ী।

এক ছুটে বেরিয়ে গেল টুক্‌লা।

শুধা, মেয়েকে শাসন করতে শেখ।

গম্ভীর হয়ে দিদিমা বললেন।

পরে তোমাকেই ভুগতে হবে।

কি করবো ভালপিসী ?

তোমার যেতে দেওয়া ঠিক হয়নি।

যাক একটু ভালপিসী। ও ছট্‌ফটে হয়েছে ওর ঠাকুরদার মত। তেমনি জেদী। আমি জানি তো জেদ ধরলে আর রক্ষে নেই। যতক্ষণ না 'হ্যাঁ বলব' সমানে আবদার করে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে যাবে। আমি বাপু পারি না। ক্লান্ত লাগে।

ওটা কি ভাল সুধা ? মেয়েমানুষের জেদ ভাল না। কেন তোমার অমি তো ওরকম না ? বেশ মেয়ে, সাত চড়ে মুখে রা নেই। নিজের মনে পড়াশুনো নিয়ে আছে।

হ্যাঁ, অমি আমার ভারী লক্ষ্মী মেয়ে।

লক্ষ্মী বলে লক্ষ্মী। ধীর, স্থির, শান্ত। যেন লক্ষ্মীপ্রতিমা। যা বলবে কিছুতে না নেই। আর তোমার টুক্‌লা ? সবেতেই আপত্তি।

কেন ও আবার আপত্তি করল কবে ? মা অবাক হলেন।

ঐ তো পরশু। অত করে যত্ন করে চুল বেঁধে দিলুম তা মেয়ের পছন্দ হল না। মুখে কিছু বললে না বটে তবে পরে দেখি খুলে ফেলে আবার নিজে নিজে দুটো লেজ ঝোলাচ্ছে।

তাই নাকি ?

হাসলেন সুধাময়ী।

আমার কি দরকার বাপু।

দিদিমা গজ্‌গজ্ করতে লাগলেন।

অত ফ্যাসান-ফুসন তো জানি না। তোর শরীর খারাপ, ভাবলাম আহা কাজ এগিয়ে দিই। তা বোঝ ! কই অমি তো আপত্তি করলে না ? চাঁদপানা মুখ করে ঐ চুলবাঁধা নিয়েই বেড়াতে গেল।

সবাই তো সমান হয় না ভালপিসী। টুক্‌লা আমার ছেলে হয়ে জন্মালেই পারত। আমার কত সাধ ছিল ছেলের।

তা যখন হয়নি, তখন আধা মেয়ে আর আধা ছেলে হয়ে তো চলবে না। ওকে শাসন করা দরকার।

তা ঠিক ভালপিসী।

সুধাময়ী আস্তে আস্তে বললেন।

ওকে সত্যিই এবার শাসন করা দরকার। সেটা বুঝি। অমি বলছিল ওকে নাকি ওদের স্কুলেরই হেডমিস্ট্রেস্ বলেছে দুরন্ত ঘোড়া। বোঝ একবার।

তুমিই বোঝ। কত বড় লজ্জার কথা।

কি যে করবো তা জানি না। আমাদের কালে তো এত ভাবতে হত না। এখন দিনকাল বদলাছে।

হঠাৎ সিঁড়ির দিকে নজর পড়তেই মনে হল কে যেন নেমে গেল।

কে গো ভালপিসী? দেখতো?

দিদিমা বেরিয়ে এসে কাউকে দেখতে পেলেন না।

অমিতা। সিঁড়ির তলায় নিজেকে প্রায় লেপ্টে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মা না দেখতে পান। রাস্তার মোড়ে কখন থেকে ভিজছে সুবিনয়। মীরার বাড়ীতে গিয়ে গল্প করা হবে। দিদিমা ঘরে ঢুকে যেতেই ও সিঁড়ির তলা থেকে বেরিয়ে এল। ছাতাটা খুলে বেরিয়ে পড়ল।

ততক্ষণ দিদিমা আবার মার কাছে বসে মেয়েদের শাসন করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে লম্বা লেকচার দিচ্ছিলেন।

তুমি দেখে নিও। অমিকে নিয়ে তোমার কোন গোল হবে না। কিন্তু ঐ টুকলা? এখন থেকে যদি ও মেয়ের উপযুক্ত শাসন না কর তো তোমাদের ও একদিন মুখ পোড়াবে। খালি ছেলের পালের সঙ্গে ভাব।

ওর কার সঙ্গে ভাব নয়? সবাইকেই ও ভালবাসে।

মৃদু একটু প্রতিবাদ করলেন সুধাময়ী।

না না সুধা, এ ভাল নয়। এই যে রমাদের বাড়ী গেল। কি জন্যে শুনি ?

কি কাজ আছে ওর রমার সঙ্গে।

হ্যাঁ তোমাকে ও বোঝাল আর তুমি বুঝলে। আমি জানি ঐ বিকাশ ছোঁড়ার সঙ্গে ফুসুর-ফাসুর গল্প করার জন্য। এ আমি নিশ্চয়ই জানি। আর দেখতো অমিকে ? ঠিক নিজের ঘরে পড়ছে।

অমিতা ততক্ষণে বাইরে মোড়ের কাছে এসে পড়েছে।

অজয় ফিরছে ভিজতে ভিজতে।

কি ব্যাপার অমিতা ? এত বৃষ্টিতে কোথায় ?

এই এখানে !

ওকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এসে মোড় ঘুরল অমিতা। দেখতে পেয়েছে নিশ্চয়ই অজয়। না দেখে ছাড়বেই না।

ভিজে ভিজেও ও ফিরে দেখবে অমিতা কোথায় যাচ্ছে। কাউকে আবার বলে না দেয়। পাড়ার এই সব সতর্ক প্রহরীদের জন্য মহামুস্কিল।

মোড়েই আধো অন্ধকারে দাঁড়ান সুবিনয়ের কাছে আসতেই তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

কাছে এস না, মীরাদের বাড়ী চলে যাও। একটু ঘুরে আমি যাচ্ছি। অজয়দা দেখছে।···

বাড়ী ফেরার মুখেই দেখা হল টুক্‌লার সঙ্গে।

বাবা দিদি ! তুই ? আমার কথা না হয় ছেড়ে দে। তুই বৃষ্টিতে কোথায় বেরিয়েছিলি ?

টুক্‌লা চেঁচিয়ে উঠল।

চুপ চেঁচাসনি ভাই।

কেন রে?

কাছে এল টুক্‌লা।

মাকে বলিসনি বুঝি? মা জানে না?

না—

দুজনে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়ল।

মতির মা বোধ হয় ওদেরই খুঁজছিল। কোথায় গিয়েছিলে গো দিদিমণি? আমি তো তোমাকে খুঁজে খুঁজে হল্লা। মা কত বকাবকি করতেছে।

টুক্‌লাকে ডাক্‌তে।

অনায়াসে বলে দিয়ে ওপরে উঠে গেল অমিতা।

লাফ দিয়ে দিয়ে সিঁড়ি কটা উঠল টুক্‌লা তারপর মার ঘর পেরিয়ে সোজা নিজেদের ঘরের দিকে চলল। বারান্দায় দাঁড়াল কিছুক্ষণ। বাবা এসে গেছেন অফিস থেকে, এখন আর মা ওদের খোঁজ করবেন না। দিদিমা তো তার কাঁথার তলায় ঢুকে পড়েছেন নির্ঘাৎ।

দিদিমার কথা মনে করতেই হাসি পেল। শুয়ে শুয়েও দিদিমা জপ করবেন। জপ করবেন! আবার হাসি পেল টুক্‌লার। জপের সময়ই বোধহয় দিদিমা সব থেকে বেশী কথা বলেন। অথচ ঐ হাত ঘোরানটুকু কি না হলেই নয়?

এই নিয়ে এতক্ষণ রমাদের বাড়ী কত হাসাহাসি হল। বিকাশদা যে কি? সব লক্ষ্য করে বুড়িদের। ওদের মামার বাড়ী শ্রীরামপুরের গঙ্গার ঘাটে সারসার বুড়িরা বসে জপের নাম করে, কেমন ছেলের বৌ আর পড়শীর নিন্দে করে। কি মজার করেই না দেখাল। বাবারে বাবা এতও জানে বিকাশদা। ওর সত্যি অনেক গুণ আছে। টুক্‌লা তো বলেইছে ও যদি অভিনেতা হয় তো খুব নাম হবে ওর। সত্যি বিকাশদা বড় ভাল ছেলে

না না সুধা, এ ভাল নয়। এই যে রমাদের বাড়ী গেল। কি জন্যে শুনি ?

কি কাজ আছে ওর রমার সঙ্গে।

হ্যাঁ তোমাকে ও বোঝাল আর তুমি বুঝলে। আমি জানি ঐ বিকাশ ছোঁড়ার সঙ্গে ফুসুর-ফাসুর গল্প করার জন্য। এ আমি নিশ্চয়ই জানি। আর দেখতো অমিকে ? ঠিক নিজের ঘরে পড়ছে।

অমিতা ততক্ষণে বাইরে মোড়ের কাছে এসে পড়েছে।

অজয় ফিরছে ভিজতে ভিজতে।

কি ব্যাপার অমিতা ? এত বৃষ্টিতে কোথায় ?

এই এখানে !

ওকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এসে মোড় ঘুরল অমিতা। দেখতে পেয়েছে নিশ্চয়ই অজয়। না দেখে ছাড়বেই না।

ভিজে ভিজেও ও ফিরে দেখবে অমিতা কোথায় যাচ্ছে। কাউকে আবার বলে না দেয়! পাড়ার এই সব সতর্ক প্রহরীদের জন্য মহামুস্কিল।

মোড়েই আধো অন্ধকারে দাঁড়ান সুবিনয়ের কাছে আসতেই তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

কাছে এস না, মীরাদের বাড়ী চলে যাও। একটু ঘুরে আমি যাচ্ছি। অজয়দা দেখছে।...

বাড়ী ফেরার মুখেই দেখা হল টুক্‌লার সঙ্গে।

বাবা দিদি! তুই ? আমার কথা না হয় ছেড়ে দে। তুই বৃষ্টিতে কোথায় বেরিয়েছিলি ?

টুক্‌লা চেঁচিয়ে উঠল।

চুপ চেঁচাসনি ভাই।

কেন রে?

কাছে এল টুক্‌লা।

মাকে বলিসনি বুঝি? মা জানে না?

না—

দুজনে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়ল।

মতির মা বোধ হয় ওদেরই খুঁজছিল। কোথায় গিয়েছিলে গো দিদিমণি? আমি তো তোমাকে খুঁজে খুঁজে হল্লা। মা কত বকাবকি করতেছে।

টুক্‌লাকে ডাক্‌তে।

অনায়াসে বলে দিয়ে ওপরে উঠে গেল অমিতা।

লাফ দিয়ে দিয়ে সিঁড়ি কটা উঠল টুক্‌লা তারপর মার ঘর পেরিয়ে সোজা নিজেদের ঘরের দিকে চলল। বারান্দায় দাঁড়াল কিছুক্ষণ। বাবা এসে গেছেন অফিস থেকে, এখন আর মা ওদের খোঁজ করবেন না। দিদিমা তো তার কাঁথার তলায় ঢুকে পড়েছেন নির্ঘাৎ।

দিদিমার কথা মনে করতেই হাসি পেল। শুয়ে শুয়েও দিদিমা জপ করবেন। জপ করবেন! আবার হাসি পেল টুক্‌লার। জপের সময়ই বোধহয় দিদিমা সব থেকে বেশী কথা বলেন। অথচ ঐ হাত ঘোরানটুকু কি না হলেই নয়?

এই নিয়ে এতক্ষণ রমাদের বাড়ী কত হাসাহাসি হল। বিকাশদা যে কি? সব লক্ষ্য করে বুড়িদের। ওদের মামার বাড়ী শ্রীরামপুরের গঙ্গার ঘাটে সারসার বুড়িরা বসে জপের নাম করে, কেমন ছেলের বৌ আর পড়শীর নিন্দে করে। কি মজার করেই না দেখাল। বাবারে বাবা এতও জানে বিকাশদা। ওর সত্যি অনেক গুণ আছে। টুক্‌লা তো বলেইছে ও যদি অভিনেতা হয় তো খুব নাম হবে ওর। সত্যি বিকাশদা বড় ভাল ছেলে

খুব বন্ধু টুক্‌লার। তা'ছাড়া কত কাজ করে দেয়। ভারতবর্ষের আবহাওয়ার ম্যাপটা বিকাশদাকে দিয়ে তৈরী করিয়ে নিয়ে তবে তো আজ নিশ্চিন্ত। বেশ সুন্দর ম্যাপ করে দেয় বিকাশদা। ভূগোলের টীচার সুমনাদির মুখ মনে করলেই জ্বর আসে টুক্‌লার। অতক্ষণ ধরে বসে বসে ম্যাপ আঁকা কি সোজা কথা? তাহলে তো ড্রইং ক্লাশও ওর ভাল লাগতো। ড্রইং ক্লাশে কাল কি কাণ্ডই করল। ভাবতে হাসি পেল টুক্‌লার। ড্রইং দিদিমণি মিস্ সরকার সত্যি বড় ভালমানুষ, কিছু বোঝে না। কি রকম কেডস্ জুতোর সঙ্গে শাড়ী আর মোজা পরে আসেন? অদ্ভুত। তবে মনটা ভাল। সবেতেই বিশ্বাস। টুক্‌লারা তো রোজই রং-এর বাক্স ধোবার নাম করে ক্লাশে ফাঁকি দিয়ে গল্প করে বাইরে। কিছু বুঝতে পারেন না উনি। কিন্তু সুমনাদি ঠিক উল্টো। সব ঠিক ঠিক চাই। যাক্ বিকাশদা কাল সকালেই সব শেষ করে পাঠিয়ে দেবে। না হয় নিজেই যাবে একবার সকালে। বাঁচা গেছে।

নিজেদের ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বালল। দিদিটা গেল কোথায়?

এই টুক্‌লা আলো জ্বাললি কেন?

ও বাবা তুই এঘরে? অন্ধকারে কি করছিলি?

ভিজে কাপড় ছাড়ছিলাম। আলো জ্বাললে দেখা যাবে না? মা বুঝতে পারবে।

দিদি! কোথায় আসলে গিয়েছিলিরে? বেশ তো আমার নামে গুল দিলি।

মীরাদের বাড়ী।

কেন রে?

দরকার ছিল।

সুবিনয়দার সঙ্গে?

কোন উত্তর না দিয়ে আধভেজা কাপড়টা কোণে রেখে দিয়ে চুলে আঙ্গুল চালিয়ে হাওয়া লাগাতে লাগল অমিতা।

কি সুন্দর তোর চুলরে দিদি।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল টুক্‌লা।

সত্যিই দেখবার মত অমিতার চুল। টুক্‌লার মত অত ফর্সা নয় অমিতা, কিন্তু তার মুখের নিখুঁত সৌন্দর্য স্বভাবতই মন টানে। তার বড় বড় পাতাওলা ঘন কালো চোখে কিসের একটা আকর্ষণ আছে। তাকে যেন ভাল না বেসে পারা যায় না।

তোয়ালে দিয়ে মাথাটা মুছে নে টুক্‌লা।

নিচ্ছি! আচ্ছা দিদি আমি তো মোটেই ভিজিনি। তুই এত ভিজলি কি করে?

আহা! সুবিনয় যে ছাতা আনেনি, তার ওপর···

সত্যিরে দিদি, আমি খালি ভাবি, মীরাদির বাড়ী না থাকলে তোরা কোথায় দেখা কর্‌তিস? এখন মা যা রেগে আছে সুবিনয়দার ওপর।

কবে আর কম রাগল মা?—ভাবল অমিতা।

আগে বেশ ছিল না রে? সুবিনয়দা বেশ এ বাড়ীতে আসত যেত। মাও কিছু বলত না, তোরাও বেশ ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে যেতিস্। অবশ্য ঐ ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করার জন্যই যা বিপদ বাঁধল। একটু কম করে গল্প করতে পারলি না?

ফাজলাম করিস্ না টুক্‌লা।

বারে! ফাজলাম করবো কেন? মা টের পেল বলেই তো তোদের এত কষ্ট। সত্যি দিদি তোদের কষ্ট আমি বেশ বুঝতে পারি।

অমিতা বুঝতে পারল না টুক্‌লা ফাজলাম করছে কিনা। আড়চোখে একবার তাকাল বোনের গম্ভীর মুখের দিকে। তারপর বলল, তোর আমাদের জন্য কষ্ট হয়?

নিশ্চয়ই। মহৎ প্রাণ যে আমার। পরদুঃখে সদাই কাতর। দিদিমার মত তো নয়।

যাঃ দিদিমা লোক ভাল। একটু যা সেকেলে।

ঐ একটুতেই যে মাটি করেছে। মাকে তো দিনরাত বুড়ি জপাচ্ছে। যাতে মা আমায় আর ফ্রক্ না পরতে দিয়ে শাড়ী ধরায়। বাইরে যেতে না দেয়। সেদিন তো আমার হাতে ব্যাটমিণ্টনের র‍্যাকেট দেখে বুড়ি ভির্মি যাবার যোগাড়।

টুক্‌লা সজোরে হেসে উঠল।

সেকেলে মানুষ তো!

অমিতা গম্ভীর হয়ে বলল।

তা একালের ব্যাপারে মাথা না ঘামালেই হয়। জানিস দিদি আমিও বেশ র‍্যাকেটটা ঘোরাতে ঘোরাতে বেরিয়ে গেলাম ইচ্ছে করে। বুড়ি রেগেছে খুব। তা'ছাড়া আর একটু আগেই দিদিমা পাঁচগুছি করে খোঁপা বেঁধে দিয়েছে আমায়, আমি তো তক্ষুনি খুলে ফেলেই সোজা ডাঁটসে দুটো বিনুনী ঝোলালাম। বুড়ি মনে মনে চট্‌ল। মুখে বেগুনবেচা ভাব। তা কি করবো বল? সাদা ড্রেস, কেড্‌স তার সঙ্গে পাঁচগুছি করে খোঁপা? ভাবতেও হাসি পায়।

হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল টুক্‌লা। অমিতা ভেবে পায় না এত হাসি কোথা থেকে পায় টুক্‌লা। ওর মত হাসতে পারলে অমিতা বেঁচে যেত। বিশেষ করে সুবিনয় আজ যে সব কথা ওকে বলেছে। তারপর থেকে ওকে বেশ ভাল করে ভাবতে হচ্ছে। অনেক ভাবতে হবে ওকে এবার থেকে। টুক্‌লা কি বুঝবে তার? ও ছেলেমানুষ। অমিতার জীবনে এক অন্য আস্বাদন এসেছে। তার খবর টুক্‌লা জানে না, কেউ জানে না।

সত্যি সুবিনয় যেন কি? কি সুন্দর করে তাকায়। মানুষের চোখে যে এত স্বপ্ন থাকতে পারে একথা অমিতা আগে জানত না।

কি স্নিগ্ধতা, কি মধুরতা, কি নির্ভরতা সুবিনয়ের চোখে। এ এক অন্য জগত। এ জগতের খবর টুক্‌লা জানে না; ওর জন্য

সত্যিই দয়া হল অমিতার। বেচারা, এত সুন্দর পৃথিবী, এত মাধুর্যে ভরা, এ খবর টুকুলা জানে না। ও জানে তুচ্ছ খেলা আর হাসি।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসা টুকুলার দিকে তাকাল অমিতা।

জোরে জোরে তাড়াতাড়ি চুলে চিরুণী চালাচ্ছে টুকুলা। জট্ ছাড়াবারও ধৈর্য নেই। চুলের গিঁটগুলো চিরুণী দিয়ে ছিঁড়ে ফেলছে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে সজোরে চিরুণী চালাচ্ছে। সব কাজই টুকুলার এই, সব সময়ই চঞ্চল অশান্ত ভাব। কোন বাধাই বাধা নয় ওর কাছে।

অমিতা হাসল!

অথচ সে?

স্বভাবতই শান্ত সে তার ওপর সুবিনয়ের চিন্তা তাকে সব সময় আবিষ্ট করে রাখে। আবার সুবিনয়ের কথা মনে হতে মধুর আবেশে তার সর্বাঙ্গ ভরে গেল। আজ প্রথম সুবিনয় তাকে······

মতির মা ডাকতে এল।

চুল আঁচড়ান শেষ করে উঠে দাঁড়াল টুকুলা। খেতে চল দিদি—অত ভাবিস না রাতদিন। পাগলা হয়ে যাবি।

ওর মাথায় টোকা দিয়ে বেরিয়ে গেল টুকুলা আগে আগে।

বিকাশ কেন কাউকে বলতে বারণ করেছে তা জানে না। তবু এত বড় খবর দিদিকে না জানিয়ে পারবে না টুকুলা।

জানিস দিদি। কাল নাকি পার্কে সুভাষ বোস আসছেন লেকচার দিতে।

কে বললে তোকে।

খবর পেলুম, সব খবর আমার কাছে আসে।

বল্না রে?

নাম বলা বারণ।

চালাকি করিস্ না। সুভাষ বোস আসবেন—আর সে খবর চাপা আছে নাকি ?

চাপা থাকবে কেন ? তুই তো কোন খবর রাখিস না। কারও খবর না, একজনের ছাড়া।

বেশ করি, যা—

রাগ করিস না ভাই। বিকাশদা বলেছে ওর নাম যেন কাউকে না বলি।

বেশী বেশী। হঠাৎ ও ইম্‌পর্টেন্স নিতে চায়।

নারে। ওরাই তো সব ব্যবস্থা করছে। আর আমাকেও অনেক কিছু করতে হবে। কিন্তু একটা মুস্কিল হয়েছে। প্ল্যান দে দেখি ?

কিসের ?

বুঝলি না ? মিটিং তো হবে সন্ধ্যার পর ! কিন্তু মার পারমিশন্ ?

কিসের মিটিং ?

কি করপোরেশনের ইলেকশনের ব্যাপার, আর কি সব প্রতিবাদ—সে অনেক ব্যাপার, ওসব তুই বুঝবি না।

তুই বুঝিসনি তাই বল।

আমার অত ইনটারেস্ট নেই, তাই খোঁজ নিইনি।

তবে আর মিটিং মিটিং করে মাথা ঘামাচ্ছিস কেন ?

আহা মিটিং নিয়ে কি মাথা ঘামাচ্ছি ?

তবে ?

বারে ! সুভাস বোসকে দেখব না ?

আমি দেখেছি অনেকবার।

আমিও, কিন্তু সে তো দূর থেকে।

এবারও তো তাই হবে।

পাগল ? এবার যে করেই হোক কাছে যাব, আমার অনেকগুলো প্রশ্ন আছে ওঁর কাছে ?

কি প্রশ্ন ?

তখন শুনিস? তাজ্জব হয়ে যাবি। ভাবিস টুক্‌লা কিছু বোঝে না, খালি হাল্কাভাবে ঘুরে বেড়ায়। ওরে তা নয়। আমার মাথায় যে কত ভাবনা ঘোরে, কত প্ল্যান, তোদের বলি না বলে।... কিন্তু পারমিশনের কি করা যায়?

আমি ম্যানেজ করবো। আমিও যাব।

কিন্তু শোনা গেল পার্কে সভা হবে না, কি কারণে। আশুতোষ কলেজ হলে সভা হবে।

সন্ধ্যার আগেই টুক্‌লা আর অমিতা তার বন্ধুদের সঙ্গে হাজির হল কলেজে। কী ভিড়। ডায়াসের ওপর কত মহিলা বসে! মধ্যে সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র—আর শরৎচন্দ্রের স্ত্রী। এত মেয়ের ভিড় কেন? বিকাশদাই বা কোথায়? শেষে শুনল 'মহিলা সম্মিলনী'ই ব্যবস্থা করেছে এ সভার। কোথায় বিকাশ? তার পাত্তাই নেই! তাহলে টুক্‌লা কাছে যাবে কি করে? ওরা সকলে গিয়ে মধ্যের সারিতে চেয়ারে বসল।

উদ্বোধন সঙ্গীত করল যে মেয়েটি, কি সুন্দর গলা তার। কি ভাগ্য তার, সুভাষ বোসকে গান শোনাচ্ছে। টুক্‌লা কি কোনদিন এ সুযোগ পাবে?

দুএকজনের বক্তৃতার পর শরৎ বোস, আর তারপরে সুভাষ বোস উঠে দাঁড়ালেন। কি হাততালি। টুক্‌লারা তো থামতেই চায় না। ধন্য আজ তারা।

"ভগ্নিগণ, মায়েরা" সুভাস বোসের গম্ভীর গলা কানে এল।

মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে লাগল টুক্‌লা সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা। পাঁচ মিনিট কারও কথা শুনতে ওর বিরক্তি লাগে অথচ সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতায় কখন যে ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে তা সে জানে না। অমিতা, হাসিদি, চিনুদি সকলেই যেন অন্য জগতে চলে গেছে। সুভাষচন্দ্র

যখন বললেন ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে, সমাজের উন্নতিতে, দেশের শিক্ষায় সব কিছুতে মেয়েদের অবদানের কথা, তাদের মধ্যে লুকান শক্তিকে জাগ্রত করার কথা, তাদের প্রত্যেকের কাছে যখন আবেদন জানাতে লাগলেন বারবার করে তখন সারা শরীরে রোমাঞ্চ অনুভব করল টুক্‌লা। ওর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। মোছবার কথাও যেন ভুলে গেল সে। ওর এমনি হয়। কোন আবেগপ্রবণ কথা শুনলে, কোন ভাবের গান শুনলে ওর চোখে জল আসে ; ও অভিভূত হয়ে পড়ে। অথচ কেউ দেখে ফেললে লজ্জা পায়। এ যে ওর স্বভাববিরুদ্ধ ! ও কাঁদবে কেন ? ওর চোখ দিয়ে জল পড়বে কেন ? এ কি করছে—ও ?

কিন্তু আজ ওর জ্ঞান নেই। ও মুগ্ধা হরিণীর মত অভিভূত হয়ে বসে আছে। ওর সমস্ত প্রাণ-মন আবেগ আর শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে গেছে।

সভা ভাঙ্গবার পর উদ্যোক্তারা সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও অন্যান্যদের নিয়ে ওপরে উঠে গেলেন। টুক্‌লারা সকলে দাঁড়িয়ে রইল। দর্শকরা প্রায় সকলেই চলে যাচ্ছে। হল আর বাড়ীটা শূন্য হয়ে গেল। হলের আলোগুলো কয়েকটা নিভিয়ে চেয়ার টানাটানি করছে দারোয়ানেরা। কিন্তু অমিতাদের সঙ্গে টুক্‌লা দাঁড়িয়েই রইল সিঁড়ির তলায়। কিসের অপেক্ষায় ওরা জানে না। কিন্তু এটুকু জানে যে অন্ততঃ আর একবার কাছ থেকে না দেখে ওরা যেতে পারে না। সিঁড়ির মুখেই দাঁড়িয়ে রইল ওরা। রাত নটা বেজে গেছে কখন ! নটা অবধি মায়ের অনুমতি ছিল। কিন্তু আজ নয়। আজ যেন সময়, অনুমতি এ সবের কোন অর্থ নেই তাদের কাছে। কটি মুগ্ধা কিশোরীর মনে উৎকণ্ঠা, শ্রদ্ধা আর আকুতি ছাড়া আজ আর কোন কিছুর স্থান নেই যেন।

অনেকক্ষণ বাদে ওঁরা নীচে নেমে এলেন। সাদা খদ্দরের ধুতির কোঁচা লোটাচ্ছে, সাদা জুতোর ওপর। সাদা চাদর। সব সাদা।

ঈশ্বর কি সব কিছু সুন্দর করে পাঠিয়েছেন ? গলার মালাগুলো হাতে ঝুলছে ওঁদের। পান খেয়ে হেসে কথা বলতে বলতে নামছেন ওঁরা। ঠিক যেন সাধারণ মানুষের মত। অবাক হয়ে স্থির পুতুলের মত তাকিয়ে রইল টুক্‌লা। কি কথায় ওঁরা হাসাহাসি করছেন ঠিক সাধারণ মানুষের মত কথাবার্তায় ? ভেবে পায় না টুক্‌লা। ওর মনে কিছু প্রশ্ন ছিল কি ? মেয়েদের কথা ? ভারী ভারী ভাবনা ? না কিছু নয়। আজ আর কিছু নয়। তুচ্ছ প্রশ্ন নয়, জিজ্ঞাসা নয়, এক অপার বিস্ময়। অগাধ শ্রদ্ধা। উনি কি আমাদের মতই সাধারণ মানুষ ?

বৌদি তুমি দাদার গাড়ীতে যাও। আমরা এঁদের সঙ্গে কথা শেষ করে পরে যাব।

ভাবতে পারে না টুক্‌লা।

বৌদি! দাদা!

সবতো সহজ মানুষের মত সম্পর্ক।

সবতো সাধারণ মানুষের মত কথা।

সব, সব! কি আশ্চর্য!

ওদের—একেবারে সামনে এসে পড়লেন ওঁরা।

কি ?—

দেব-দুর্লভ হাসি হেসে জিজ্ঞেস করলেন সুভাষ বোস।

ওরা প্রণাম করল।

আবার! আবার! আবার!

কি নাম তোমাদের ?

আবার প্রণাম। নিজেদের সমর্পণ করল ওরা। এ ব্যাকুলতার শেষ নেই!

এ শ্রদ্ধার শেষ নেই!

এই কলেজের ছাত্রী আমরা!

সাহস এনে বলল অমিতা।

বেশ বেশ! সভায় এসেছিলে? তোমাদেরও এগিয়ে আসতে হবে।

ওঁর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারবে না ওরা। উজ্জ্বল চোখে তাকাল টুকলা।

তুমিও এই কলেজে পড়?

টুকলার মুগ্ধ বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন সুভাষচন্দ্র।

না।—

প্রণাম করল টুকলা। লুটিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করে দিয়ে।

তিল তুলসী দিয়া, এ দেহ দিনু পায়।

মনে মনে বলল অমিতা।

চলুন অনেক রাত হল।

একজন বললেন উদ্যোক্তাদের মধ্যে থেকে।

চলুন।

মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে রইল ওরা।

ওদের আবার নমস্কার করে এগিয়ে গেলেন সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র আর অন্যরা।

আর ওরা হেঁটে হেঁটে বাড়ী ফিরল।

সেদিন রাত্রে খাওয়ার কিছু পরেই সুধাময়ীর বুকের ব্যথাটা বাড়ল। প্রসন্নবাবু বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। রোগের ব্যাপারে ব্যস্ত হওয়াই তাঁর স্বভাব। বড় অসহায় বোধ করেন উনি। নিজের মায়ের অসুখেও শুধু বিব্রত বোধ করে কাতর হওয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারতেন না উনি। সুধাময়ী না থাকলে কি হত বলা যায় না।

মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই সব ব্যাপারে আরও অসহায় বোধ করেন যেন। নিয়মিত দৈনন্দিন জীবনের কোথাও যেন কোন বিশৃঙ্খলা থাকবে না এই তাঁর বিশ্বাস। সে বিশ্বাসে আঘাত লাগলে, সংসারে একটু বিশৃঙ্খলা এলে শিশুর মত অসহায় ও বিরক্ত হয়ে ওঠেন তিনি। মা থাকতে কিছু ভাবেননি। তারপর সুধাময়ী। কিন্তু টুকুলা হওয়ার পর থেকেই সুধাময়ীর শরীরটা বেশ ভেঙ্গে পড়ল। পুরান ঝি মতির মাকে ভরসা করে সুধাময়ীই হাল ধরে আছেন সংসারে, কিন্তু তাঁর এই অসুস্থ শরীর প্রসন্নবাবুকে ভাবিয়ে তোলে। মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই তিনি সুধাময়ীকেই অবলম্বন করতে চান কিন্তু সুধাময়ীকে নিয়েই তো তাঁর ভাবনা; তাই সুধাময়ীর ভালপিসী বা ফুলমাসী বা ঐ রকম কেউ না কেউ এসে প্রায়ই থাকেন এ বাড়ীতে। তাতেও খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করেন প্রসন্নবাবু।

গত সপ্তাহে সুধাময়ীকে একটু ভাল দেখে ভালপিসী তাঁর নিজের দেশে ফিরে গেছেন। তাঁর ছেলে এসেছিল নিতে। সেখানেও তো সংসার আছে। তাছাড়া বাড়ীতে আঁতুড়ের ঝামেলা আছে। মা না গেলে কে ধরবে সংসারের হাল। এ সময়ে তাঁকে বিশেষ দরকার।

সুধাময়ী তাঁর ভাই রামপ্রসাদকে বোঝাতে চেয়েছিলেন কিন্তু ক্রমশঃ ভুল বোঝার সম্ভাবনা দেখে ভালপিসীর যাত্রার জন্য বাক্স গুছিয়ে দিতে বললেন অমিতাকে। অমিতাই করে এসব। পরিপাটী করে সব গুছিয়ে দিল দিদিমার জন্য। দাঁত নেই তবু নারকেল আর তিলের নাড়ু খেতে ভালবাসেন; সেগুলোকে ছেঁচে ব্যবস্থা করে সবই ভরে দিল কৌটয় কৌটয় অমিতা। সুধাময়ী বসে থেকে একজোড়া থান থেকে সন্দেশ খাবার পর্যন্ত সব সাজিয়ে দিলেন বাক্সে আর ঝুড়িতে। রামপ্রসাদ আপত্তি করছিল এত মালের বহর দেখে কিন্তু সুধাময়ী শোনেননি। তাঁর মা নেই, ছেলেবেলা

থেকে এই সব পিসী মাসীমারাই তো তাঁর মায়ের স্থান নিয়েছেন। একথা আজ রামপ্রসাদকে তিনি বোঝাবেন কি করে?

প্রসন্নবাবু এই অসুখের ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে আবার কাউকে আনাবার জন্য ব্যগ্র হলেন। কিন্তু টুক্‌লা মোটেই আমল দিলে না প্রসন্নবাবুর দুর্ভাবনাকে। বরং প্রতিবাদের সুরেই সে বলল—

অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন বাবা। আমরা তো আছি।

তা তো জানি টুক্‌লা মা। কিন্তু তোমরা তো জান না তোমাদের মায়ের এই শরীরে···

কিছু ভেব না বাবা। আমি আর দিদি সব করবো। মতির মা তো আছে।

তা জানি মা। কিন্তু তোমাদের লেখাপড়া। তাছাড়া তোমার মাও বড় একা বোধ করেন।

বাবা! ঠিক করেছি, এবার আর মাকে একা থাকতে দেব না, সর্বক্ষণ আমি আর দিদি মার সঙ্গে গল্প করবো।

কিছুতেই আমল দেয়নি টুকুলা আবার কোন এক মাসী বা পিসীর আসার সম্ভাবনাকে। এবার অমিতারও মত ছিল এতে। সত্যি বড় যেন শাসনের নাগপাশে বাঁধতে চায় এই সব বুড়িরা। মা তো এমনিতে বেশ! কিন্তু এক একসময় এমন কঠিন হয়, শুধু ঐ সব বুড়িদের পরামর্শে।

তাছাড়া পানসাজা কুটনো কাটা এ সব ব্যাপারে সাহায্য করতে মতির মাই তো পারে। তবু মা তাকে এসব কাজ দেবেন না। ভালপিসী যাবার পর সুধাময়ী নিজেই টুকিটাকি সব কাজ করছিলেন। টুক্‌লা আর অমিতা কতবার জিজ্ঞেস করেছে, এগিয়ে এসেছে, কিন্তু সুধাময়ী আমল দেননি ওদের এইসব ঘর-কন্নার কাজে। সব তাঁর নিজে করা চাই। টেবিলক্লথ পাতা থেকে, জলখাবারের ময়দায় ময়ানের পরিমাণ দেওয়া, সব, সব। সব

করবেন তিনি নিজের হাতে, সব দেখবেন তিনি নিজের চোখে। সারাদিন একটুও বিশ্রাম করতে চান না। তোলা উনুনে কত রকমের খাবার করবেন তিনি। সন্ধ্যাবেলা শুধু আর পারেন না। সুস্থ শরীরে হয়তো কিছুই নয় কিন্তু যে কালব্যাধি সুধাময়ীকে দিনে দিনে কুরে কুরে খাচ্ছে, তার জন্য নিজের ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও সন্ধ্যাবেলা তাকে বিশ্রাম নিতেই হয়। রোজ সন্ধ্যাবেলা তাঁর জ্বর আসে। এত চিকিৎসাতেও রোগের কোন সুরাহা হচ্ছে না।

টুক্‌লারা রোগের এত খবর জানত না। •তাই যখন বলেন ঠিক আছি, সেটুকু তারা সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করে। মায়ের ঐ আশ্বাসটুকু অনায়াসে মেনে নিতে ওদের বাধে না।

প্রসন্নবাবুকেও ডাক্তাররা অসুখের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছুই বলেননি। রোজকার নিয়মে ডাক্তার তার বরাদ্দ মত সুধাময়ীকে দেখে যান, মাঝে মাঝে ইন্‌জেকশন দেন, বাড়াবাড়ি হলে আরও ডাক্তার আসে, সবাই ব্যস্ত হয়, মেয়েরা স্কুলে যাওয়া বন্ধ রাখে, প্রসন্নবাবু অফিস কামাই করেন, মায়ের ভাই বা আত্মীয়রা কেউ এসে পড়েন, বন্ধুরাও খবর পেলে আসেন।

তারপর কমে গেলে আবার যে-কে-সেই। নিত্যকালের পুরনো রোগী সম্বন্ধে লোকে বোধহয় একটা নিশ্চিন্ত ভাব নিজেদের মনেই তৈরী করে নেয়।

শনিবার রাত্রে অমিতা আর টুক্‌লা শুতে যাবার আগে মায়ের শরীর নিয়ে আলোচনা করেছিল। যদিও তারা জানে ভালপিসী বা রাঙামাসী কেউই এখন আসতে চাইছে না প্রসন্নবাবুর বারবার লেখা সত্ত্বেও, তবু বোধহয় তাদের একজনের আসা ভাল।

সত্যিই মা তাদের বড় নিঃসঙ্গ। তবু সন্ধ্যাবেলা মাঝে মাঝে ফুটকি-মাসী বা কেউ আসেন, গোপাল-মামা গ্রামাফোন রেকর্ডে পালা শোনান, বিকাশদারাও এসে গল্প করে। কিন্তু সবই-তো সন্ধ্যাবেলা। তখন তো বাবাও এসে পড়েন। আর সারাদিন? সারাদিন মাকে যে বড় একা থাকতে হয় তাঁর অসুস্থ শরীর নিয়ে। পাড়া বেড়াতে বা ঝি-চাকরদের সঙ্গে গল্প করতে মা ভালবাসেন না, সিনেমা হলে মায়ের দম বন্ধ হয়ে আসে; মাঝে মাঝে থিয়েটার দেখা ছাড়া অন্য কোন আনন্দ মায়ের জীবনে আর নেই। অবশ্য ছুটির দিনে প্রায়ই ওরা বেরিয়ে পড়েন সপরিবারে লম্বা মোটর পথে। কখনও বেলুড়, কখনও দক্ষিণেশ্বর। কিন্তু সেও প্রতিদিন নয়, নিয়মিত নয়। রোজগার একঘেঁয়ে জীবনযাত্রার কিছু ব্যতিক্রম মাত্র।

এবার কিন্তু অমিতা চুপ করেই ছিল, যখন টুক্‌লা তার মায়ের নিঃসঙ্গতার কথা তুলল, তখন সে আর পারল না বলল:

আহা মা তো ইচ্ছে করেই আমাদের দূরে সরিয়ে রেখেছে!

কি করে?

কেন! আগে রোজ সুবিনয় আসত, মা কত গল্প করতো, আমিও থাকতাম সর্বক্ষণ মায়ের কাছটিতে। তারপর মা ওকে বারণ করে দিল আসতে। ব্যাস্।

তাতে কি?

বাঃ আমাদেরও নিজস্ব জীবন আছে!

তার মানে?

ও তুই বুঝবি না।

বাঃ এতে মার সঙ্গে গল্প করায় তোর বাধা কোথায়?

আহা এ বাড়ীতে আড্ডা জমাবার আর আমার সময় কোথায়?

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল টুক্‌লা। তারপর আস্তে আস্তে বলল—

মাকে বলবো দিদি, সুবিনয়দাকে আবর আসতে বলার জন্য ?

পাগল। এখন তো আর সে সুবিনয় নেই। খুব গম্ভীর হয়ে গেছে ও। ওর আত্মসম্মানজ্ঞান খুব বেশী জানিস। একবার যেখানে অপমানিত হয়ে গেছে, সেখানে আর ও আসে ?

অপমান তো আর মা করেনি। তখন মনে আছে রাঙাদিদিমার কাণ্ডটা ? ভালদিদিমার ওপর যায় বাবা ঐ বুড়ি। কি হুলুস্থুল কাণ্ডই না করল তোকে সুবিনয়দা হাত ধরে কি জানি কি বলছিল বলে ?

মনে আবার নেই ? কিন্তু বলি না বলে। সামান্য ব্যাপারকে এরা এমন বিরাট করে তোলে। অযথা নোংরাম।

সত্যি।

মানে হয় কোন ? বুড়ি তো চলে গেল বাবা।

ঠেকাতে পারল কিছু ? প্রেম বড়······

যা বলছিস ! সত্যি।

মুখ টিপে হাসল টুক্‌লা।

এবার অমিতা গম্ভীর হয়ে গেল। নাঃ টুক্‌লার সঙ্গে এত কথা বলা বলা ঠিক হয়নি। এক ফোঁটা মেয়ে। ওর থেকে তিন বছরের ছোট হলেও মনে আরও ছেলেমানুষ।

কিন্তু কিই বা করবে ? ওর নিজের মনটা কার কাছে খুলে ধরবে ? কবে যে টুক্‌লাটা বড় হবে, একটু গম্ভীর হবে, সব কথ বুঝতে পারবে। এই তো সবে চোদ্দ।

আড়চোখে একবার তাকাল অমিতা টুক্‌লার দিকে।

মোটা মোটা বিনুনি দুটো হাতে নাচাচ্ছে টুক্‌লা, আর দেরাজে কি খুঁজছে।

হাসি পেল অমিতার। মা বলেন টুক্‌লার দোকানপাট। সত্যিই ঐ দেরাজগুলোতে টুক্‌লার কি আছে আর কি নেই।

কি খুঁজছিস রে?

একটা চিঠি।

কার?

শান্তির। রমা দিয়েছে ওকে।

হঠাৎ?

হঠাৎ আবার কি? প্রায়ই তো রমা খামে ভরে ওকে চিঠি দেয়।

কেনরে? তুই বুঝি চিঠি দেওয়া নেওয়া করিস?

হ্যাঁ ভাই। আমার এই একটা পার্মানেন্ট চাকরি আছে পোস্টম্যানের। এই যেমন শান্তির, তারপর তোদের।

টুক্‌লা!

ধমক দিল অমিতা।

আহা তোদেরটাতেই তো হাতেখড়ি।

বেশ তোকে আর চিঠি দিতে হবে না।

চিঠিতে বুঝি আর দরকার হবে না? স-ব দেখা হলে বলবি?

হঁ্যা।

গম্ভীর হয়ে শুয়ে পড়ল অমিতা নিজের খাটে গিয়ে।

খটখট শব্দ করে একটার পর একটা দেরাজ খুলছে আর বন্ধ করছে টুক্‌লা।

টুক্‌লা! আলো নিভিয়ে দাও। আমার ঘুম হচ্ছে না।

ও পাশ ফিরে শো! চোখে আলো লাগবে না।

আমি যে চিঠিটা কোথায় রাখলাম···এই যে পেয়েছি। বাব্বা যা ভয় হয়েছিল! বোঝ একবার। রেশপন্‌সিবিলিটি নিয়ে শেষে অকৃতকার্য? কদাচ না।

কি লেখে রে রমা শান্তিকে। রোজ তো তোদের সব দেখা হয় পার্কে—

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল অমিতা।

কি জানি। বোধ হয় ভাল লাগে চিঠি লিখতে।

সত্যি তাই রে!

অমিতা অনেকক্ষণ বাদে বলল।

চিঠি লেখায়—আলাদা আনন্দ।

পাশ ফিরে শুয়ে চোখ বুজল অমিতা।

অনেকক্ষণ ঘুম আসল না টুক্‌লার। আলো জ্বললে আবার দিদির অসুবিধে না'হলে গল্পের বইটা শেষ করতে পারত। ঠিক নটার ভেতর দিদির ঘুমোনো চাই। অবশ্য বহুদিন রাত নটা পর্যন্তই টুক্‌লা জেগে থাকতে পারে না। কিন্তু যেদিন পার্কে কোন কিছু বিশেষ ঘটনা ঘটে বা স্কুলে কিছু হয় সেদিন অনেক রাত অবধি সে ঘুমোতে পারে না। মনের মধ্যে কথাগুলো নাড়াচাড়া করে। কতদিন এমন হয়েছে। ভোরবেলা তড়াক করে লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে টুক্‌লা, তখন মনে হয় অসহ্য আনন্দ, কি যেন একটা হবে, কি এক অভাবনীয় ব্যাপার তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ভারী খুশী লাগে মন। অথচ যেভাবে ভেবেছিল সারাদিন হয়তো তার কিছুই হল না; তবু সন্ধ্যাবেলায় তার মন অপ্রসন্ন হয়নি। অপ্রসন্নতা টুক্‌লা কখনও অনুভব করে না। এক আনন্দ ভাবে, এক কল্পনায় খুশী হয় অন্য আনন্দ সে পায়, অন্য সুখ সে আহরণ করে নেয়। পৃথিবীতে আনন্দের অভাব কি। ভোর থেকে রাত্রি অবধি কত আনন্দ কত মজা। শুধু যা মার অসুখের বাড়াবাড়ি হলে খারাপ লাগে। তখন ভারী কান্না পায়। আবার মা ভাল হয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যায়। আবার মা কুটনো কাটেন, সব কাজ করেন, তাদের সঙ্গে বেড়াতে যান।

মনে মনে হাসে টুক্‌লা। সে কখনও দুঃখকে ভয় পায় না। দুঃখ তো চিরদিনের নয়? ভালভাবেই জানে তা টুক্‌লা। ভগবান তাকে পরীক্ষা করতে গিয়ে হেরে গেছেন। সত্যিই। ভাবল টুক্‌লা। দুঃখের আড়ালে যত আনন্দ দিয়েছেন সবটুকুই সে বুঝে

নিচ্ছে, সবটুকু আহরণ করে নেবার ক্ষমতা তার আছে। দুঃখকে সে আমলই দেবে না। জীবনে দুঃখের স্থান কতটুকু?

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে···

মনে মনে ভাবল টুক্‌লা। তারপর কখন ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল।

সেদিন স্কুল থেকে প্রায় লাফাতে লাফাতে ফিরল টুক্‌লা।

জানিস দিদি। এবার স্কুলের প্রাইজের সময় আমায় ইলার পার্ট দেওয়া হয়েছে।

রাজারাণী হচ্ছে বুঝি? ওঃ আমার ফেভারিট্।

অমিতা আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ। সুমিত্রার পার্ট মেন হলেও জানিস তো ইলার গানের জন্য কিরকম অথরব্যাকিং। ব্যস্ ওতেই আমি উইন করবো, দেখিস।

সুমিত্রা কে সাজছে রে? আমাদেরও একবার হবার কথা হয়েছিল।

ক্লাস টেনের অসীমাদি।

অসীমাকে দেখতে ভারী সুন্দর। তাই বোধহয় করেছে।

তা কেন? উনি অভিনয়ও খুব ভাল করেন।

দিদি জানিস! সুমনাদি তোর কথা বলছিলেন।

হ্যাঁ আমার সেবার করবার কথা ছিল সুমিত্রার পার্টটা।

তোর চেহারার কত প্রশংসা করছিলেন। আমার তো গর্বে বুক দশহাত।

ভাগ্—

মুখে বললেও হঠাৎ সামনে বিরাট আয়নায় নিজের চেহারাটা একবার দেখে নিল অমিতা।

টুক্‌লার নজর এড়াল না। সজোরে হেসে উঠল ও।

আচ্ছা দিদি, তুই খুব কন্‌সাস্ না?

কি?

এই তোর চেহারা সম্বন্ধে?

সবতাতেই তোর ফাজলাম, না ?

অমিতা গম্ভীর হবার চেষ্টা করল।

সত্যি তোদের ভারী মজা। এত ভাল চেহারা।

কেন তোর চেহারা খারাপ বুঝি ?

খারাপ না হলেও তোর মত তো নয়।

আহা! তোর মত অত ফর্সা রং পেলে বর্তে যেতাম। ছাখ মিলিয়ে, তোর হাতের রং ঠিক শাঁখের মত সাদা। আর আমার ?

টুকুলার পাশে নিজের হাতটা মেলে ধরল অমিতা।

ছাই, কি হবে রংএ। পেণ্ট করলে তো সব রংই এক।

সব সময় তো মানুষ পেণ্ট করে থাকে না।

আমি তো আর সব সময়ের কথা ভাবছি না। আমি ভাবছি থিয়েটারের কথা।

জোরে হেসে উঠল অমিতা।

ওঃ তোর বুঝি খালি এই থিয়েটারের জন্য ভাবনা হচ্ছে ? কেন ? সুমিত্রা হতে পারলি না বলে ? কেন ইলাও তো সুন্দরী রাজকন্যা।

তা না রে। আসলে হঠাৎ মনে হল।

কেন ?

এমনি।

বল্ না।

কি জানিস ? কাল হঠাৎ মনে হল আমার মুখটা ভাল হলে বেশ হত।

সে আবার কি ? তোর মুখ কি খারাপ ?

খারাপ নয়! বলছি তোদের মত, শান্তির মত বেশ কাটাকাটা হলে ভাল হত।

শান্তির মুখ কাটাকাটা হলে কি হবে, তোর কাছে ওর চেহারা লাগে না।

তবে যে বিকাশদা বল্লে ·········

কি বল্লে ?

অমিতা যেন সূত্র পেল একটা।

না, কিছু না।

বেশ টুকলা, আমাকে বলবি না তো ?

বলবার কিছু নাই রে।

নিশ্চয়ই আছে। তা না হলে সেই কাল থেকে তুই ভাবছিস্ ?

কে বললে কাল থেকে ভাবছি ?

আমি বলছি।

জোরের সঙ্গে বলল অমিতা। সমবেদনায় বুকটা টনটন করছে।

দৌড়ে এসে অমিতার গলা জড়িয়ে ধরল টুকলা, সত্যি রে দিদি। তোর অদ্ভুত ক্ষমতা, কি করে আমার মনের কথা জানতে পারলি ?

আমি তোর বোন যে। আমাকে বল টুকলা !

জানিস দিদি !

একটু থেমে বলল টুকলা।

এমনি রে। কখনও এসব কথা ভাবি না, তুই তো জানিস কাল বিকেলে পার্ক থেকে ফিরে শান্তির সঙ্গে কথা কাটাকাটি হল বলে মনটা খারাপ ছিল। হঠাৎ বিকাশদা শান্তির পক্ষ নিয়ে বলল, "শান্তি কিছু ভেব না। তোমার মতই ঠিক, আমারও সেই মত। জান তো আমি তোমার সব কথাই বিশ্বাস করি। কেন না লোকের মনের ছাপ মুখে পড়ে। তোমার সুন্দর মনের ছাপ তোমার সুন্দর মুখে পড়েছে।" শান্তি যেন কেমন লজ্জা পেল। আমিও।······আচ্ছা দিদি আমার মুখ খুব সুন্দর হলে আমার মন আরও সুন্দর হত ? বল না রে ?

চোখে জল এসে গেল অমিতার। চুপ করে শুনছিল সে টুকলার কথা। তার এই পাগল বোনের মনের খবর বিকাশ কি জানবে ? এর থেকে সুন্দর মন আর আছে নাকি পৃথিবীতে ? অমিতা তো জানে না।

সস্নেহে জড়িয়ে ধরল অমিতা টুক্‌লাকে। পাগলি! একেবারে পাগল।

তোর মন কত সুন্দর, মুখও। বিকাশ জানে না। কতগুলো বই-এর কথা না বুঝে বলে গেছে। মুখের সৌন্দর্য কি কাটাকাটা নাক মুখে? বড় চোখে কি নিখুঁত গড়নে? সে সৌন্দর্য অন্য রে! বিকাশ জানে না, মনের যে সৌন্দর্য মুখে পড়ে তা একেবারে অন্য। টুক্‌লা! বড় হলে দেখবি সময় সময় অতি কুৎসিত লোকেরও একটা সৌন্দর্য আছে, যদি তার মনের সৌন্দর্যের সন্ধান পাস।

কিছু না বলে দিদির বুকে মাথা রেখে চুপ করে বসে রইল টুক্‌লা। এ যেন অন্য টুক্‌লা। দিদির কথাগুলো সে ভাবছে। তার মন সুন্দর কি খারাপ, এ নিয়ে ভাবনা করা দূরের কথা, এ নিয়ে যে ভাবনা করা যেতে পারে তাই তার কল্পনার বাইরে ছিল। কিন্তু কেন জানি কাল বিকাশের কথায় তার মনে ছোট্ট একটু ঘা লেগেছিল। কেন তা টুক্‌লা জানে না। বিকাশের কাছে আশা করেনি বোলে? টুক্‌লা বুঝতে পারে না কেন? ভুলে গেলেও মাঝে মাঝে তাকে এই চিন্তা উন্মনা করেছিল। স্কুলে কতবার সে শান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছে, খেলতে খেলতে কতবার।

দিদিকে এখন কথাটা বলতে পেরে যেন বাঁচল সে। সত্যি দিদি না থাকলে তার কি হত? চিরদিন সে আর দিদি এমনি থাকবে। সে আর দিদি। এমনি বন্ধুত্ব আর ভালবাসা। তারা দুজন আর কেউ নয়। হ্যাঁ আর মা বাবা। সে, দিদি, মা আর বাবা। এই তার পৃথিবী, এই পরিপূর্ণতার ভেতরই সে চিরদিন সুখে বেঁচে থাকবে। তার আর কিছুর প্রয়োজন নেই।

টুক্‌লা!

অনেকক্ষণ পর যেন অমিতা ডাকল।

উঁ!

রবীন্দ্রনাথের 'রাজায়' পড়িসনি ? রাণী পারেনি কিন্তু সুরঙ্গমা দাসী হয়েও কেমন রাজার আসল রূপ চিনতে পেরেছিল ?

চুপ করে রইল টুক্‌লা।

একটা গান কর না টুক্‌লা।

অমিতা টুক্‌লাকে ছেড়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। ওরও উন্মনা লাগছে।

সুমনাদি ইলার কতগুলো গান ঠিক করেছেন।

টুক্‌লা যেন আবার নিজেকে ফিরে পেল।

তারি একটা গা। তোর গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত ভারী মানায়। অনেকটা হেমন্তর মত।

ওঃ হেমন্তর গলা আমার স্বর্গ।

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল টুক্‌লা।

কাল তো রেডিওতে হেমন্তর গান আছে। দেখিস এককালে ও খুব নাম করবে।

করবেই তো। যা গিফটেড্ ভয়েস। জানিস টুক্‌লা। সুবিনয়ের সঙ্গে হেমন্ত মুখার্জীর আলাপ আছে। বলছিল ও নাকি অদ্ভুত সিমপল্ আর ভাল লোক। মোটে অহঙ্কার নেই।

গলা শুনেই আমার তা মনে হয়।

সুবিনয় বলেছে, যে কোনদিন ও হেমন্তর গানের ব্যবস্থা করতে পারে।

কি করে আর হবে। মা যে এ্যালাউ করবে না এ বাড়ীতে। নাহলে ··

আমার নিজের বাড়ী হলে দেখিস সেখানে এই সব জলসা করবো।

তার মানে ? তুই কি আলাদা নিজের বাড়ী করবার কথা ভাবছিস নাকি ?

টুক্‌লার স্বপ্নে ছেদ পড়ল।

একটু আগেই সে ভাবছিল, তার পরিপূর্ণ সুখী জীবনের কথা দিদি মা আর বাবাকে নিয়ে।

না রে—ভাবিনি। এমনি বললাম।

বোনকে আঘাত দিতে ইচ্ছে করল না অমিতার।

জানিস দিদি! আমি কোনদিন বিয়ে করব না। তুইও করিসনি রে। সুবিনয়দাকেও না। বুঝলি?

যাঃ—লজ্জিত হল অমিতা।

আমরা চিরদিন এমনি থাকব, বুঝলি দিদি।

এমনি। আমাদের জগতে আর কেউ আসবে না আমি আসতেই দেব না।

জোরের সঙ্গে বলল টুক্‌লা।

আচ্ছা দিসনি—পাগল। এখন তৈরী হয়ে নে তাড়াতাড়ি।

ভুলেই গিয়েছিল যেন ওরা।

কেন?

বাঃ, আজ শনিবার মনে নেই?

তাতে কি?

সত্যি টুক্‌লা তুই কি? কত করে মা'র পারমিশান আদায় করলাম। সবাই মিলে 'পরদেশী' দেখতে যাব না?

সত্যি? গুড্!

একপাক ঘুরে গেল টুক্‌লা। মনের বিষণ্ণতার মেঘ যেন কেটে গেছে। খুরশীদ নাকি অপূর্ব গেয়েছে।

গুনগুন করতে লাগল, 'পহ্‌লে মুহব্‌ত সে'—তাড়াতাড়ি নিস। —এখনি চিনুরা এসে পড়বে।

আমার তো পাঁচ মিনিট!

সাবানদানিটা তুলে নিয়ে আবার গুনগুন করতে করতে স্নানের ঘরে ঢুকল টুক্‌লা।

সরলাদেবীর বাড়ীতে চায়ের নেমতন্ন ছিল ওদের। লক্ষ্ণৌ এ থাক্‌তে ওদের আলাপ ছিল ওঁর সঙ্গে। টুক্‌লার গান খুব ভালবাসেন তিনি। তাই তাঁর বাড়ীতে প্রায়ই ডাক পড়ে ওদের।

সুন্দর হাল্কা পেঁয়াজ-রংএর শাড়ীতে চমৎকার মানিয়েছে অমিতাকে। সুধাময়ী বারবার বললেন এর সঙ্গে চুনির সেটটা পরবার জন্য। কিন্তু অমিতার ইচ্ছে নয়। তবু প্রতিবাদ করা তার স্বভাব নয় বলে শেষ পর্যন্ত মায়ের ইচ্ছে মতই সাজল।

কিন্তু গোল বাঁধল টুক্‌লাকে নিয়ে।

তোমাকে এ সাজে নিয়ে ওখানে যাওয়া যায় না।

বারে আমিই তো চীফ গেস্ট।

খালি কথাই শিখেছ।

সুধাময়ী ধমক দিলেন।

যা বলছি শোন। আজ অন্ততঃ আমার কথা শুনে নীল রংএর শাড়ীটা পর।

না মা লক্ষ্মীটি। শাড়ী পরলে বড় অস্বস্তি হয়।

ও আবার কি? বাঙ্গালীর মেয়ে শাড়ীতে অস্বস্তি? নিজের শাড়ীর আঁচলে পিন করতে করতে বললেন সুধাময়ী।

কিন্তু মা! তোমাকে যা দেখাচ্ছে স্‌প্লেনডিড্।

জড়িয়ে ধরল মাকে টুক্‌লা।

সাদা সাজে তোমাকে এমন দেখায় মা। ঠিক যেন সরস্বতী। মা তুমি কেন নীল শাড়ীটা পর না, অদ্ভুত দেখাবে।

আমার কি আর রঙীন পরবার বয়স আছে? যাঃ টুক্‌লা তাড়াতাড়ি শেষ কর। ছ'টার ভেতর পৌঁছতে হবে।

মা নীল শাড়ী পরলে কিন্তু আমাকে মুক্তোর মালাটা দিতে হবে।

ছিঁড়বে না তো ?

পাগল হলে ? সযত্নে রাখব।

গম্ভীর হয়ে বলল টুকলা।

আলমারি খুলে সুধাময়ী আবার গয়না বার করতে বসলেন।

ওরা যখন সরলাদেবীর বাড়ীতে পৌঁছল তখন ছটা বেজে গেছে।

বাড়ীর সামনে সার সার গাড়ী দাঁড়ান। এই সবের জন্যই সুধাময়ী অসুস্থ শরীরেও এখানে নিমন্ত্রণ রাখেন। এই তো চাই। ভাল অভিজাত সমাজে মিশলে মেয়েদের রুচিও উঁচু হবে। তাছাড়া মনের মধ্যে সর্বদাই অমিতাকে সুপাত্রস্থ করার চিন্তা তাঁকে পীড়িত করে তোলে। বারবার অমিতার দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন তিনি। মেয়ে তার অপছন্দের নয়।

অমিতার সঙ্গে সহজেই আলাপ হয়ে গেল 'সুমা' নামে মেয়েটির। টুকলা ভেবেই পায় না কি করে দিদি ওর সঙ্গে এত আলাপ করছে। অসম্ভব কারুকার্য করা মুখে, কষ্টের সঙ্গে হাসছে মেয়েটি, বারবার কাপড় ঠিক করছে। আলতো আঙুলে কপালে ফ্যানের হাওয়ায় উড়ে আসা চুলগুলোকে ঠিক করছে ; হাতটাকে কোথায় রাখবে ভেবে পাচ্ছে না। সুন্দরী বটে কিন্তু সে সৌন্দর্য টুকলার ভাল লাগে না। তার পাশে তার সহজভাবে সজ্জিত দিদিকে কত সুন্দর দেখাচ্ছে। দিদিটা জানেও না ও কত সুন্দর।

প্রথম পরিচয়ের পালা শেষ হতেই সরলাদেবী সুমাকে বললেন একটি গান গাইতে। কিছুক্ষণ করতে হবে বোধ হয়, তাই না না করে সুমা গিয়ে পিয়ানোয় বসল। অপূর্ব আঙুলগুলো সুমার, টুকলা

ভাবল। কি সযত্নে রাখা, কি সুন্দরভাবে পালিশ করা। যেন ছুঁতে ভয় হয়। কিছুক্ষণ পিয়ানো বাজিয়ে হঠাৎ কৃত্রিম নাকিসুরে গান ধরল সুমা। চমকে গেল টুক্‌লা। এ কি? কোথা থেকে এ আওয়াজ বের করছে সুমা? গলা দিয়ে? সে তো চেষ্টা করলেও এ আওয়াজ বার করতে পারবে না! অদম্য হাসি চাপতে গিয়ে ঘামতে লাগল টুক্‌লা। দিদির দিকেও তাকাল না, পাছে হেসে ফেলে। ভাগ্যে শান্তি বা বিকাশদারা কেউ নেই। তাহলে নির্ঘাৎ হেসে ফেলত। সকলের দিকে তাকিয়ে দেখল, স্থির হয়ে বসে শুনছে সবাই। শুধু সরলাদেবী তাকিয়ে আছেন অমিতার দিকে। অমিতাও মুগ্ধ। সুমা এত গুণী? এত লোকের সামনে পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইছে? অমিতা তো জীবনেও পারত না। সুধাময়ী লক্ষ্য করেছেন সরলাদেবীর দৃষ্টি। কেমন মেয়ে তাঁর, গর্বিত হলেন তিনি। এর বিয়ে দেবেন তিনি সত্যি অভিজাত ঘরে হীরের টুকরো ছেলের সঙ্গে। কত ঘটা করবেন তিনি। সরলাদেবীর হাতেই কত সুপাত্র। পরে কথা বলবেন তিনি, অন্য একদিন। মনে পড়ল তাঁর সুবিনয়ের কথা। ভাবলেও কেমন হয়। খালি ফরফর করে ইংরেজী বলা আর ঘুরে বেড়ান ছাড়া কি আছে ওর? এখনও ছাত্র সে। তাঁর অমিতার কি যোগ্য? মনে মনে হাসলেন তিনি। কদিন এইরকম সব পার্টিতে ঘোরালেই মন ঠিক হয়ে যাবে মেয়ের, দেখাশোনা তো বন্ধই করেছেন তিনি। এবার ধীরে ধীরে এগোতে হবে, আর দেরী করা ঠিক নয়।

সুমার গান শেষ হতে, ও হাতের ছোট্ট সুগন্ধি রুমালে কপালটা আলতোভাবে মুছে নিয়ে সোফায় এসে বসল।

হাউ লভ্‌লি! কি সুইট ভয়েস।

ওপাশের লেডী সরকার মন্তব্য করলেন। কার কাছে গান শেখ তুমি?

ও পণ্ডিত আমীর খাঁর ছাত্রী। আজকাল ক্লাসিকালই শিখছে।

এখানে তো সঙ্গত হবে না তাই গাইল না।

ওর মা বললেন।

পায়ের কাছের কাপড়টা ঠিক করতে করতে মৃদু হাসল সুমা। এ যেন কিছুই নয়। এর থেকে ঢের বেশী যেন তার প্রাপ্য।

সত্যি মিস সেন! আপনার আর একটি গান শুনতে পেলে খুশী হব।

বিশিষ্ট শিল্পপতির ছেলে, সদ্য বিলেত ফেরৎ অনিমেষ ব্যানার্জী অনুরোধ করল।

'সিমপ্লি চারমিং।'

ওর দিকে ম্যাস্‌কারা দেওয়া বড় কালো চোখ মেলে ধরল সুমা।

চারমিং গলা শোন এবার।

সরলাদেবী হঠাৎ বললেন।

টুক্‌লা গাও তুমি! শোন এর গলা! এত সহজ, সি সিঙ্গস্‌ লাইক নাইটিঙ্গেল।

ও: রিয়েলি? তাহলে শোনা যাক।

বুঝতে পারছে না টুক্‌লা। এ গান যাদের এত ভাল লাগে তাদের কি গান শোনাবে সে। কিন্তু সরলাদেবীর কাছেই তো তারা এসেছে। উনি তো তাঁর গান ভালবাসেন। দ্বিধা করল না সে।

খালি গলায় করব?

তাই কর! তোমার গলায় মিউজিক আছে। বাজনার দরকার করে না।

অবশ্য যদি চান তো আমি 'ফলো' করতে পারি আর্গানে।

ওপাশ থেকে সুমতি রায় বলে উঠল।

দরকার নেই! সরলাদেবী বললেন। ও তো বাজাতে জানে নিজেই, কিন্তু খালি গলায় ও আরও সহজ। শোনই না। টুক্‌লা আরম্ভ কর।

একটু হেসে গলা খুলে গান আরম্ভ করল টুক্‌লা।

"তোমার খোলা হাওয়ায় লাগিয়ে পালে।"

প্রাণহীন ঘরে যেন জীবনের স্পন্দন এল। সারা ঘর যেন বাজতে লাগল।

গান শেষ হতেই সকলের প্রশংসায় আবার হাসল টুক্‌লা। সকলেরই ভাল লেগেছে ওর গান। এদের বোধহয় স্বভাবই এই। সব জিনিসই এ্যাপ্রিসিয়েট্ করা। তা হোক তার নিজেরও ভাল লেগেছে। মুড্ এসেছে, আরও গাইতে ইচ্ছে করছে। আবার বলবে না তাকে গাইতে? সে যে আরও গাইতে চায়। অনেক অনেক।···বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, এই বর্ষার সঙ্গে তার গলাও যে সুর মেলাতে চায়।

আর একটা গাও।

সরলাদেবী বললেন।

কোন বর্ষার গান গাইব?

টুক্‌লা খুশী হয়েছে। ভীষণ খুশী। ভগবান কি তার কথা শুনেছেন?

যেটা ইচ্ছে। আর্টিস্টের নিজের মুডে গান গাইলে সে গান সব থেকে ভাল হয়। আমরা ডিকটেট্ করতে চাই না।

আবার গাইল টুক্‌লা—

আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে
আমার মনে।

বারবার, বারবার।···ওর মনে নবীন মেঘের সুর সত্যিই লেগেছে। যে টুক্‌লা ফ্রক পরে হৈ হৈ করে সে এ জগতের কাছে এক নতুন আনন্দ পেল। এতগুলি বড় ভারিক্কী লোক তার গানে মুগ্ধ। নিজের আনন্দে গাইতে লাগল সে।

গান, হাসি, আলোচনা, চা-পর্ব সব শেষ হয়ে গেলে বিদায়ের সময় ওদের ছু'বোনকে আদর করলেন সরলাদেবী।

ভারী লক্ষ্মী মেয়ে ছুটি তোমার। পরে তোমাকে ফোন করবো। কথা আছে তোমার সঙ্গে।

ঠিক ধরে ফেলেছেন সুধাময়ী। নিশ্চয়ই অমিতার বিয়ের কোন কথা, সারাক্ষণ যেরকম প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন তিনি অমিতার দিকে।

আমিও আসব। ফোন করে সময় ঠিক করে নেব। আপনি ওদের কত স্নেহ করেন তা তো আমি জানি।

তোমার মেয়েরা যে সকলের স্নেহ পাবার যোগ্য।

সরলাদেবী ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন। টুক্‌লা একবার তাকাল ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি সুবেশ ছেলের দিকে।

অনেকবার চোখ পড়েছে ওর। প্রতিবারই দেখেছে, তাকিয়ে আছে ছেলেটি ওর দিকে। ভারী ভাল লেগেছে কেন জানি ওকে। আরও ভাল করে গান গেয়েছে ও। এখনও যায়নি কে ও? হঠাৎ নিজের শাড়ীটা ঠিক করে নিল টুক্‌লা।

আমার শরীর অসুস্থ তাই ভাবনা, না হলে প্রায়ই আসতাম আপনার কাছে। এত ভাল লাগে।

হ্যাঁ যখন ইচ্ছে হবে, সুস্থ থাকবে, এসো। অশোক এঁদের গাড়ীটা কোথায় দেখে এঁদের তুলে দাও তো?

দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটিকে উদ্দেশ করে বললেন সরলাদেবী।

খুশী হল টুক্‌লা।

কাছে এগিয়ে এল ছেলেটি।

এটি আমার ভাগ্নে অশোক। আর এঁদের তো চেন। মিসেস চৌধুরী, তাঁর ছুই মেয়ে, অমিতা, টুক্‌লা।

আমার নাম পার্বতী।

একটু সলজ্জ হেসে বলল টুক্‌লা। টুক্‌লা নামটা কেমন ছেলেমানুষি, হঠাৎ অনুভব করল সে।

তোমার ভাল নাম পার্বতী নাকি?

সরলাদেবী হাসলেন।

ভাল জেনে নিলাম। পরে একজন ভদ্রমহিলাকে আর টুক্‌লা বলব না। কি বল?

গাড়ীতে ওঠবার সময় আবার তাকাল অশোক।

আপনার গান সত্যিই বড় ভাল লেগেছে। আমি গান খুব ভালবাসি। আপনি সকলের মনে নবীন মেঘের সুর লাগিয়ে দিয়েছেন।

আসুন না একদিন আমাদের বাড়ীতে।

টুক্‌লা নিমন্ত্রণ করল।

সুধাময়ী অবাক। তাড়াতাড়ি বললেন··

হ্যাঁ বাবা, সময় পেলে এসো। তোমাকে তুমি বললাম বলে কিছু মনে করো না। ছেলের মত।

না না মনে করবো কেন? আপনি তো মায়েরই মত।

আপনার গান শোনা হল না।

অমিতাকে বলল অশোক।

আমি গাইতে জানি না।

আস্তে উত্তর দিল অমিতা।

ও সেতার শিখছে। এখানে তো আনেনি। সুধাময়ী তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন।

না না সে কিছু না। সবেমাত্র···

কিছু না কেন? মাস্টারমশাই বলেছেন ওর হাত নাকি খুব মিঠে। আমারও তো খুব আশা।

রাগ হল সুধাময়ীর মেয়ের ওপর। অদ্ভুত মেয়ে। এমন ছেলে।

সরলাদেবীর ভাগ্নে, তার ওপর বড় চাকুরে। এদের কাছে বিনয় করে নিজেকে খাটো করা। এমন হাবা মেয়েকে নিয়ে কি যে করবেন উনি।

সারাটা পথই প্রায় বকতে বকতে এলেন তিনি।

কবে মারা যাব তার ঠিক নেই, তোমাদের কি দশা হবে জানি না। এমন হাবা মেয়ে। জান আমার মনে কত ইচ্ছে। তা না হলে এই শরীরে এই সব ঝক্কি পোয়াই? দেখই না একবার।

অমিতা কিছু বলল না। শুধু মনে মনে ভাবল মার এ-ইচ্ছের কথা জানলে ও কখনই আসত না।

কি সুন্দর লাগল আজ সন্ধ্যেটা না রে দিদি! বাড়ী ফিরে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে টুক্‌লা বলল অমিতাকে।

আমার একটুও ভাল লাগেনি।

অমিতা গম্ভীর হয়ে বলল। ও সুধাময়ীর মনের ইচ্ছেটা জেনে ফেলে অবধি স্বস্তি পাচ্ছে না।

কি জানি বাবা। আমার তো খুব ভাল লাগল। আর অশোকবাবুকে তো ভীষণ ভাল লেগেছে।

টেনে টেনে বলল টুক্‌লা।

তুই ওর কি জানিস, যে হঠাৎ ভীষণ ভাল লেগে গেল?

জানবার কি আছে? আমি কি লোক চিনি না ভাবিস? অশোকবাবু ভীষণ ভাললোক এ আমি তোকে এককথায় বলে দিতে পারি।

তোর লোক চেনার ক্ষমতা আমার জানা আছে। সবাই তোর কাছে ভীষণ ভাললোক।

এক সুবিনয়দা ছাড়া।

টুকলা। সিরিয়াস জিনিস নিয়ে ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না।

সরি ভাই দিদি। এক্স্‌কিউজ্‌ মি।

হেসে ফেলল দু বোনেই।

সারাক্ষণ গুন গুন করতে লাগল টুকলা

"আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে
আমার মনে।"

রাত্রে ঘুমোবার আগে আবার হঠাৎ অশোকের কথা মনে পড়ল টুকলার। কেমন করে বলল অশোক, সবাইয়ের মনে ও নবীন মেঘের সুর লাগিয়েছে? হাসি পেল টুক্‌লার। অশোকের মনেও নাকি? কাল বলতে হবে শান্তিদের ও কথা। আজ সন্ধ্যায় ও কিরকম সকলকে মুগ্ধ করেছে ওর গানে। বিশেষ করে অশোককে।

আবার অশোকের কথা মনে হল। অদ্ভুত। আচ্ছা টুক্‌লাকে কেমন দেখাচ্ছিল আজ? ভাল না? দিদিকে তো অপূর্ব। আপসোস হল নিজের সাজটা ভাল করে দেখেনি বলে। ভাববার চেষ্টা করল আবার। নাঃ ভালই দেখাচ্ছিল, ভেবে দেখল। ভাগ্যে আজ মার কথা শুনে নীল শাড়ীটা পরেছিল! নাহলে অশোক ওকে ছেলে-মানুষ ভাবত। তাহলে? সত্যি মা-টা ভারী বুদ্ধিমতী আর ভাল। কেমন হত মা না বললে?···সব ভাল। ভগবানকে ধন্যবাদ জানাল সে তাকে এমন ভাল মা বাবা আর দিদি দিয়েছেন। আর? আজ অশোক ওর গানের প্রশংসা করল বলে।

একটা সুন্দর তৃপ্তি।

ঘুমোবার আগে পর্যন্ত এই কথাগুলোই মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করল টুক্‌লা।

রবিবার সকালবেলায় প্রসন্নবাবুর হাঁকডাকে ব্যস্ত হয়ে উঠল সবাই।

সুধাময়ীর অস্বস্তি লাগছিল। ওঁর বুকের ব্যথায় জ্ঞান হারান দেহের পাশে বসে সবাইকে ডাকাডাকি করতে লাগলেন প্রসন্নবাবু।

টুক্‌লারা ওদের ঘরে পড়ছিল। ঝি চাকর সকলেই জমা হল সুধাময়ীর ঘরে। জ্ঞান আসবার পরই সুধাময়ী সঙ্কুচিত হলেন তাঁকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত হয়েছে বলে। নিজের শরীর নিয়ে কোনকালেই ভাবেন না তিনি, তাই রীতিমত অসুস্থ অবস্থায়ও সংসারের সব কাজ নিজেই দেখাশোনা করেন। প্রসন্নবাবুর উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর উৎকণ্ঠা আরও বাড়ল।

ওগো তুমি এত ভাবছ কেন?

ক্ষীণকণ্ঠে বললেন সুধাময়ী।

ভাবব না? এ কথা বলছ কি করে তুমি?

সুধাময়ীর হাতের তালুতে হাত বোলাতে লাগলেন প্রসন্নবাবু।

গরম জলের ব্যাগটা সুধাময়ীর পায়ের তলায় ঠিক করে দিতে দিতে অমিতা বলল,

ডাক্তারবাবুকে খবর পাঠিয়েছি বাবা।

পাঠিয়েছিস? আমি মা থাকতে আমার কোন ভয় নেই। আমি নিশ্চিন্ত।

কিন্তু ভরসা যে প্রসন্নবাবু মোটেই পাচ্ছেন না একথা সুধাময়ীর চেয়ে আর কে বেশী জানে? কিন্তু এই চিন্তাটুকুতে তাঁর গর্ব। অসুস্থ শরীরেও শান্তি। তাঁর স্বামী তাঁকে ছাড়া চোখে অন্ধকার দেখেন। কথাটা ভেবে নিজের অজ্ঞাতে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন সুধাময়ী।

তুমি ভেব না·······

অতিকষ্টে বললেন সুধাময়ী, আবার মুখ বিকৃত করে যেন একটা ব্যথা চাপলেন।

দ্যাখতো! কাণ্ড। কথা বল না তুমি। সুধা চুপ করে শোও। কষ্ট হচ্ছে? কোথায়?···

সুধাময়ীর দেহে যেন সাড় নেই। অমিতা গরম জলের ব্যাগ ফিরিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছে পায়ে। মাঝে মাঝে নাড়ী দেখছে। আস্তে মায়ের কপালে উড়ে আসা চুলগুলো সরিয়ে দিল, হাতে একটু অডিকোলন ঢেলে কপালে ঘাড়ে, কানের পাশে বুলিয়ে দিল।

খাটের মাথার দিকে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল টুক্‌লা। ভারী কান্না পাচ্ছিল তার ; মায়ের অসুখে সে কেন কিছু করতে পারে না। বড় অসহায় লাগে নিজেকে : কেন সে কিছু পারে না ? মতির মা আর দিদিই সব করে। সত্যি কি সুনিপুণ সেবায় ভরিয়ে রাখে দিদি মাকে।

সকলে মাকে নিয়ে ব্যস্ত। এককোণে টুক্‌লা নীরব দর্শক কেন ? ও তো মাকে এত ভালবাসে, মা কি তা জানেন ? ও তো কিছু না হোক পাশে বসে মার হাতখানি ধরতে পারে। কিন্তু দিদি আর মতির মাই তো সব করছে। ও সেখানে কি করবে ? মায়ের জন্য চিন্তা করা ছাড়া ? আচ্ছা! ভগবান তো বুঝতে পারেন মাকে সে কত ভালবাসে ? যদি পারত তো মায়ের সব সেবাই তো সে নিজে করত। তাকে যে কেউ আমলই দেয় না। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে যে কোন কাজ করতে পারে না মায়ের।

আবার অভিমান হল মার ওপর। কেন মা ডাক্তারের কথা শোনেন না, কেন মা এত খাটেন ? যদি না বাঁচেন ?

ঠিক ওর মনের কথাটাই যেন ডাক্তারবাবু মাকে বললেন পরীক্ষা করার পর।

মিসেস চৌধুরী, কি বলব আপনাকে। সবই তো বোঝেন ? নিজের শরীরের কথা ভেবে বিশ্রাম নিন। কি দরকার আপনার এত ওঠাহাঁটা করবার ?

মৃদু হাসলেন মা।

না না হাসির কথা নয়!

আপনি নিজের সংসারে বিশ্রাম নিতে পারেন না, একথা আমি মানব না। আপনাকে বিশ্রাম নিতেই হবে, এত লোকজন রয়েছে, মেয়েরা বড় হয়েছে।

জোর দিলেন ডাক্তারবাবু।

নিজের সংসার বলেই তো! আমার সংসার আমি না দেখলে কে দেখবে?

সংসার! ভারী তোমার সংসার।···সংসার! রাগ করলেন প্রসন্নবাবু।

আমার মেয়েরা···

তুমি মরে গেলে তোমার মেয়েদের কে দেখবে? বলতে পার কি হবে ওদের তখন? এখনও নিজের হাতে চুল না বেঁধে দিলে তৃপ্তি পাও না। মানে হয় কোন এর?

প্রসন্নবাবুর গলা ধরে এল।

না না মিসেস চৌধুরী। এসব আর এ্যালাও করা যাবে না।

ইনজেকসন্ দেওয়া শেষ করে ডাক্তারবাবু বললেন।

আপনি মারা গেলে ওদের কি আরও কষ্ট হবে না?

সে তখন তো আর আমি দেখতে আসব না। পাশ ফিরে শুলেন সুধাময়ী।

এতো স্বার্থপরের মত কথা বলছেন।

তাই হয়তো হবে।

না না অত হাল্কা করে দেখবেন না, আপনার অসুখটা হাল্কা নয়।

ভয় নেই আপনাদের, মরা অত সহজ নয় ডাক্তারবাবু!

কিন্তু মরা বোধহয় সত্যিই সহজ। তা না হলে তার একমাসের মধ্যেই সুধাময়ীর মৃত্যু হবে কেন?

এই তো সেদিনও চুলের কাল ফিতেয় গিঁট পড়েছে বলে কি

বকুনিটাই দিলেন অমিতাকে। সব দিকেই তাঁর নজর। একটু অগোছাল সইতে পারেন না। কতবার ঠাকুরকে বকেছেন শীতকালে ফুলকপির বড়িগুলো অযথা খরচ করছে বলে।

ঠাকুর! তোমাকে না পই পই করে বলেছি ও ফুলকপির বড়িগুলো গরমকালের জন্য তোলা। উনি ভালবাসেন তাই অত কষ্ট করে বড়িগুলো দিলাম যাতে গরমকালে ঝোলে ফুলকপির গন্ধ হয়। তা এখন এসব খরচ করছ কেন? এখন তো ফুলকপিই রয়েছে।

আমায় তো মতির মা দিয়েছে।

ঠাকুর নিজেকে বাঁচায়।

কোন বড়ি ছেলনি তো কি করবো? মতির মা বলল।

আনাবে! বাজারে বড়ি নেই? নাহলে ডালের বড়ি দেবে আবার!

হঠাৎ যেন অধৈর্য হয়ে পড়েন সুধাময়ী। তাঁর ইচ্ছার এদিক ওদিক হবার যো কি? সংসার মানেই তিনি। সংসার জুড়ে তিনি।

টুকুলা তো ভেবেই পায় না মা এত তুচ্ছ জিনিসে এত ব্যস্ত হন কেন। পান সাজার কাপড় গোলাপজলে ভেজাতে ভুলে গেছে মতির মা তাই নিয়ে হুলুস্থুল কাণ্ড। দিন দিন বাড়ছে এসব।

অথচ যাঁকে নিয়ে এত ব্যস্ত সুধাময়ী, সেই প্রসন্নবাবু নির্বিকার। সম্পূর্ণভাবে তিনি নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন সুধাময়ীর হাতে। প্রসন্নবাবুর ধাতই এই। ছোটবেলায় মাকে পরে স্ত্রীকে। নিজের ভার নিজে বহন করার কথা ভাবতেও পারেন না তিনি। তাঁর ভাবনা কি? সুধাময়ী আছেন।

কিন্তু সামান্য এই ব্যাপারে সুধাময়ীর ব্যস্ততায় তিনিও বিচলিত হয়েছেন।

কি দরকার চেঁচামিচির? চুণে তো আতর দেওয়া আছে। ওতেই হবে।

কি সে হবে না হবে তুমি বুঝবে না। ওগো তাহলে আর ভাবনা ছিল না। কেন মতির মা কি এই সামান্য কাজটুকুও করতে পারবে না? তাহলে বলে দিক, পান যদি সাজতে পারি, পরে গোলাপজলের কাপড়ও চাপা দিতে আমিই পারব।

আমার তো মনে হয় ঐ পান সাজাটাও মতির মাকেই দাও।

পারবে তুমি খেতে? ওর হাতের সাজা পান? তাহলে তো বাঁচি, রক্ষা পাই।

কিন্তু গলার স্বরে রক্ষা পাবার আভাষ পাওয়া গেল না, বরং কিছুটা আহত মনে হল।

তা বটে!

প্রসন্নবাবু স্বীকার করেছেন।

তোমার হাতে ছাড়া আর কারও হাতে পান খাবার কথা ভাবতেও পারি না আমি।

বাবা আমার হাতে?

টুকলা কখন এসে দাঁড়িয়েছে। সজোরে হেসে উঠেছেন প্রসন্নবাবু।

হ্যাঁ হ্যাঁ! সে তো পারিই! আমার টুকলা মার হাতের সাজা পান খেতে পারব না? কিন্তু সাজতে শিখেছ কি?

শিখে নেব।

উৎসাহের সঙ্গে বলছে টুকলা।

সুধাময়ী বাধা দিয়েছেন।

আমি যদ্দিন বেঁচে আছি, ততদিন মেয়েদের আমার ঘরের কাজ করতে দেব না। তাছাড়া পান সাজা? মাগো আঙুলে কি বিশ্রী দাগ হবে।

কিন্তু ঐ বেঁচে থাকার মেয়াদ যে এত শীগ্‌গীর ফুরোবে তা কে জানত!

সোমবার দিনও অমিতাকে নিজে বসে বসে সরময়দা

মাখিয়েছেন। শীতকালে গায়ের ময়লা সাবান দিয়ে তোলা ভাল নয়। ওতে চামড়া নাকি খস্‌খসে হয়। তাই সুধাময়ীর আদেশমত সরময়দা মাখাবার ব্যবস্থা। গরমকালে যেমন কাঁচা হলুদ।

কিন্তু ঐ সব অমিতাকেই।

মেয়ে বড় হয়েছে, বিয়ের জন্য তাকে সর্বরকম প্রস্তুত করতে হবে তো? কত জায়গায় সম্বন্ধ আসছে সুধাময়ীর পছন্দ নয়। কত সাধের মেয়ের বিয়ে তাঁর। নিজে ভাল করে দেখে দেবেন। তাছাড়া একটু ভাল না হয়ে উঠলে ঘটা করে মেয়ের বিয়ে দেবেন কি করে? তাঁকেই তো সব নিজের হাতে করতে হবে, তাঁর মেয়ের বিয়ের কাজ আর কে করবে?

অতএব চলুক প্রস্তুতি। সুন্দরী মেয়েকে আরও সুন্দরী করবার প্রয়াস।

অমিতাও আপত্তি করে না। সত্যি বড় লক্ষ্মী মেয়ে অমিতা। মেয়ে হবার জন্যই যেন সে জন্মেছে। টুক্‌লার মত ভুল করে নয়। টুক্‌লা তো ভাবতেও পারে না এইভাবে বসে বসে অঙ্গচর্চা করে দেহের লাবণ্য বাড়াবে।

তার রোদে পোড়া রং-ই যথেষ্ট। আর কাজ নেই। কি এসে যায় রং-এ?

অবশ্য দিদিমা বলেছেন, দিদির বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত টুক্‌লা বেশ আছে, ছাড়া পাখী। যেখানে ইচ্ছে উড়ে বেড়াক তারপরই পায়ে শেকল পড়বে দিদির মত। সুরু হবে তাকে নিয়ে আবার।

তাই তো টুক্‌লা রোজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে যাতে দিদির তাড়াতাড়ি বিয়ে না হয়ে যায়। চিরদিন তাহলে সে দিদির আড়ালে থেকে এইসব অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

তার কাছে এই অত্যাচার অমিতার কাছেও কি? নাহলে অমন করে মুখোস পরার মত করে সরময়দা মেখে কেউ বসে থাকতে পারে? শুধু একটু শুকোবার অপেক্ষায়? দরকার নেই বাবা!

দিদিটা যেন কি ? অত সুন্দরী তবু আরও সুন্দরী হবার সখ। অবশ্য দিদির মতে টুক্‌লার মত ; অত টক্‌টকে রং হলে সেও নাকি এসব ভাবত না। কি জানি বাবা। টুক্‌লা অত বোঝে না। বুঝতে চায়ও না।

হাসি পায় টুক্‌লার। রং ফর্সা তো কি ? কিছু যায় আসে তাতে ? ও তো ভাল করেই জানে দিদির মত ওর মুখ অত সুন্দর নয়। তাতে কি এমন এল গেল ? বোঝে না টুক্‌লা, বুঝতে চায় না। অত ভাবলে কি চলে ? এই তো বেশ চলে যাচ্ছে। এই ভাল। বসে বসে রূপচর্চা করছে ভাবতেও হাসি পায় তার। এই নিয়ে বিকাশদা আর শান্তির সঙ্গে কত হাসাহাসি করেছে সে।

মায়ের সঙ্গেও এই নিয়ে কতবার কথা কাটাকাটি করেছে ও। কিছুতেই বোঝাতে পারে না মাকে, বেচারা দিদির কতটা সময় মা নষ্ট করে দিচ্ছে।

তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।

মা জবাব দিয়েছে।

বেশ টুক্‌লা মাথা ঘামাবে না। তাকে না টানলেই সে খুশী।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকেও মা ছাড়েননি। ওর গায়ের আসল রং নাকি চাপা পড়ে আছে। সরময়দা মাখতেই হবে। টুক্‌লা রেগে গেছে। মায়ের সঙ্গে বেশ খানিক ঝগড়া করেই ও স্কুলে গেছে। তার ম্যাট্রিক পরীক্ষার টেস্টের আর মাত্র একমাস বাকী। তার সময় কোথায় ? দিদির থার্ড ইয়ার, ও পারে এইভাবে হেলাফেলায় দিন কাটাতে। তাকে নিয়েই এসব চলুক না বাবা। টুক্‌লাকে কেন ? তার এ সবের অবকাশ কোথায়, মা কিছু বোঝে না।

নিজের মনটাও খারাপ হয়ে গেল। আজ সকাল থেকে দিনটা এমন সুন্দর ছিল। রেডিওতে তার দুটো প্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে মনটা সেই সুরে বাঁধা ছিল। মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে যেন সে তার ছিঁড়ে গেল। অন্যদিন সারাপথ ওরা বকবক করে স্কুলে যাবার

সময়। আর আজ যেন ও বারবার চুপ করেই যাচ্ছিল। মা তো এত ভাল অথচ এত অবুঝ আর খেয়ালী কেন ?

কাল বিকেলে চুল বাঁধা নিয়েও ঝগড়া হয়েছে। মেয়েদের 'কেশই বেশ'। এখন এত অযত্ন করলে নাকি পরে ভুগতে হবে। ভারী হাসি পায় টুক্‌লার, রাগও হয়। মেয়েদের এই ; আর মেয়েদের তাই। মেয়েদের সব আলাদা। বেশ হত মেয়ে হয়ে না জন্মালে। কিন্তু শান্তির তো মহা আপত্তি।

বলিস কি রে টুক্‌লা ? মেয়ে হওয়ার কত সুবিধে জানিস ?

জানতে চাই না। আমি তো জন্মে অবধি একটাও দেখছি না। শুধু শাসন মানা ছাড়া। ছেলেদের জীবন কত ফ্রি।

ভাগ ! কত সুবিধে—তাছাড়া তোর সেই অশোক ?

কে ?

মনে করতে চেষ্টা করল টুক্‌লা।

কেন সেই পার্টিতে যে তোর গানের প্রশংসা করেছিল ?

ওঃ ! সে বুঝি মেয়ে বলে।

নিশ্চয়ই ! তা না হলে তোমায় ছাই প্রশংসা করত, এটা মনে রেখ।

ভদ্রলোক বেশ রে !

হঠাৎ টুক্‌লা বলল।

আসবে বলে আর এলেনই না।

ওরকম ভদ্রতা করে কত লোকে বলে।

ভদ্রতা আবার কি ? আসলে ছেলেরা বোধহয় সত্যি কথা বলে না। তাই তো দু'চোক্ষে দেখতে পারি না ছেলেদের।

নারে অনেক ছেলে আছে খু—ব ভাল। তাই তো আমি ভাবি মেয়ে হয়েছি ঢের ভাগ্য।

ছাই। তোমার আর কি ? একা মায়ের সংসারে থাক। থাক্‌তো আমার মত দিদিমা মাসীমাদের দল সব সময় টিপ্পনী

কাটবার। বুঝতে! সব আহ্লাদ করা বেরিয়ে যেত। জানিস আজকাল একটা না একটা কিছু নিয়ে মার সঙ্গে ঝগড়া হয় রোজ। বিশেষ করে এই ফ্রক পরা নিয়ে।

আমি তো ভাবছি ছেড়েই দেব। ভারী বাচ্চা লাগে।

হঠাৎ যেন বাজ পড়ল। চম্‌কে উঠল টুক্‌লা। শান্তির মুখে ঐ কথা?

সেকি? যাঃ কি বলছিস তুই? বাচ্চা লাগে! মানে? এই সব খেলাধুলো, দৌড় এ সবের কোন উপায় আছে শাড়ী পরলে?

দরকার কি আর ওসবে?

নাঃ শান্তি তোরা সবাই ষড়যন্ত্র কচ্ছিস। আমাকে শুধু শুধু রাগাচ্ছিস না?

কি যেন ভাবল শান্তি! টুক্‌লাকে না বলাই ভাল সে-কথা। হেসে বন্ধুর পিঠে একটা কিল মারল:

তুই একটা পাগ্‌লা। সত্যিই তোকে রাগাচ্ছিলাম। বাব্বা ভাবতেও পারি না। সত্যিরে তোকে অনেক শাসন শুনতে হয় তাই না?

অনেক নাহলেও মাঝে মাঝে। আসলে মা তো ভী—ষণ ভাল লোক শুধু সে আমলের। তাছাড়া হাওয়া দিতে আছে ঐ বুড়িদের দল। যাক্‌গে···আমি ওসব নিয়ে মাথাই ঘামাই না। শোন, আজ পার্কে গিয়ে একটা মজা করবো দেখবি।

কি রে?

মনে আছে কাল অনিমারা কি করেছিল? ইচ্ছে করে প্রভাতদের সামনে আমাদের অনেক বিদ্রূপ করেছে। সন্ধ্যার জন্য তাড়াতাড়ি ফেরার মুখে কিছু করতে পারিনি। আজ দেখবি চক্কর দেবার সময় ওদের কি হাল করি। কাঁদিয়ে ছাড়ব।

···তারপর একটু ভেবে নিয়ে বলল।

নাঃ কিছু করবো না। ক্ষমা করলাম ওদের, বুঝলি অনিমাদের ক্ষমা করলাম।…

স্কুলে প্রার্থনা করবার সময় ওর মনের ভার আরও কেটে গেল। তবে মায়ের কথা যেন বেশী মনে পড়ল। মাটা যেন কি! যত সব সেকেলে ভাবনা। বিয়ের জন্য এ দরকার, সে দরকার। গান শেখ! কেন? না বিয়ের জন্য দরকার। এমনিতে গান বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত ওর প্রাণ, কিন্তু মা যেই বলে বিয়ের জন্য ওকে গান শিখতে হবে ওর সারা মন বেঁকে বসে। গান, গান, তাতে সে আনন্দ পায়। হ্যাঁ অন্যেও যদি আনন্দ পায় তার গান শুনে তাহলে আরও খুশী। রমা, শান্তি, বিকাশদা, স্কুলের দিদিমণিরা সকলে। আর কেউ? হ্যাঁ অশোকের তো সত্যিই ভাল লেগেছিল। তাতেও সে খুব খুশী হয়েছিল। বোধহয় সব থেকে বেশী। কিন্তু তাহলে ঐ বুড়িদের কাছে কীর্তন শোনান? বিয়ের বাজারে দাম বাড়বে বলে বিকেল বেলা খেলাধুলো ছেড়ে মনীবাবুর কাছে কীর্তন শেখা? অসহ্য। সত্যি গানেও বোধহয় ঘেন্না ধরাবে ওকে। দিদিমা তো আবার কীর্তন শুনতে ভারী ভালবাসে। বুড়ি তো এমনিতে ভগবানের কথা ভেবেই চোখ বোজে, গানের বোঝে কি?

ভারী রাগ হয়। সব বিয়ের জন্য। জীবনটা কি কেবল বিয়ে করবার জন্য। মানুষ দুদণ্ড হাঁফ ফেলতে পারবে না? তাহলে দরকার নেই বাবা বিয়েতে। আজীবন সে বিয়েই করবে না।

টিফিনের সময় স্কুলের মেরী গো রাউণ্ডে বসে বসে ওরা তিনবন্ধু এই কথাই আলোচনা করছিল। স্কুলের মধ্যে শান্তির পরই ওর ভাব নমিতার সঙ্গে। নমিতাকে ও ভারী ভালবাসে, বড় ভাল মেয়ে নমিতা।

আমি তো ঠিক করেই রেখেছি বিয়ে করবই না। মারও ঐ মত।

নমিতার মা নার্স। পাড়ায় নমিতার মার বিশেষ সুনাম নেই। মাথায় সিঁদুর দেন না, অথচ বিধবার মতও থাকেন না। বেশভূষা

যা করেন তা কুমারীর উপযুক্ত। নমিতার বাবা মারা গেছেন না আছেন, তাও জানে না কেউ। আর টুকলা তো মরে গেলেও একথা জিজ্ঞেস করতে পারবে না নমিতাকে, নমিতাও এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু মায়ের মতকেই সে সজোরে সমর্থন করে।

জানিস!

আলুকাব্‌লি কাঠি দিয়ে মুখে দিতে দিতে নমিতা বলল—

মা বলে, বিয়ে না করে তখন যদি মা পড়াশুনো শেষ করত তাহলে আজ আর নার্সগিরি করে খেতে হত না।

নমিতার মা নাকি মেডিক্যাল কলেজে সেকেণ্ড ইয়ার অবধি পড়েছিলেন।

নার্স কি খারাপ? সেবাব্রত!

টুকলা জিভ দিয়ে আলুকাব্‌লির ঝালটা অনুভব করতে করতে বলল।

হ্যাঁ শুনতেই সেবাব্রত। তুই তো জানিস না কত কষ্ট এ জীবনে। কত পরিশ্রম আর তাছাড়া······

সত্যিরে! তোর মা ডাক্তারিটা পাস করে নিলে বেশ হত। কেমন ডাক্তারি করতে বেরোতেন সবাই তাকিয়ে থাকত। গাড়ীও তাহলে হয়ে যেত তোদের।

শান্তি বলল আস্তে আস্তে।

গাড়ী না হলে অসুবিধে নেই। আসলে ডাক্তার হওয়া, কি বল? টুকলা বলল।

আসলে আমরা কেউই বিয়ে করব না, চাকরি করব।

আমি কিন্তু ডাক্তার হবই।

নমিতা নীচু গলায় বলল।

আর আমি তো কত আগে থেকে ঠিক করে রেখেছি। তাহলে বেশ মজা! শান্তি তুই? তুই ও ডাক্তার হ', তিনজনই ডাক্তার। উঃ কি মজা।

নজের আলু মশলা মাখা হাতটা নমিতার আঁচলে মুছে দিয়ে বলল টুকলা।

এই কি করলি ?

নমিতা বলল

আজ সবে কাপড়টার পাট ভাঙ্গলাম।

ঘণ্টা পড়ল। আর সব মেয়েরাই যে যার ক্লাশে যাবার জন্য প্রস্তুত হল।

ওরা তিনজনে কলের কাছে গেল জল খেতে। টিফিনের সময়টুকু এত ছোট কেন ?

এই ছাখ শান্তি! জলের এই জালাটা ঠিক পেটমোটা ভক্তি দিদিমণির মত দেখতে, নারে ?

যা বলেছিস। গৌরীদিও অনেকটা।

তিনজনে সজোরে হেসে উঠল।

ঠিক তখনই স্কুলের ঝি ডাকতে এল টুকলাকে।

বড় দিদিমণি ডাকতেছেন গো তোমাকে। পার্বতী দিদি!

আমাকে ?

টুকলা অবাক হল!

হ্যাঁ গো!

সেকি রে বাবা! যাঃ।

রীতিমত ঘামবার উপক্রম টুকলার। বড্ড যে ভয় করে বড়দিকে।

সত্যি সুবোধের মা ? সত্যি ডাকছেন ?

নাহলে কি আমি তোমার সঙ্গে তামাসা করিছ ? তোমাদের বাড়ী থেকে গাড়ী নিয়ে কে লোক এসেছে। বড়দিদিমণি যে তাই তোমাকে ডাকতে বলল। তা সেই থেকে তোমাকে তো খুঁজে খুঁজে হায়রান।

বুঝছি না ভাই!

টুক্‌লা মুখভঙ্গি করল।

কি আছে কপালে। আচ্ছা তোরা ক্লাশে যা আমি আসছি। বশিষ্ঠবাবুর ক্লাশ তো। একদিক দিয়ে ভালই হল। যত দেরী হয় ততই সুবিধে আমার। ওন্‌লি ফরটি সাম্‌সের ভেতর মাত্র চারটে অঙ্ক আজ করতে পেরেছি। সুতরাং বুঝতেই পারছিস।

হেড্‌মিস্ট্রেসের ঘরে ঢোকবার আগে তলার ফ্রকে আর একবার ভাল করে হাতটা মুছে নিল টুক্‌লা। বড়দি মিস্ তলাপাত্র খুব গম্ভীর রাসভারী প্রকৃতির মানুষ। মোটা দেহে ততোধিক বড় মুখে গাম্ভীর্য আর রাগ ছাড়া কেউ কিছু দেখেনি কখনও। টুক্‌লারা তো বাজী রেখেছে বড়দির হাসি মুখ দেখাতে পারলে যত খুশী আলুকাব্‌লি আর ফুচ্‌কা বরাদ্দ।

এ হেন বড়দির ঘরে ঢোকবার সময় টুক্‌লার একটু নার্ভাসই লাগল।

পরদার পাশে দাঁড়িয়ে ভীরু গলায় জিজ্ঞেস করল।

আসতে পারি?

এসো।

গম্ভীর গলায় উত্তর এল।

বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে মিস্ তলাপাত্র বসে আছেন। এ পাশের চেয়ারে বসে টুক্‌লার সম্পর্কিত কাকা হৃদয়বাবু।

কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা হেড্‌মিস্ট্রেসের সামনে এসে দাঁড়াল টুক্‌লা।

আমায় ডেকেছেন?

হ্যাঁ এই ভদ্রলোক তোমায় নিতে এসেছেন। তোমার কাকা হন তো ইনি?

হ্যাঁ! কি হয়েছে হৃদয়কাকা?

তোমার মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তুমি বাড়ী যাও এখনই।

কি হয়েছে—মার?

প্রায় আর্তনাদ করে উঠল টুক্‌লা।

বাড়ী চল। বৌদির অবস্থা খুব খারাপ।

গম্ভীর গলায় বললেন হৃদয়বাবু।

কেন? মা।

বড় বড় জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল টুক্‌লার গাল বেয়ে। দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলল সে।

হেড মিস্ট্রেস তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বিচলিত হ'ও না পার্বতী। মা কি কারও চিরদিন থাকেন? তাছাড়া·· ···

তার মানে?

জলভরা অবাক চোখে তাকাল টুক্‌লা বড়দির মুখের দিকে। কি বিশ্বাস করতে বলছেন তাকে বড়দিদিমণি?

বাড়ী যাও পার্বতী।

ওর পিঠে হাত বোলাতে লাগলেন মিস তলাপাত্র।

বড়দি! মা—

ওঁর বুকে মাথা রেখে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল টুক্‌লা।

ওকে গাড়ী অবধি এগিয়ে দিতে ওকে ধরে নিয়ে গেট পর্যন্ত চললেন মিস তলাপাত্র। না বললেও বেশ বুঝতে পেরেছে টুক্‌লা তাদের চরম সর্বনাশ এসে গেছে। ও কিছু ভাবতে পারছে না; কেবল যে বড়দিকে চিরদিন ভয় ছাড়া কিছুই করেনি তাঁরই বুকে মাথা রেখে কাঁদতে শান্তি পাচ্ছে যেন।

নমিতা আর শান্তি খবর পেয়ে নেমে এসেছে, ওর বইখাতা

নিয়ে। বহুদিন ধরেই এ সম্ভাবনার কথা সকলের জানা, তবু যখন সর্বনাশ সত্যিই তার ভয়াবহ রূপ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল তখন যেন কারও মনই এই চরম সত্যকে বিশ্বাস করতে রাজী নয়।

ওদের সমবেত কান্নায় আরও বিব্রতবোধ করলেন মিস্ তলাপাত্র।

মেয়েরা!—এভাবে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কেঁদ না, পার্বতীর মা নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবেন। যাও সকলে ভেতরে যাও। বাইরে এস না। যাও!

টুক্‌লাদের গাড়ী ছেড়ে দিল। পাশে দাঁড়ান মিস্ সেনকে উদ্দেশ্য করে বললেন মিস তলাপাত্র।

মেয়েটা ভারী নরম তো? অত ছটফটে আর অত দুষ্টু ভেবেছিলাম বেশ শক্ত মেয়ে। তা না কেঁদেই ভাসাচ্ছে।

মা বলে জিনিস! কাঁদবে না?

অবাক হয়ে বললেন মিসেস সেন।

একটি লোকের জন্য সমস্ত বাড়ীটা শূন্য হয়ে গেল।

মাত্র দুদিন আগেও সুধাময়ী বেঁচে ছিলেন, সারা সংসারে ছড়িয়ে ছিলেন তিনি। সংসার মানেই সুধাময়ী। বৃত্তের কেন্দ্র তিনি। দেহে যেমন প্রাণ।

আজ তিনি নেই। ক'দিন আগেও তিনি তাঁর কাজ, চেঁচামেচি হাসি সব কিছু দিয়ে ভরিয়ে রেখেছিলেন এই সংসার। আজ নেই।

এখনও খাটের পাশে রাখা তাঁর লাল ভেলভেটের চটিটা তেমনি পড়ে আছে। পানের বাটা পান ভর্তি হয়ে তেমনি টিপয়ের ওপর রাখা। বহুদিন ধরে প্রস্তুত হয়েও যেন অপ্রস্তুত ছিলেন তিনি, ছিল আর সবাই। বাড়ীর সব জায়গায় তাঁর চিহ্ন ছড়ান। কোথায় তিনি?

কে জানত তিনি এতখানি জায়গা পূর্ণ করে রেখেছিলেন। কত তুচ্ছ মনে হয়েছিল। তিনি বেঁচে থাকতে ঐ সব খাট, টেবিল, পানের বাটা আর টুকিটাকি। অথচ আজ এই সব তুচ্ছ জিনিস গুলোই সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকে রইল, আর তাদের অধিকারিণী তাঁর সমস্ত ক্ষণস্থায়ীত্ব নিয়ে কোথায় মিলিয়ে গেলেন? বিরাট এক শূণ্যতার সৃষ্টি করে কোথায় চলে গেলেন তিনি।

টুক্‌লা জানে না এই দুদিন কোথা দিয়ে কেটেছে। প্রাণ ভরে মাকে ওরা সাজিয়েছে, তারপর মাকে নিয়ে যাবার পর টুক্‌লা নিজেদের ঘরে ঢুকে খিল দিয়েছে। দিবারাত্র কেঁদেছে আর কেঁদেছে। তার সমস্ত জগত বদলে গেছে যেন। কান্না আর কান্না। নিদারুণ শোকের ভেতর দিয়ে তার এ দুদিন কেটেছে। তার বাবাও পারেননি দরজা খোলাতে।

ওর বোধহয় জ্ঞান ছিল না। নাহ'লে এ দুদিন শুধু ওর নিজের দুঃখটাই দেখেছে। ও কি করে পারল তার অসহায় বাবা আর দিদিকে সরিয়ে দিয়ে নিজে শোক নিয়ে মগ্ন থাকতে?

প্রচণ্ড শোক আর মনোযন্ত্রণার সঙ্গে কেমন যেন লজ্জাও অনুভব করল টুক্‌লা। মায়ের মৃত্যু যেন এক লজ্জার কারণ। কেমন এক ছোট্ট অপরাধবোধ যেন তাকে পীড়িত করতে লাগল। অদ্ভুত এ অনুভূতি; যন্ত্রণা, শোক আর লজ্জায় মেশা। এই মৃত্যু? মায়ের মৃত্যু হ'ল? এত বড় সত্য তার অজ্ঞাত ছিল; ভাবতে অবাক লাগে টুক্‌লার।

দরজা খুলে ও যখন বেরোল তখন মতির মা দরজার পাশেই শুয়ে ঘুমোচ্ছিল।

হঠাৎ কেমন যেন মনে হ'ল। এই তো সব যেমনটি ছিল তেমনটিই আছে। এই তো মতির মা ঘুমোচ্ছে। পাশের বাড়ীর বিছানা ছাদে মেলা রয়েছে, বারান্দায় টবে গাছ তেমনি সাজান আছে, কিছু তো বদল হয়নি? তাহ'লে সত্যি বোধহয় কিছুই হয়নি; ও বোধহয় স্বপ্ন দেখছিল। তাই হবে—সবটুকুই দুঃস্বপ্ন।

আবার সমস্তটা মনে করতে চেষ্টা করল। একটু আগে যা চরম সত্য বলে মনে হয়েছিল আবার তা মিথ্যা বলে মনে হ'ল। মিথ্যা মৃত্যু, মিথ্যা, মায়ের মৃত্যু হয়নি। হ'তে পারে না। কোথাও তো কোন পরিবর্তন হয়নি, কোথাও না। জলের কুঁজো তেমনি রাখা, খাঁচায় মায়ের পোষা চন্দনা তেমনি নড়াচড়া করে বেড়াচ্ছে। তবে? সবই তেমনি আছে শুধু মা নেই? এ হ'তে পারে নাকি? আবার সমস্ত মনে করতে চেষ্টা করল টুক্‌লা।

বারান্দা পার হ'য়ে মায়ের ঘরের কাছে এল। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। গেল কোথায় সব এরা? সবাই-ই কি শেষ হয়ে গেল নাকি? কি হয়ে গেছে? ভূমিকম্প? সবাই মারা গেছে শুধু সেই একা বেঁচে আছে?

মায়ের ড্রেসিং ঘরে টেবিলের পাশে ইজি-চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় বাবা আর তাঁর কোলে মাথা রেখে পায়ের কাছে বসে আছে অমিতা। সামনে সুবিনয়।

বাবা।—

ছুটে এসে বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল টুক্‌লা।

আবার নতুন করে শোক পেল যেন ওরা। ওদের দুজনকে নিয়ে অঝোর ধারে কাঁদতে লাগলেন প্রসন্নবাবু।

মাকে কোথায় রেখে এলে বাবা?

বাবার বুকে মুখ ঘষে ঘষে কাঁদতে লাগল টুক্‌লা।

বাবাগো, বাবা—মা কোথায়?

টুক্‌লার কান্না আর থামে না। সে কান্না সমস্ত ঘরময় ছড়িয়ে পড়তে লাগল যেন।

শেষ পর্যন্ত সুবিনয়ই ডাকল।

পার্বতী! ওরকম কোর না। অত ব্যাকুল হ'ও না। তাহ'লে অন্যেরা নিজেদের স্থির রাখবে কেমন করে? তুমি তো অবুঝ নও।

চোখ মুখ মুছে সোজা হয়ে বসল অমিতা। তারপর শোকার্ত বোনকে সস্নেহে কাছে টেনে নিল।

দিদি, দিদিগো!

দিদির কোলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে চলল টুক্‌লা।

ওর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে স্থির হয়ে বসে রইল অমিতা। ওর চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়তে লাগল।

হাতের ভেতর মাথা গুঁজে বসেই রইলেন প্রসন্নবাবু। সারা শরীর তাঁর ফুলে ফুলে উঠছে। ছেলেমানুষের মত কাঁদতে লাগলেন তিনি।

অমিতার একটু কাছে সরে এল সুবিনয়। অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে অমিতার হাতটি সমবেদনার সঙ্গে স্পর্শ করল সুবিনয়।

জলভরা চোখে ওর দিকে তাকাল অমিতা। পরম দুঃখের দিনে ওরা পাশাপাশি দাঁড়াল আপন অধিকারে।

শীতের সকালে লেপ ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না। বোঝা যাচ্ছে বেশ বেলা হয়েছে কিন্তু কাল শুতে অনেক রাত হয়েছে। তাই টুক্‌লার ওঠবার ইচ্ছে করছিল না। ঘুম ভেঙ্গে বারবার কাল রাত্রের কথা মনে পড়ছিল তার।

গত বছর প্রায় এমনি সময়ই মা মারা গেছেন। মাত্র একবছর, অথচ সেই মায়েরই ছবির তলায় বসে দিদি আর বাবা কি ভীষণ কথাই কাল বললেন। কি ঝগড়া।

একবারও কি ওদের মনে হ'লনা, বাবা আর দিদির এই ঝগড়া মা ভাবতেও পারতেন না; কি ভীষণ অপচ্ছন্দ করতেন মা এই সব চেঁচামেচি? আর দিদি? কি করে বাবার মুখের ওপর ঐ কথাগুলো বলতে পারল? সত্যি অবাক লেগেছে টুক্‌লার। বাবাই বা কি? তাদের দুঃসময়ে সুবিনয়দা অত করলেন, সেই সুবিনয়দাকে কি অপমান করেই না তাড়িয়ে দিলেন বাবা। বাড়ী থেকে তাড়ালেন কত কথা বলে। দিদির রাগ হ'বারই কথা! কি করে সুবিনয়দা সম্বন্ধে এসব কথা বাবা ভাবতে পারলেন। সবই অদ্ভুত।

কিন্তু ভাবলে চলবে না ওসব। তাকে এইবার উঠতেই হবে। কলেজের প্রথম ঘণ্টাতেই তার ক্লাস আছে। দশটার ভেতরেই বেরোতে হবে। দিদির তো মজা, টেস্ট হয়ে গেছে। কলেজের তাড়া নেই। শুধু বাড়ীতে বসে পড়লেই হ'বে যখন ইচ্ছে।

তাকিয়ে দেখল অমিতার বিছানার দিকে। কখন উঠে গেছে দিদি। যাবার আগে বিছানাটা পরিপাটী করে গুছিয়ে রেখে

গেছে। সত্যি তুলনা হয় না দিদির। সুগৃহিনী হ'বার জন্যই জন্মেছে যেন। তার সারাদিনের কাজে কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা নেই। কোথাও বিদ্রোহ নেই ওর চরিত্রে, আপত্তি নেই। জীবনে সব কিছুকেই সে মেনে নিয়েছে যেন।

অথচ সেই অমিতাই কাল বাবার মুখের ওপর কত কথাই বলল। চিরকালের ভাল মানুষ শান্ত শিষ্ট মেয়েটির কি যেন হঠাৎ হয়েছিল কাল। বাবা নিশ্চয়ই খুব বেশী অবাক হয়েছিলেন। টুকলার থেকেও বেশী। আহা ভাবতেও পারেন নি। কেমন অসহায়ের মত খালি বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন অমিতাকে বারবার।

পাশ ফিরে শুল টুকলা। একটা চড়াই পাখি আয়নাটার ওপর বসে নিজের মুখ দেখছে। রোজ আসে পাখীটা, রোজ মুখ দেখে কতবার। হাসি পেল টুকলার। নিজের রূপের মোহে আটকা পড়ে গেছে পাখীটা নার্সিসাসের মত। মতির মা কত রাগ করে। বসে বসে আয়নাটা নোংরা করে পাখীটা। পরিষ্কার করে করে আর পারে না মতির মা। কিন্তু টুকলা বলে থাক্ ও। ও তো নিজের উপস্থিতি দিয়ে কাউকে বিরক্ত করতে চাইছে না। যদি সামান্য একটু উপকরণে সে আনন্দ পায় তো পাক্ না।

ঠিক এ কথাটাই অমিতা শেষকালে বলেছিল প্রসন্নবাবুকে।

কেন বারবার আমাকে একথা বলছ বাবা। কি দরকার আমার বিয়ে দেবার? আমি কি আমার উপস্থিতি দিয়ে কারও বিরক্তির কারণ ঘটিয়েছি। যদি বিয়ে না করেই আমি সুখে থাকি তাহলে তোমাদের আপত্তি কিসের?

ধৈর্য হারালেন যেন প্রসন্নবাবু। সবই তো বোঝেন তিনি। ঝাঁঝাল গলায় বলে উঠলেন।

আপত্তি থাকত না; যদি বুঝতাম বিয়ে না করলেও তোমার চলে যেত। কিন্তু তাত নয়। রাতদিন....

কি সে বুঝলে যে তা নয়?

সে কথার উত্তর দিতে গিয়েও যেন দিলেন না প্রসন্নবাবু। একটু পরে আস্তে আস্তে বললেন,

ভেবেছিলাম, তুমি গ্র্যাজুয়েট হ'লে তারপর তোমার বিয়ে দেব। তা হ'ল কোথায়? তাছাড়া তোমার মারও···

হ্যাঁ তার আগে কথা উঠতে পারে না। আমি কি এখানেই পড়া শেষ করবো? বাবা! তা হবে না। আমাকে এম, এ, পাশ করতেই হবে।

সে তো ভাল কথা। তাই তো আমি তোমার বিয়ে এমন জায়গায় ঠিক করেছি যেখানে তোমার পড়ার বা স্বাধীনভাবে চলাফেরার কোন অসুবিধা হবে না। আমি কি তোমাকে জানি না?

তোমাকে এত এখন ভাবতে হবে না বাবা।

সমস্ত চিন্তা ও আলোচনায় ছেদ টানতে চাইল অমিতা।

তোমার মা থাকলে আজ একথা আমি ভাববার প্রয়োজন মনে করতাম না। কিন্তু আজ তোমার মা নেই, আমি না ভাবলে আর কে আছে বল একথা ভাববার? তোমার বিয়ে দিয়ে আমি শান্তি পেতে চাই।

তারপর টুকলার না?

কেন?

অবাক হলেন প্রসন্নবাবু!

ও এখনও কিছুদিন পড়বে। সবে ফার্স্ট ইয়ার।

কেন তার দরকার কি? আমাদের দুজনেরই বিয়ে দিয়ে নিশ্চিত হও। আমরাই তো তোমার দুটো জঞ্জাল।

ওঃ বিয়ে দেওয়া মানে বুঝি জঞ্জাল সরান? এ আবার মাথায়

কোথা থেকে ঢুকল। আমি কি চিরদিন থাকব? তখন? বিয়ে মেয়েদের অবশ্য কর্তব্য! বুঝলে?

নাঃ আমি তা মানি না।

জোর গলায় বলেছে অমিতা।

তোমায় এই শেষ বলে দিলাম বাবা বিয়ে আমি করব না।

আর আমি বলছি, বিয়ে না করে তুমি পারবে না। আর কাকে তাও জানি!

সমস্ত মুখটা লাল হয়ে গেছে প্রসন্নবাবুর।

তাহ'লে ভাল করেই জেনে নাও যে বিয়ে যদি একান্তই করি তো সুবিনয়কেই—আর কাউকে নয়।

হঠাৎ জোরের সঙ্গে বলে অমিতা।

চাপা রাগে প্রসন্নবাবুর সমস্ত মুখ থম্‌থম্‌ করছে। মেয়ের কাছে এতটা ঔদ্ধত্য তিনি আশা করেননি। বিশেষ করে অমিতা, সে চিরদিন চুপচাপ, কোন কাজে তার উঁচু গলা কেউ শোনেনি!

তবে জেনে রাখ! আমি যে পাত্র ঠিক করেছি তার সঙ্গেই তোমার বিয়ে হ'বে। সুবিনয়কে বিয়ে করা তোমার হ'বে না। অন্ততঃ আমি বেঁচে থাকতে নয়।

আর আমি এইটুকুও জানি বাবা, সুবিনয়ের সঙ্গেই আমার বিয়ে হ'বে; আর তুমি বেঁচে থাকতেই।

আচ্ছা দেখা যাক্‌···

দাঁতে ঠোঁট চেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন প্রসন্নবাবু।

সারারাত অমিতা কেঁদেছে। আর ওর কান্না যেন ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত ঘরে, সারা পৃথিবীতে। যতক্ষণ বাবা আর দিদির কথা কাটাকাটি হচ্ছিল ততক্ষণ চুপ করে বসে ছিল টুকলা। ওরা

চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ ও চুপ করে ঘরে বসে থেকেছে।
কোন কথা বলতে পারেনি।

অমিতা যেন তার কাছ থেকে অনেক—অনেক দূরে চলে গেছে। অমিতার জগৎ যেন ওর জগৎ থেকে অনেক আলাদা। কত ঠাট্টা করেছে ও দিদিকে, কত হাসাহাসি করেছে ওরা দুই বোনে, সুবিনয়দাকে নিয়ে কত কি বলেছে ও অমিতাকে অথচ আজ যেন সব কিছু জানা থেকে অজানায় চলে গেল। সে দিদি, সুবিনয়দা সেই সব ঠাট্টা তামাশা যেন আর নেই, তারা সবাই যেন অন্য গম্ভীর ভয়ঙ্কর এক জগতে চলে গেছে। সেখানে চ্যালেঞ্জ, ভয় দেখান সব কিছু মিলিয়ে কি এক থম্‌থমে ব্যাপার অপেক্ষা করছে। টুক্‌লা সেখানের কোন খবর রাখে না।

রাতে শুয়ে শুয়েও অনেকবার ভেবেছে টুক্‌লা কতবার ভেবেছে দিদিকে সান্ত্বনা দেবে। আগে হ'লে কোন দ্বিধা করত না, সব কিছু নস্যাৎ করে উড়িয়ে দিত। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর কোনকিছুই সহজ ভাবে যেন আসে না। রহস্যময় জগতের আভাস যেন সব সময়েই তাকে ভাবিয়ে তোলে। তারপর বাবা আর দিদির সন্ধ্যার কথা কাটাকাটি তাকে আরও ভীত করেছে। কি গম্ভীর ভাবে বলল দিদি কথাগুলো। তারপর থেকে কত কান্না কাঁদল দিদি। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও দিদির পাশে শুয়ে যেন দিদিকে জড়িয়ে ধরতে পারল না সে। দিদি যেন সেই দিদি নেই ; আর কেউ।

তবু শেষ রাত্রে একবার ডেকেছিল টুক্‌লা।

দিদি ! এই দিদি !

সাড়া পায়নি।

কেন ঘুম ভেঙ্গেছিল সে জানে না। কোনদিন ভাঙ্গে না। সারা ঘর অন্ধকার। ওপাশে দিদির খাটে উঠে যাবে ভেবেছিল, কেমন যেন গা ছমছম করছিল তার। কোনদিন ভয় পায়নি সে, কিন্তু

আজ তার কেন জানি ভয় করেছে বার বার, আর ঘুম ভেঙ্গে গেছে। মায়ের কথা; পুরান দিনের কথা বার বার মনে পড়েছে।

তারপর কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে বুঝতেও পারেনি। বেলায় ঘুম ভেঙ্গে দেখেছে অমিতা তার আগেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে।

আর শুয়ে থাকা যায় না। টুক্‌লা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। তারপর মুখ ধুয়ে খাবার ঘরে চলে এল। টেবিলে দুধ আর ডিম ঢাকা ছিল। মা মারা যাবার পর কিছুদিন আগের মতই চলল সব, মা বেঁচে থাকতে বুঝতেও পারত না, চাকর ঝি সব থাকা সত্ত্বেও মা দিবারাত্র এত কি খাটে, কেন খাটে; লোকজনই তো সব করতে পারে। কিন্তু এখন জানে একটা লোকের অভাবে সব শৃঙ্খলা যেন চুরমার হয়ে গেছে। কি যেন হয়ে গেছে। সব কাজই চলছে তবু ঠিক তেমনটি নয়।

সংসারের কাজে মেয়েদের কোনদিন টানেননি সুধাময়ী। তারাও কিছু জানে না। প্রয়োজন পড়লে মায়েরই পিসী মাসী কেউ এসে গেছেন, মাকে সাহায্য করতে। তাই মায়ের মৃত্যুতে যে বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল সেটুকু ওরা কেউ ভরাতে পারেনি। শুধু বাবার কাজ অমিতাই দেখাশোনা করে। আর মতির মা তো আছেই। টুক্‌লা কলেজ, নাচগান; থিয়েটার আর পড়া নিয়েই আছে আনন্দে।

আজকাল আর খাবারের কাছে কেউ বসে থাকে না। যে যখন উঠবে সে তখন খেয়ে নেবে। সাধারণতই বেলায় ওঠা অভ্যেস বলে টুক্‌লা একাই খায়।

নিজের খাবার খেতে খেতে ওপাশে তাকিয়ে দেখল টুক্‌লা। দিদিও কি খায়নি নাকি এখনও? ওর খাবারও তো ঢাকা দেওয়া পড়ে আছে। ব্যাপার কি?

মতির মা?

চেঁচাল টুক্‌লা।

মতির মা তরকারি কুটছে

ঠাকুর এসে জবাব দিল।

দিদি খায়নি ?

বড় দিদি তো ভোরবেলাই বেরিয়ে গেছেন। এখনও তো ফেরেননি, খাবেন কি করে।

কোথায় গেছে ?

অবাক হ'ল টুক্‌লা। এখনও ফিরল না দিদি ?

আজ্ঞে আমি তো তা জানি না। রতন জিজ্ঞেস করতে নাকি বলেছেন বন্ধুর বাড়ী যাচ্ছেন।

বন্ধুর বাড়ী ? কোন বন্ধু ?

নিজের মনেই ভাবতে চেষ্টা করল টুক্‌লা।

ঠাকুর চলে যাচ্ছিল, তাকে ডাকল টুক্‌লা।

এই ঠাকুর শোন!

কি দিদিমণি ?

বাবা কি জানেন ? কোথায় বাবা ?

বাবু তো এখনও ঘুমোচ্ছেন। ওঁকে তো তোলা হয়নি। দিদিমণিই রতনকে বারণ করে গেছেন ওঁকে জাগাতে। কাল রাতে বাবুর আবার জ্বর এসেছে কিনা।

বাবার জ্বর ?

হ্যাঁ কাল রাতে খুব জ্বর এসেছে!

বাবার জ্বর, আর দিদিটা ভোর থেকেই কোথায় বেরিয়ে গেল কে জানে। দুধটা খেয়ে নিল টুক্‌লা।

ঠাকুর ডিম, আর খাব না। ভাল লাগছে না রেখে দাও। পরে পোচ সেদ্ধ করে দিও, ভাতের সঙ্গে খাব।

খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাড়াতাড়ি বাবার ঘরের পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল টুকলা। বাবা তখনও ঘুমোচ্ছেন। কি ক্লান্তই দেখাচ্ছে বাবাকে।

ঘরের জানালা দরজা সব বন্ধ। ভেতরে ঢুকে এল টুক্‌লা। ঘরটা বড় বেশী গরম হয়ে আছে। ভোরবেলা রতন আর দিদিই এসব খুলে দেয়। আজ দিদির হ'ল কি।

ওঃ মনে পড়ল এতক্ষণে। কাল দিদির সঙ্গে যে বাবার ঝগড়া হয়েছে, তাই রাগ করে বাবার ঘরে আসেনি দিদি। কিন্তু তাই বলে অসুস্থ রোগা মানুষের ওপর রাগ? দিদিটা যেন কি এক পাগল। সামান্য কথায় এত রাগ?

আস্তে আস্তে জানালাগুলো খুলে দিল। সকালের মিঠে রোদ ঘরের মধ্যে এসে পড়ল। বাবার চোখে আলো লাগবে ভেবে মাথার দিকের ভারী পর্দাটা ভাল করে টেনে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল টুক্‌লা। রতনকে পাহারায় বসিয়ে চলে এল নিজের ঘরে।

আসুক দিদি এক চোট ঝগড়া করবো।

কিন্তু অমিতা এল না।

সকাল গড়িয়ে দুপুর এল।

বাবাকে জানান প্রয়োজন। কি করবে টুক্‌লা? আশ্চর্য বাবাও তো একবার খোঁজ করেননি? অবশ্য বাবার জ্বর বেড়েছে। তাছাড়া···

টুক্‌লা এত ভাবতে পারে না? ও কি কোনদিন এত ভেবেছে? বাবাকে খবর দেবে কিনা বুঝতে পারল না। মিছামিছি রুগ্ন মানুষকে উদ্বিগ্ন করে লাভ কি?

মীরাদির বাড়ী খোঁজ নিয়েছে। সেখানে তো দিদি নেই। তবে? আর কোথায় যেতে পারে? ভাল লাগে না টুক্‌লার। আজ আবার ক্লাসের প্রতিমার জন্মদিন। নেমন্তন্ন আছে বিকেলে। দিদিকে বলে ওর সেই হলদে সিল্কের শাড়ীটা পরবার তালে আছে;

নিজের শাড়ী তো বিশেষ নেই। কিন্তু কোথায় দিদি? তারই তো পাত্তা নেই। ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হ'ল টুক্‌লা। কোথায় যে গেল দিদিটা।

বিকেল তিনটের পর খবর এল। সারাদিন খেতে পারেনি টুক্‌লা, কলেজ যাওয়া তো দূরের কথা। মনের উৎকণ্ঠা মনেই চেপে রেখেছে, পাছে বাবা ব্যস্ত হন। পাছে চাকর, ঠাকুর কিছু জানতে পারে। অনেক বেলা অবধি তারাও খায়নি। শেষে টুক্‌লাকে জিজ্ঞেস করে খাওয়া দাওয়া করে তারা শুয়েছে।

প্রসন্নবাবুকে ওষুধ আর দুধ খাওয়াবার সময় উনিও যেন অবাক হলেন না, অমিতার বদলে টুক্‌লাকে দেখে। কিন্তু খুব অবাক হ'ল টুক্‌লা। বাবা কি ধরেই নিয়েছেন যে অমিতা আর এ ঘরে আসবে না? ওঁর সেবা করবে না? সামান্য একটু কথা কাটাকাটির এত মূল্য দেন এঁরা?

কিন্তু কথা কাটাকাটিটুকু যে সামান্য নয় মোটেও; সে কথাই বুঝল টুক্‌লা খবর আসার পরে।

যে লোকটি খবর আনল, তাকে টুক্‌লারা চেনে না; যদিও তার কথামত বিশ্বাস করতে গেলে জানতে হয় যে সে এই পাড়ারই লোক, আর সুবিনয়েরই বিশেষ বন্ধু।

অমিতা ভোরবেলা বাড়ী ছেড়ে মীরাদের বাড়ীই গিয়েছিল। সেখানে মীরার স্বামীর সাহায্যে সুবিনয়ের সঙ্গে ওরা চলে গেছে আসানসোল। যাবার আগে সুবিনয়েরই দিদির বাড়ীতে সকালেই ওদের রেজেস্ট্রি করে বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ে নাকি ওরা করতই রেজেস্ট্রি করে, তবে হয়তো অপেক্ষা করত আরও কিছুদিন, অমিতার পরীক্ষার পরে। কিন্তু কাল রাত্রে যখন অমিতা জানতে পারল, বাবা তাকে তাদের সম্পর্কিত কাকা হৃদয়বাবুর কাছে দেশে বা মামার বাড়ী পাঠিয়ে দেবেন কড়া পাহারায় রাখার জন্য, তখনই সে মনস্থির করে ফেলে, মীরাদের বাড়ী চিঠি দিয়ে খবর পাঠিয়ে সব ঠিক

করে ফেলে। নাহ'লে এভাবে পালানোর প্রয়োজন হ'ত না হয়তো।

এখনই বা কি এমন প্রয়োজন হ'ল টুক্‌লা ভেবে পেল না। কথাগুলো শুনে পাথরের মত বসে রইল টুক্‌লা। ভাবতেও পারছে না যেন, বিয়ে করবার জন্য দিদি তার এতদিনের বাড়ী ছেড়ে রুগ্ন বাবাকে ছেড়ে পালাল? অথচ কালই তো কত জোরের সঙ্গে বলল ও জীবনে বিয়ে করবে না। কি সাংঘাতিক। কাকে বিশ্বাস করবে সে, কাকে? কখন দিদি জানতে পারল বাবা তাকে পাঠিয়ে দেবেন; আবার কখন বাবার ঘরে এসেছিল? তাই বলে অত সিরিয়াসলি নিল কেন বাবার কথা। বাবা তো রেগে ছিলেন, রাগের মাথায় কথার কোন মূল্য আছে। দিদি তো সব বোঝে, আর এটুকু বুঝল না? এ কি করল দিদি।

চিরদিন দিদিই সব ব্যবস্থা করে, সব ভার নেয়, আর আজ দিদি তার নিজেরই ভার টুক্‌লার ওপর চাপিয়ে দিয়ে চলে গেল? কি করে পারল দিদি? একবার ভাবল না দিদি টুক্‌লা কি করে পারবে এ ভার বইতে? একবারও ভাবল না রুগ্ন বাবার কথা? এই কি প্রেম? এ যে সর্বনাশ? অশোককে নিয়ে তাকে শান্তিরা কত ক্ষেপিয়েছে সে কি এই রকম একটা সর্বনেশে ব্যাপারের জন্য? সে কখনও পারে কারও জন্য এইভাবে ঘর সংসার আত্মীয় সব ছেড়ে চলে যেতে? ভাবতেও পারে না টুক্‌লা। এ কি শক্তি, কি আকর্ষণ? যার জন্য মানুষের সব বিবেচনা, সব অনুভূতি বন্যার প্রবল বেগে ভেসে যায়? শুধু কি প্রেমই বেঁচে থাকবে? আর কিছু বড় নয়? শুধু প্রেম? বুঝতে পারে না টুক্‌লা। ভাগ্যে মা বেঁচে নেই। ভাবতেও কেঁপে ওঠে টুক্‌লা। পাশের বাড়ী যেতে হ'লে মাকে জিজ্ঞেস করতে হ'ত। চাকর বা ঝি যেত সঙ্গে। আর দিদি কোথায় চলে গেল কত অচেনাদের মাঝে, কাউকে না বলে,

আপন কাউকে সঙ্গে না নিয়ে। ওর কি এখন সুবিনয়দাই সব থেকে আপন, আর কেউ নয়?

এত বড় একটা ব্যাপার এমন অনাড়ম্বর ভাবে হয়ে গেল? বিয়ে! দিদির বিয়ে হয়ে গেল! এমনি ভাবে? এমনি সহজে?

মায়ের সঙ্গে সন্ধ্যাগুলো মনে পড়ল। কত আলোচনা, কত পরামর্শ। কত সাধ ছিল মায়ের মনে দিদির বিয়েতে ঘটা করবেন বলে। কি সাজ হ'বে, কি কি গয়না হ'বে, বরাসন কেমন হ'বে, কোথায় লোক বসবে, আর কোন কোন বাড়ী ভাড়া নেওয়া হবে, কেমন সাজান হ'বে এ বাড়ী, কত কি? ভালপিসী, রাঙামাসী অন্য কত লোকের সঙ্গে আলোচনা করেছেন মা। মায়ের কত সুখ ছিল এ আলোচনায়। কত জল্পনা কল্পনা মায়ের। শুধু মায়ের অসুখটা শেষ হবার অপেক্ষা। তখন কে জানত?

কিন্তু তবু মা নেই বলে মায়ের সেই একান্ত ইচ্ছাটুকু পূরণ হ'বে না? তার কোন দাম নেই কারও কাছে? মায়ের অত আশা আকাঙ্ক্ষার এই পরিসমাপ্তি?

সবই কি এই ভাবে শেষ হয়ে গেল? দিদি কি ভেবেছিল বাবা ওর বিয়ে দেবেন না? কেন বাবা তো কাল বললেন খুব ঘটা করেই দিদির বিয়ে দেবেন। মা যেমনটি চেয়েছিলেন, হয়তো তেমনটি করেই। দিদিই তো রাজী হ'ল না। কি জন্য? শুধু সুবিনয়দার সঙ্গে বিয়ে হ'বে না বলে। কেন? এত ভালবাসে দিদি সুবিনয়দাকে? বাবা, টুক্‌লা সবাই এর থেকে বেশী? কই এত বড় সত্যি কথা একদিনও তো বুঝতে পারেনি টুক্‌লা। অভিমানে ওর চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়াতে লাগল। দিদিটা এমন? ছিঃ, সব থেকে তার কাছে বেশী হ'ল সুবিনয়দা? একটা লোকের জন্য এত? কই টুক্‌লার তো এমন মনে হয় না? এই প্রেম? এরই নাম ভালবাসা? সে তো ভালবাসে তার বন্ধুদের, বাবাকে, দিদিকে আর হ্যাঁ বিকাশদাকেও, আজকাল বিকাশদাকে সে

আগের থেকেও বেশী ভালবাসে; কিন্তু তা'বলে তার জন্য সব ত্যাগ। বাবাকেও, দিদিকেও? না অসম্ভব, এ কেমন ভালবাসা? মায়ের অভাব তারা ভুলেছে পরস্পরের ভেতর দিয়ে, সেই এত বড় বন্ধন দিদি একটি লোকের জন্য ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল, না দিদিকে সে ক্ষমা করবে না, কিছুতেই না। কোনদিনও না। কেমন যেন হঠাৎ মনে হ'ল, দিদি তাকে ঠকিয়েছে, নিদারুণ ভাবে ঠকিয়েছে। তাকে কোনদিনও ভালবাসেনি।

ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল টুক্‌লা, দিদির টেবিলে মাথা রেখে।

অনেকক্ষণ কেঁদে মনটা একটু হাল্কা হ'ল যেন। তার প্রধান ভাবনা হ'ল বাবাকে বলবে কি করে একথাটা। বলতে তো হ'বেই, তাছাড়া এখন কাকেই বা আর বলবে? এ সব কথা যাকে বলা যেত, সেই দিদিই তো......। কি যে করল দিদি! এখন ঝি চাকরদের কি বলবে? পাড়ার লোকেদের? আজ না হয় কাল সবাই তো জানবে? তখন শান্তি, রমা, প্রতিমা, বিকাশদা তাদের কাছেও কি বলবে না টুক্‌লা? বুকটা তোলপাড় করতে লাগল। কি সহজে দিদির বিয়ে হয়ে গেল। অথচ এত সহজে কি টুক্‌লা কাউকে জানাতে পারবে কথাটা? বাবাকে?

কি করে জানাবে? কি ভাবে অবতারণা করবে? দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁটটাকে চেপে ধরল টুক্‌লা।

সুধাময়ী মারা যাবার পরই প্রসন্নবাবু ভেঙ্গে পড়েছেন ভীষণ ভাবে। মনে মনে বহুদিন আগে থেকেই প্রস্তুত হ'বারই কথা। কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলেই তিনি যেন কোনদিনও বিশ্বাস করেননি একথা, এই সত্যকে। উট পাখীর মত মুখ গুঁজে ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছেন। এ রকম অপ্রত্যাশিতভাবে যে সুধাময়ী চলে যাবেন ভাবতে পারেননি প্রসন্নবাবু।

সংসার নিয়ে কোনকালেই মাথা ঘামাননি তিনি। সম্প্রতি অমিতার সঙ্গে সুবিনয়ের বাড়াবাড়ি ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করে উদ্বিগ্ন

হয়েছিলেন। সুধাময়ীর শাসন আর সতর্কতা মনে পড়ল তাঁর। সুবিনয়ের সঙ্গে অমিতার বিয়ে সামাজিক মতে দেওয়া সম্ভব নয়। সুবিনয় কায়স্থ। তাঁর আত্মীয়রাও তাকে সে কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। সুধাময়ীও পাশে নেই, তাই পিতার কর্তব্য পালন করতে হঠাৎ যেন সজাগ হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

কাল রাত্রে অমিতার কথায় রীতিমত আঘাত পেয়েছেন তিনি। খুব বড় আঘাত। অমিতা নিজেই জানে না ওর এই আকস্মিক বিদ্রোহে কত বড় ধাক্কা পেয়েছেন প্রসন্নবাবু। সুধাময়ীর ওপর তাঁর রাগ হয়। এমন বিপদে মানুষে ফেলে? বড় বড় দুটো মেয়ের দায়িত্ব তাঁর মাথার ওপর চাপিয়ে বেশ চলে গেলেন তিনি। মন মানতেও চায় না, কোন কারণ বুঝতে চায় না যে মৃত্যু কারও অধীন নয়। রাগ হয়, অভিমান হয় সুধাময়ীর ওপর। কি দরকার ছিল তাঁর অনর্থক খেটেখেটে, অকালে ওভাবে নিজেকে নিঃশেষ করবার?

ঘরে কেউ বর্ষীয়সী নেই, যার সঙ্গে দুটো কথা আলোচনা করবেন। সবাইকে বলা যায় না এমন কি তাঁর পরম বন্ধুদেরও না, মজা পেয়ে সরস আলোচনা চালাতে পারে, কে জানে! তাঁর নিজের সম্পর্কে তো কোন কালেই কেউ নেই এক হৃদয় ছাড়া, তাও তাঁরা বিশেষ সম্পর্ক রাখেন না। তবু হৃদয়ের কাছেও কিছুদিন পাঠাতে পারতেন মেয়েকে। সেকথাই কাল ভেবেছিলেন। তাছাড়া আর আছে কে? মা মারা যাবার পর থেকে ঐ এক সুধাময়ী আর তাঁর দু'একজন আত্মীয় স্বজন; আপদে বিপদে যাঁরা করে এসেছেন। তাঁরাও তো মেয়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রসন্নবাবুদেরও যেন বিসর্জন দিয়েছেন। ডাকতে পাঠালে, নিতে লোক পাঠালে নানারকম ওজর আপত্তি করে তাঁরা আসেন না। তাছাড়া বোধহয় সুধাময়ী ছাড়া এ বাড়ীতে তাঁরা আসতেও পারেন না। স্পষ্টই তো লিখেছেন ভালপিসী, তাঁদের মন চায় না। ঠিকই। কি বলবেন প্রসন্নবাবু তাঁদের। তবু কাল ওঁদের কথাও ভেবেছিলেন একবার। সুবিনয়ের

সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করা প্রয়োজন। এখানে অমিতা থাকলে তিনি তা পারবেন না। কোথাও পাঠাতেই হবে। যে কোন নিরাপদ জায়গায়। এখানে নয়, এখানে রাখা চলবে না অমিতাকে। এসব কি তাঁর কাজ ?

একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছবার পর বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়েছিলেন। মেয়েকে বকাবকি করার পরও। নিশ্চিন্ত হ'তে পারাই তাঁর স্বভাব।

খাবার পরে অমিতা যখন ক্ষমা চাইতে এসেছিল তখন তাঁর সিদ্ধান্ত তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিন তাকে। মনে শান্তি পেয়েছিলেন জানিয়ে দিয়ে। মেয়ে জানুক তারা বাবা দুর্বল নয়, অবস্থা বুঝলে কড়া ব্যবস্থা করতেও পিছপাও নন।

অনেক রাত অবধি ঘুম আসেনি। সন্ধ্যায় জ্বর নিয়ে ফিরেছিলেন। সেই জ্বর গায়েই বহুক্ষণ বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিজেকে শান্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন। রাত্রে তাই জ্বরটা অত বেশী এল।

ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর খাস চাকর রতন দরজার গোড়ায় বসে ঢুলছিল।

অমিতা বেরোবার মুখে সেই তো খবর দিয়েছে দিদিমণিকে জ্বর বাড়ার। বাবুকে ডাকবে না কি—জিজ্ঞেস করায় দিদিমণিই তো তাকে বারণ করেছে।

তাই জানতেও পারেননি তিনি কিছু। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্বর বেড়েছে। ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়েছে টুক্‌লা। পূর্ণ বিশ্রামের উপদেশ দিয়ে ওষুধপত্তর লিখে দিয়ে তিনি চলে গেছেন। ভাবনার কিছু নেই বটে, ঠাণ্ডা লেগে জ্বর।

সেজন্য টুক্‌লা ভাবেনি। রতন আর মতির মার সাহায্যে সে সব ব্যবস্থা করেছে। হঠাৎ একদিনে যেন তার বয়স বেড়ে গেছে। কত বড় উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা বুকে চেপে রেখে সব কাজ, সব কর্তব্য সে করে গেছে সারাদিন। প্রসন্নবাবু তো ধরেই নিয়েছেন অমিতা

রাগ করে তাঁর ঘরে ঢুকছে না। তাই তার অনুপস্থিতি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করেননি তিনি।

কিন্তু এখন তো তাঁকে জানান দরকার। নিজের ঘরে পায়চারি করে করে ক্লান্ত হ'ল টুক্‌লা। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। শীতের দিন সাড়ে পাঁচটা বাজতে না বাজতেই সন্ধ্যা। খবর এসেছে তিনটের পর। আর তো দেরী করা যায় না। মনে পড়ল পাঁচটায় প্রতিমাদের বাড়ী তার জন্মদিনে নেমন্তন্ন ছিল। তার কত প্ল্যান ছিল আনন্দ করবার। সব বন্ধুরাই যাবে। দিদি বলেছিল ওর হলদে সিল্কের শাড়ীটা পরতে দেবে। চেয়ে দেখল আলমারির কাঁচ দিয়ে শাড়ীটা দেখা যাচ্ছে। শুধু সেটা কেন, সব শাড়ীই দিদি ফেলে রেখে গেছে, তার জন্য।

সন্ধ্যার আধ অন্ধকারে বাবার ঘুরে ঢুকল টুক্‌লা; তখন যেন ঘুমের আচ্ছন্নতায় রয়েছেন প্রসন্নবাবু।

রতন, বাবা আর ওঠেননি ?

না ঘুমোচ্ছেন আর কোথায়। ঘুমতো হচ্ছে না। খালি উস্‌খুস্‌ করছেন।

ওদের কথার শব্দে চোখ মেললেন প্রসন্নবাবু।

কে ? আমি মা ?

ঠোঁট দিয়ে কান্না চাপল টুক্‌লা। অসুখে দিদিকেই মনে করেন বাবা। দিদির সেবাতেই যে অভ্যস্ত।

না বাবা ! আমি টুক্‌লা।

অমি কি এখনও আমার ওপর রাগ করে আছে ? হ্যাঁরে টুক্‌লা ?

বাবা !

আজ সারাদিন আমার ঘরে ঢোকেনি সে। দেখলি টুক্‌লা···

পাগলি আর কি ? বাপের ওপর কেউ অত রাগ করে।

বিশেষ করে এমন বাপের ওপর। ভাবল টুক্‌লা।

বাবা !

জোর করে শক্তি সঞ্চয় করল টুক্‌লা। বাবা, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

কথা? কি কথা?

যেন ভয় পেলেন প্রসন্নবাবু। আবার কথা? মেয়েদের এই একটা কথায় বড় ভয় পান প্রসন্নবাবু।

অমিতা কোথায় রে?

বলছি, রতন বাইরে যা।

রতন বেরিয়ে যেতেই বাবার একেবারে কাছে এসে খাটে বসল টুক্‌লা।

বাবা গো! তোমাকে যে কি করে বলবো কথাটা ভেবে পাচ্ছি না।

তুই আবার এত ভণিতা করতে শিখলি কোথা থেকে?

ভণিতা নয় বাবা।

ঠোঁট কাঁপছে টুক্‌লার।

কি ব্যাপার?

প্রসন্নবাবু রীতিমত উদ্বিগ্ন হলেন।

অমির কিছু হয়নি তো?

হ্যাঁ বাবা!

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল টুক্‌লা।

কি, হয়েছে কি?

প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, কন্যাস্নেহে কাতর প্রসন্নবাবু।

দিদি! বাবা!······দিদি বিয়ে করেছে?

কি করেছে?

বিয়ে!

বিয়ে করেছে? অমি বিয়ে করেছে?

নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না প্রসন্নবাবু।

হ্যাঁ বাবা।

মাথা নাড়ল টুক্‌লা।

একটু আগে খবর এসেছে।

খবর এসেছে মানে? কোথায় সে?

ভোর থেকে দিদিকে পাওয়া যাচ্ছে না। তোমার জ্বর বলে জানাইনি। তাছাড়া এসব তো আমি ভাবতেও পারিনি।

আস্তে আস্তে বলল টুক্‌লা।

দুপুরে এক ভদ্রলোক এসে বলে গেলেন, যে দিদিরা বিয়ে করে আসানসোল চলে গেছে।

সুবিনয়কে নিশ্চয়!

আপন মনে বললেন প্রসন্নবাবু।

বাজপড়া তালগাছের মত দেখাচ্ছিল তাঁকে। সমস্ত অবলম্বন যেন তিনি হারিয়েছেন। অমিতা যে চলে গেছে তার জন্য নয়। শুধু তিনি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছেন না তাঁকে অমান্য করবার এ স্পর্ধা অমিতা পেল কি করে। এত সাহস তার কি করে হল?

বাবা!

অনেকক্ষণ পর টুক্‌লা ডাকল।

হুঃ!...

আমায় মনে হয় দিদির সঙ্গে দেখা করে ওকে একটু বুঝিয়ে বললে...আমি আর তুমি যদি যাই, তুমি ভাল হয়ে উঠলে?

ওই সুবিনয়কে বিয়ে করল শেষে?

টুক্‌লার কথাগুলো বোধহয় কানে যায়নি প্রসন্নবাবুর।

শেষ পর্যন্ত নিজের জেদই রাখল? ওই সুবিনয়কেই বিয়ে করল?

আপন মনে বললেন প্রসন্নবাবু।

বাবা আমি তাই বলেছিলাম......

ভাবতেও পারা যায় না। নিজের মেয়ে এভাবে তাঁর বাপকে

অপমান করল? কি করে? কি করে? আর এদেরই মুখ চেয়ে আমি.......

একটা বড় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন প্রসন্নবাবু। তারপর আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ে বালিশে মুখ ঢাকলেন।

অনেকক্ষণ বসে থাকল টুক্‌লা। কিন্তু প্রসন্নবাবু মুখ তুললেন না বালিশ থেকে। সন্ধ্যায় পর রাত হয়ে এল। অন্ধকার ঘরে দুজনে কাছাকাছি অথচ যেন সমুদ্রের ব্যবধানে বসে রইল।

রতন এসে ঘরে ধুনো দিয়ে আলো জ্বালাতেই চমক ভাঙ্গল টুক্‌লার।

সমস্তটা যেন কেমন ফাঁকা মনে হতে লাগল। চিন্তা করতেও পারছে না। কত বড় আঘাত আজ বাবা পেয়েছেন। কিন্তু কি করতে পারে সে চুপ করে বসে থাকা ছাড়া?

কতক্ষণ ধরে ও বসে আছে। ওর গলা ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইল। বাবার জন্য, দিদির জন্য, মায়ের জন্য অভিমানে আর বুকভরা চাপা কান্নায় তার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। বাবা তার বড় মেয়ের শোকে মুহ্যমান। আর টুক্‌লা? তার কথা একবারও ভেবেছেন? দিদি—খালি দিদির জন্য—কেবল দিদির জন্য,—দিদি চলে গেছে বলে তিনি দুঃখ করছেন, শোক করছেন।

আর টুক্‌লার? একবারও তাঁর মনে পড়ল না টুকলার কথা? ওকে আজ সবাই ত্যাগ করল, দিদি বাবা সকলে। আর কারও কাছে তার অস্তিত্বের দাম নেই, সবাই তার কথা ভুলেছে, দিদি বাবা সবাই। সে আজ একা। এই নিদারুণ নিঃসঙ্গতার জ্বালায় টুক্‌লার বুক যেন পুড়ে যেতে লাগল। বাবা আর দিদির ওপর অভিমানে তার চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়তে লাগল।

একবার ভাবল বাবাকে ডাকবে। খাওয়ারও সময় হয়েছে তো। কিন্তু থাক্। বাবাকে বিরক্ত করতে ইচ্ছে হল না টুকলার। শান্তিতে নিজের মনবেদনা, নিজের শোক নিয়ে থাকুন তিনি।

নিজের মনভার টুক্‌লা নিজেই সহ্য করবে। ওর উপস্থিতি দিয়েও আর বিরক্ত করতে চায় না। বাবার পাশ থেকে উঠে এল।

নিজেও কিছু খেল না। কোন কথা ভাবতে পারছে না। সারারাত ঘুমোতে পারল না। মায়ের মৃত্যুর পর আবার এ বাড়ীতে নতুন করে শোক এল যেন। নাঃ আরও ভয়ঙ্কর। মায়ের মৃত্যুও বুঝি এতটা ভয়াবহ ভাবে আসেনি। তারা সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছিল, সে শোক তাই সহনীয় হয়েছিল। কিন্তু আজ তো তার পাশে কেউ নেই। একা তাকে সব কিছু বহন করতে হবে।

ঝি-চাকররা কি বুঝেছে কে জানে। সে সব মতির মা বুঝবে। টুক্‌লা তার নিজের ঘরে, বাবা তাঁর ঘরে; যে যার শোক দুঃখ নিয়ে যেন ধ্যানে বসল।

ভোরের দিকে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। দিদির শূন্য খাটটার দিকে একবার তাকিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল।

তুমি আবার আজ কোথায় যাচ্ছ ?
মতির মা প্রায় ধম্‌কে উঠল। বেরোবার মুখেই ওর সঙ্গে দেখা।

শান্তিদের বাড়ী।

না বাবু, এখন যাওয়া হবেনি। বাবু উঠুক আগে।

চেঁচামিচি করতে ইচ্ছে হল না টুক্‌লার। —আচ্ছা তাহলে শান্তিকে এই চিঠিটা দিয়ে এস। যাও।

খবর পেয়ে শান্তি এল, বিকাশদাও। বিকাশদাকে তো ও আসতে বলেনি ? যদিও—ওকেও জানাতে চেয়েছিল সব থেকে আগে। আজকাল কেমন যেন সবকথা বিকাশকে বলতে ইচ্ছা করে, অথচ ওকেই ও সহজ ভাবে বলতে পারে না। তাই কত কথা বলা হয় না। ভালই হয়েছে—শান্তি বিকাশদাকে খবর দিয়েছে। বুদ্ধি আছে শান্তির।

কথাটা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল শান্তি। তারা যে ভাবতেও পারে না। অমিতাদির মত ঠাণ্ডা ধীর স্থির মেয়ে বিয়ে করার জন্য বাড়ী থেকে পালিয়ে গেল? নিজের ইচ্ছে মত লোককে পাবে বলে সকলকে ত্যাগ? তাহলে? এও সম্ভব? প্রেমের এই নিয়ম? সব থেকে বড়? একবার বিকাশের দিকে তাকাল শান্তি।

কিন্তু বিকাশ অবাক হল না মোটেও। এ বছর ও বি. এ. পাশ করে লক্ষ্ণৌ যাচ্ছে একটা কাজ নিয়ে। কদিন বাদেই তার যাবার কথা।

এতে বিচলিত হবার কি আছে?

জান সুবিনয়দা কায়স্থ।

তাতে কি? সো হোয়াট?

সজোরে হেসে উঠল বিকাশ।

মানে হয় কোন এসব সিলি প্রিন্সিপলের····?

আরে বাবা সুবিনয়দা তো ভাল ছেলে; আফটার অল্ আই লাইক হিম।

ছেলে তো ভাল কিন্তু এভাবে বিয়েতে···বাবার অবস্থা বোঝ তো?

কি আবার? যে যুগের যা!

আমি তো ভাবছি···, বাবাকেও বলেছি অবশ্য···দিদিকে যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরিয়ে আনা যায়।

ডোণ্ট বি রিডিকিউলাস। সত্যি টুকলা অঃফুল। সুবিনয়দা ভাল ছেলে, কোয়ালিফাইড ডাক্তার—আর্নস্ এ লট; অমিতাদি তাকে ভালবাসে; তবে? আপত্তিটা কোথায়?

বাঃ? এসব অসামাজিক নয়?

আবার সজোরে হাসল বিকাশ।

টুকলা পাকা বুড়ির মত কথা বলে না। ওরা পরস্পরকে

ভালবাসে। লেট দেম্ লিভ হ্যাপিলি এ্যাণ্ড পিস্‌ফুলি। ভালবেসে
সুখী হওয়া বড় কথা বুঝলে ?

একবার শান্তির দিকে তাকাল বিকাশ।

ঠিক এই কথাটাই প্রসন্নবাবু বললেন তার পরের দিন।

সারারাত ভেবেছেন তিনি। ভেবে কূল পাননি। শুধু মেয়ের ভবিষ্যৎ নয়, নিজেরও। সকলে এখন তাঁকেই দায়ী করবে। পিতার কর্তব্য পালন করতে অক্ষম হয়েছেন তিনি। কেন তিনি মেয়েদের উচ্চশিক্ষিতা করবার জন্য এত ব্যস্ত ছিলেন। মনে পড়ল তাঁর শালার কথা। প্রসন্নবাবুর মতবাদ কোনদিনই যিনি সমর্থন করেন না। প্রায়ই তিনি শ্লেষ করে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন মেয়েদের এত লেখাপড়া শেখাবার দরকার কি ? মতলব কি তার ? মাস্টারি করে মেয়েরা তাঁকে খাওয়াবে নাকি ? সেই আশায় কি তিনি আছেন ? নাহলে তাঁর মত বয়সকালে কন্যাকে সুপাত্রস্থ করছেন না কেন ? কি আসল ইচ্ছা তাঁর ! কত শ্লেষ, এমনি কত ব্যঙ্গভরা কথা।

আজ মনে পড়ল। বার বার তিনি এসব কথার, এসব মতের প্রতিবাদ করছেন। শিক্ষা আর স্বাধীনতার প্রয়োজন মানুষের মনের বিকাশে। তাঁর মেয়েদের তিনি মানুষ হিসেবে গড়তে চান, পূর্ণ বিকশিত শিক্ষিত মানুষ হিসেবে, শুধু মেয়ে হিসেবেই নয়।

কিন্তু এ কি করল অমিতা ?

সকলে তাঁকেই দোষ দেবে। তাঁর শালার মত বলবে, বয়সকালে মেয়েকে সুপাত্রস্থ করতে পারেননি। তাই আজ জাতি, সমাজ সব গেল। সমাজ-বিধিমতে মেয়ের বিয়ে দিতে পারলেন না। তাই বুঝি তাঁর বিদ্রোহী কন্যা নিজেই ব্যবস্থা করেছে। ভেবে

কূল পান না প্রসন্নবাবু। স্বাধীনতার কি অপব্যয়ই না করল অমিতা।

তাছাড়া ভবিষ্যৎ? তাঁর নিজের? এখন তো সমাজ পরিত্যক্ত তিনি। কে দেখবে তাঁকে? টুকলা? কে দেখবে তাঁর সংসার টুকলা? যে নিজেকেই দেখতে পারে না। ভাবতেও হাসি আসে। এখনও সে ফ্রক ছেড়ে শাড়ী পরতে প্রায়ই আপত্তি করে, পার্বতী নামে কেউ ডাকলে সে চটে যায়; বলে কেমন জানি বুড়ি বুড়ি মনে হয় নিজেকে। সে কি ভার নেবে? এই—সংসারের? কতটা ভরিয়ে দেবে তাঁর এই বিরাট শূন্যতা?

তাছাড়া এর থেকে কি শিক্ষাই বা পাবে ও? সেও তো দুদিন বাদে 'গজভুক্ত কপিত্থর' মত তাঁকে ত্যাগ করে চলে যাবে। নিজের সুখের জন্য, যখনই প্রয়োজন পড়বে। তখন? মেয়েদের নিজস্ব জীবনে কি তাঁর ভূমিকা?

সারারাত ভাবলেন প্রসন্নবাবু। সামনে রাখা সুধাময়ীর বিরাট তৈলচিত্রটির দিকে তাকিয়ে তাঁর ভারী রাগ হল সুধাময়ীর উপর।

আজ যেন মনে হল সুধাময়ীও তাকে ঠকিয়েছেন। তাই! ঠিকই যে সুধাময়ী তাঁকে চিরদিন আগলে রেখেছিলেন, স্নেহ যত্ন ক্ষমতা দিয়ে। কিন্তু স্ত্রী হিসেবে কতটুকু পেয়েছিলেন তিনি তাঁকে? অসুখ আর অসুখ। চিরটি কাল অসুখ। ভালবেসে চিরদিন তিনি সুধাময়ীর সেবা করেছেন। হঠাৎ মনে হল সত্যিই ভালবেসে সেবা করেছেন তিনি না অনন্যোপায় হয়ে সহ্য করেছেন?

মাথায় আগুন জ্বলছে তাঁর। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, কিন্তু মাথার জ্বালা তার দ্বিগুণ। আর ভাবতেও পারেন না তিনি। এত ভাবনা অসহ্য। নিজেকে খালি বঞ্চিত আর শূন্য মনে হচ্ছে। আর এই বঞ্চনা, এই শূন্যতা, এই ত্যাগ তাঁর সারাজীবন? কাদের জন্য?

কেন তিনি সারাজীবন শুধু ত্যাগই করবেন? তাঁরও তো ভোগ করার অধিকার আছে। মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে তিনি যোগী হবেন কেন? চিরদিনই তিনি তাঁর অধিকার ছাড়বেন? কি

পেয়েছেন তিনি জীবনে ? যতটুকুও বা পেয়েছেন তার জন্য তাঁকে কম মূল্য দিতে হয়েছে ? সর্বদা বেশী মূল্যে কম পেয়েছেন তিনি আর নয়, আর নয়।

কেমন করে নিজেকে গুছিয়ে নিল টুক্‌লা। এখন মা নেই দিদি নেই, সে আর বাবা। পরস্পর পরস্পারের অবলম্বন। কিন্তু কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে গেছে, প্রসন্নবাবুর মেজাজ যেন দিনদিন রুক্ষ থেকে রুক্ষতর হতে লাগল।

কোন কিছুই তাঁর পছন্দ হয় না। মা মারা যাবার পরই এ ব্যবহারের প্রকাশ হলে তার কিছু অর্থ থাকত টুক্‌লার কাছে। ও জানে কত যত্ন ভালবাসা দিয়ে মা ঘিরে রেখেছিলেন বাবাকে। কিন্তু মা মারা যাবার পরও তো দিদি আর মতির মার সেবাতেই বাবা সন্তুষ্ট ছিলেন। বরং কতবার দিদিকে তাঁর বিষয়ে অত ভাবতে বারণ করতেন। বেশী দরকার পড়লে রতন। ব্যস ওতেই তাঁর প্রয়োজন মিটে যেত। সদা হাস্যময় বাবার ভেতর শুধু হাসিটুকুর অভাব ছাড়া কোন পরিবর্তন দেখেনি টুক্‌লা, প্রসন্নবাবুর প্রসন্নতার কোন তারতম্য ঘটেনি। অথচ আজ?

টুক্‌লা তো ভেবে পায় না, বাবার এ পরিবর্তন কেন? কেন এমন হল শুধু কি দিদির জন্য? মায়ের শোক বাবার সহ্য হল আর দিদির অনুপস্থিতি তিনি সহ্য করতে পারছেন না? কি রকম অদ্ভুত লাগল টুক্‌লার। কোথায় তিনি টুক্‌লাকেই একমাত্র অবলম্বন করে তাকেই কাছে টানবেন তার পরিবর্তে তুচ্ছ কথায়, তুচ্ছ ঘটনায়

রেগে ওঠেন তিনি। সেদিন তো তার কলেজ যাওয়াই প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। অথচ কারণ তো কিছুই না।

এমনি প্রতিদিনই ঘটছে। যখন তখন। এই জীবনের সঙ্গে টুক্‌লা যেন অভ্যস্ত নয়। অথচ কত চেষ্টা করেছে সে সেবাযত্ন দিয়ে, হালছেঁড়া সংসারের গৃহিনীপনা করে মা আর দিদির অভাব বাবাকে ভুলিয়ে দেবে। কতদিন কলেজে যায় না সে দরকার পড়লে, পার্কে যাওয়ার পাট তো চুকেইছে, বিকেলে গল্প করতেও বেরোয় না। তার কত মধুর লাগে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে, গান করে সন্ধ্যা কাটাতে, কত সময় ছেদ পড়ে তাতে বাবার চীৎকারে। সব কিছু সে বন্ধ করে দেয় বাবার জন্য। ইচ্ছে করে, বাবাকে একটু খুশী করবার জন্য।

সংসারের কাজ করবার লোকের অভাব নেই, কিন্তু বাবার দেখাশোনা সে নিজেই করতে চায়। তাই বাবার সেবার ভার সে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে নিজের অপটু হাতে তুলে নিয়েছে। অথচ আজ বুঝতে পারছে কোন শূন্যতাকেই সে ভরাতে পারেনি। একটা বিরাট শূন্যতা সে নিজের আর সংসারের মধ্যে অনুভব করে পীড়িত হতে লাগল।

নিজের এ শূন্যতা অনুভব করে বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না টুক্‌লার। এই নিঃসঙ্গতা, এই নিরাশ্রয়তা শুধু কি দিদির জন্য? বাবা ভালবাসে না বলে? তার মনের ভেতর খোঁজ করে; তা নয়। কি তবে? উত্তর খুঁজে পায় না টুক্‌লা। কি চায় তাঁর মন? আশ্রয়? মনের আশ্রয়? কবিতা, গান, কলেজ জীবন, আনন্দ, এখানে সে আশ্রয় নেই? তবে কোথায় সে আশ্রয়? কোথায় তার তৃপ্তি? মনের এ অতৃপ্ত ক্ষুধা তাকে যে কুরে-কুরে খাচ্ছে? কি করবে সে? কার কাছে যাবে?

একমাত্র তার আশ্রয় বন্ধুরা। বিশেষ করে বিকাশ আর শান্তি। সব থেকে বেশী ভালবাসে সে এদের দুজনকে। তার নিঃসঙ্গ একক

জীবনে এরা যতটুকু ভরিয়ে রাখে। যতক্ষণ কলেজে থাকে বা এদের সাহচর্য্য পায় ততক্ষণ টুক্‌লার মনে ক্ষোভ বিশেষ দানা বাঁধতে পারে না, কিন্তু বাড়ীতে এলেই সেই ভয়াবহ একাকীত্ব। অন্য জগত যেন এ। সেই বাড়ী, সেই সংসার, সেই লোকজন, সব ঠিক আছে, অথচ এ যেন সে নয়। এখানে মা নেই, দিদি নেই, বাবা থেকেও নেই, তাকে স্নেহ করবার, কাছে টানবার, ভালবাসবার লোকেরা যেন সব পৃথিবী থেকে অন্য কোথাও চলে গেছে। সে পরিত্যক্ত।

যে টুক্‌লা আনন্দ ছাড়া কিছু জানত না, জীবনকে যে সুখ আর আনন্দ দিয়েই বিচার করতে শিখেছিল, যার অকারণ হাসিতে সংসার ভরে থাকত, সে টুক্‌লার আজ মূল্য নেই। একটা গভীর বিষণ্ণতা তাকে সব সময় ঘিরে রয়েছে।

অথচ বিষণ্ণ থাকা তো টুক্‌লার স্বভাবের মধ্যে নেই। তবে ? বিস্ময়ে মন ভরে যায় টুক্‌লার ! তার স্বভাব কি সে তবে জানে না ? তার মনের ভেতর সে আনন্দ, সে জীবনতৃষ্ণা অনুভব করে না কেন টুক্‌লা ! আর পাঁচজন তো এইতেই বেশ সুখী। সে কেন সন্তুষ্ট হতে পারে না ? তবে কি অসুখী হবার বীজ তার নিজের মনের মধ্যেই সুপ্ত রয়েছে ! কার কাছে প্রকাশ করবে একথা টুক্‌লা ? আগে হলে পারত। এখন মনের সব কথা কাউকে বলতে লজ্জা করে। কত অদ্ভুত চিন্তা, কত অস্বাভাবিক ইচ্ছা রাত-দিন তার মনের মধ্যে আসছে যাচ্ছে, সেগুলি তার নিজের মনেই থাক, কাকে বলবে সে ? এক পারে···

বসন্তোৎসব করবে ঠিক করেছিল ওরা। তার জন্য তোড়জোড়ও চলছিল, বিকাশ গোলমাল বাধাল। সে লক্ষ্ণৌ এ যে চাকরি পেয়েছে, তার জন্য পরশুর ভেতরেই তাকে যেতে হবে, তাই তার পক্ষে যোগ দেওয়া সম্ভব নয়। এই অদ্ভুত বিষন্ন পরিবেশ থেকে মুক্তি পেয়েছিল সাময়িকভাবে টুকলা। তার মনের মেঘ অনেকটা কেটে যাচ্ছিল রির্হাস্যাল আর হৈ-চৈ-এ, হঠাৎ সুর কেটে গেল।

কিছু বলল না টুকলা। জানত তো ও, যে বিকাশ চলে যাবে। পুরুষ মানুষ, রোজগারের জন্য তো তাকে বাইরে বেরুতেই হবে; তাছাড়া অন্য বন্ধুরা তো আছেই; তবে?

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে হঠাৎ কান্না পেল তার। একি? বিকাশ চলে যাবে বলে এত কান্না কেন তার? পাগল নাকি সে? চোখ মুছে একটা বই নিয়ে পড়তে আরম্ভ করল। উৎসব বন্ধ হল বলে তার দুঃখ? ভাবতে চেষ্টা করে ও। ভাবতে গিয়ে ও যা বুঝতে পারল তাতে চমকে উঠল যেন ও, মনে করতে চেষ্টা করল বিকাশ বিহীন বিকেল ও সন্ধ্যাগুলো। আর ঠেকাতে পারল না। একটা অদ্ভুত যন্ত্রণায় তার বুকটা মুচড়ে যেতে লাগল। মনের ব্যথা দেহের যন্ত্রণার সঙ্গে মিশে গেল যেন। বুক চেপে ধরে কাঁদতে লাগল সে। সে বুঝতে পেরেছে, সে জানতে পেরেছে বিকাশকে সে ভালবাসে। তার নিঃসঙ্গ জীবনে বিকাশই একমাত্র আশ্রয়। বিকাশ চলে গেলে ও বাঁচবে না। কিছুতেই না। হঠাৎ তার সন্ধ্যাগুলো বিকাশের সাহচর্যে কেন ভাল লাগে, শান্তি আর বিকাশের সঙ্গ তার কেন এত মধুর লাগে, এতদিন সে কথাটা বুঝতেও

পারেনি কিন্তু আজ যেন সব স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল তার সামনে। সে ভালবাসা চায়। সে ভালবাসে। একা নয়, সে ভালবাসা পেয়ে বাঁচতে চায়। বার বার নিজের মনে উচ্চারণ করতে লাগল টুক্‌লা—হ্যাঁ আমিও ভালবাসা চাই,…

পরশু চলে যাবে বিকাশ। আজ এখনই তার সঙ্গে দেখা করার বিশেষ প্রয়োজন টুক্‌লার। বিকাশকে এত বড় সত্যের কথা জানাতেই হবে। সত্যি কেন বোঝেনি আগে এ কথা। এখনই জানাবে সে।…

কিন্তু পরদিন বিকেলের আগে বিকাশকে পাওয়া গেল না। সারাদিন কেনাকাটা আর অন্য কাজে ব্যস্ত রইল বিকাশ। রমাদের বাড়ী কতবার গেল টুক্‌লা বিকাশের খোঁজে। গল্পে উপন্যাসে কত কি পড়েছে, তার সঙ্গে কোন মিল হল না তার জীবনে। কোন রাজপুত্র তার জন্য বরমাল্য নিয়ে এগিয়ে এল না, কোন মন তার জন্য কাতর হল না। সে কি করবে? নির্লজ্জের মত তাই নিজেকেই বলতে হবে একথা! স্বয়ংম্বরা হবে সে। চীৎকার করে বলতে পারলে সে খুশী হত। কেউ তো বুঝতেও পারছে না কি তোলপাড় চলছে তার বুকের মধ্যে, সবাই তেমনি সহজে হাসছে, খেলছে। কারও কি কিছু এসে যাচ্ছে? ঐ তো বিকাশ চলে যাচ্ছে, অথচ ওদের মা বাবা, বোন রমা—কেউই কি তেমন দুঃখ অনুভব করছে? টুক্‌লার মত? আশ্চর্য হল টুক্‌লা। যাক্ গে, সে জানে তার মত এ পৃথিবীতে কে আর ভালবাসে বিকাশকে? শুধু শান্তি ছাড়া অবশ্য। হঠাৎ মনে হল শান্তিও বিকাশকে টুক্‌লার মত ভালবাসে না তো? পরক্ষণেই অসম্ভব মনে হল। পারেই না। শান্তির পক্ষে এত ভালবাসা সম্ভবই নয়। তাহলে এ কথাটা প্রকাশ না করে থাকতে পারত শান্তি? হতেও পারে! আবার মনে হল,

হয়ত শান্তি টুকলার থেকেও বেশী ভালবাসে বিকাশকে। চিন্তা মাত্র আগুন জ্বলে উঠল তার মাথায়। অসম্ভব তা হতে পারে না। বিকাশকে ভালবাসার অধিকার একমাত্র টুক্‌লার, আর কারও নয়।

শান্তিদের বাড়ী গেল টুক্‌লা। শান্তি বেরিয়েছে সকাল থেকে, দুপুরে খাবেও না, কোথায় নেমতন্ন।

হঠাৎ কেমন যেন ঈর্ষা হল টুক্‌লার। বিকাশের সঙ্গে যায়নি তো? পাগল? মনে হোল টুক্‌লার, তাহলে সে জানতে পারত না? অসম্ভব। টুক্‌লাকে লুকিয়ে ওরা কিছু করতে পারে না।

সারাদিন ছট্‌ফট্ করল টুক্‌লা। বিকালে আর গেল না। রতনের হাতে একটা ছোট্ট চিঠি দিয়ে পাঠাল বিকাশদের বাড়ী। কতবার কত ছোট চিঠি, নোট কত কি পাঠিয়েছে বিকাশকে, কত ফাজলামো করেছে, কিন্তু আজ এই চিঠি লিখতে তার প্রথম দ্বিধা সঙ্কোচ এল। কি সম্বোধন করবে সে? বিকাশদা। অসম্ভব। অথচ আর কি সম্বোধন করতে পারে? বিকাশ নিজেও তো কম অবাক হবে না। কতবার লিখল চিঠি। কতবার ছিঁড়ল। শেষকালে দুলাইনে শেষ করল, কোন সম্বোধন না দিয়ে।

"তোমার কি সময় হবে? একবার কিছুক্ষণের জন্য এ বাড়ীতে আসলে খুশী হব।"

টুক্‌লা লিখে, কেটে পার্বতী করল। আজ থেকে কি পার্বতীর জন্ম হল? তারপর কি ভেবে দুটোই কেটে দিল। পুনশ্চ দিয়ে লিখল—

"একাই এসো।—বুঝলে?"

প্রায় সন্ধ্যায় বিকাশ এল। অবাক হয়ে গেছে সে রীতিমত টুক্‌লার ছোট্ট চিঠিটুকু পেয়ে। ব্যাপার কি? টুক্‌লার এমন কি কথা থাকতে পারে যে এইভাবে চিঠি লিখে, একা আসতে বলে নাটকীয় এক ব্যাপার গড়ে তুলবে?

খুব তাড়া আছে বিকাশের। টুকলার চিঠি উপেক্ষা করতে পারে না সে, তাই চলে আসতেই হল।

ঘরে ঢুকে চমকে গেল বিকাশ। ওদের ঘরে নীল আলো জেলে মূর্তিমতী শোকের মত বসে আছে টুকলা। এ যেন অন্য কেউ!

কি ব্যাপার?

হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল বিকাশ।

আমার মনের ভেতর কেমন হচ্ছে!

হঠাৎ কেঁদে ফেলল টুকলা।

সে আবার কি?

অবাক হল বিকাশ।

তুমি লক্ষ্ণৌ চলে যাবে বলে আমার বুকের ভেতর কেমন যন্ত্রণা হচ্ছে। খালি কান্না পাচ্ছে কাল থেকে।

কত কি বলবে ভেবেছিল টুকলা, যেমন সব গল্প উপন্যাসে বলে, কিন্তু এর বেশী বলতে পারল না।

তাহলে বোঝ, আমাকে কতটা ভালবাস।

বিকাশ বলল পরিহাস করে।

বাসিই তো···? বিকাশদা···। লক্ষ্মীটি যেও না।···আমি মরে যাব তাহলে। সত্যি বলছি, মরে যাব···

পাগ্‌লি।

না না তুমি যেও না, তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না। আমি বড় একা। বড় একা।

হঠাৎ কেঁদে উঠে বিকাশের হাত দুটো জড়িয়ে ধরল টুকলা।

অবাক হয়ে গেল বিকাশ। বিশ্বাস করতে পারছে না। টুকলার মনটা পরিষ্কার ধরা পড়ল বিকাশের কাছে। কিন্তু এ কি অসম্ভব কথা। সে যে······

টুকলা!

মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল টুকলা।

শোন টুকলা! লক্ষ্মীটি!

না না!......

কেঁদেই চলল টুকলা, তোমায় শুনতেই হবে।

মাথা তুলল না টুকলা। বিকাশ জোর করে ওকে ওঠাবার চেষ্টা করল না। আস্তে আস্তে ওর পাশে বসে ওর মাথায় হাত বোলাতে লাগল। টুকলা! ভাই!

প্রায় চীৎকার করে কেঁদে উঠল টুক্‌লা।

না প্লিজ নয়, আমারই ভুল হয়েছে, তোমাকে একথা অনেক আগেই বলা উচিত ছিল। কিন্তু তুমি শুনবে কি? বুঝবে আমার কথা?

এ যেন অন্য বিকাশ, যাকে টুক্‌লা চেনে খেলার সাথী হিসাবে, এ যেন সে নয়।

শোন টুক্‌লা আমি···

একটু থেমে আবার মনের সব জোর এনে বিকাশ বলল—

তুমি জান আমায় শান্তি ভালবাসে!

মাথা নাড়ল টুক্‌লা।

শোন! শান্তি আমায় ভালবাসে। আর···

তা হোক, আমিও তো বাসি। আমার থেকে ও বেশী ভালবাসতে পারে না।

হাসি পেল বিকাশের। এই ছেলেমানুষকে কি বোঝাবে ও?

শোন টুক্‌লা! সত্যি তুমি আমায় খুব ভালবাস, কিন্তু শান্তিও বাসে, তাছাড়া,···তাছাড়া আমিও ওকে ভালবাসি। বুঝলে?

এই নিদারুণ আঘাত দিতে বিকাশের সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু উপায় নেই। টুক্‌লা নাহলে বুঝবে না।

সত্যি টুক্‌লা, আমিও শান্তিকে খুব ভালবাসি।

আস্তে আস্তে ওর চুলের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে বলল বিকাশ।

তবে কেন ?....

এবার তার জলে ভেজা রক্তিম মুখ তুলে ধরল টুক্‌লা বিকাশের সামনে। অপূর্ব দেখাচ্ছে টুক্‌লাকে। কাঁদলে যে মানুষকে এত সুন্দর দেখায় সে কথা বিকাশ জানত না। মুগ্ধ হল সে। ওর দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল।

কি তবে ?

টুক্‌লার চোখের জল অনবরত পড়ছে, কিন্তু বিস্ময়ে টুক্‌লা আর কাঁদতে পারছে না। তবে কেন সেকথা তাকে এতদিন জানায়নি তারা ? কেন সে বুঝতে পারেনি, কেন কেন ? কেন সবাই তাকে প্রবঞ্চনা করেছে ? অনেকগুলো 'কেন' তার মনের মধ্যে ঘুরতে লাগল।

জানি টুক্‌লা তুমি ব্যথা পেয়েছ। কিন্তু খুশীও কি হবে না তোমার বন্ধুর এই কথা শুনে ?

কেমন নির্দয় মনে হোল বিকাশকে তার এখন। যে বিকাশকে তার একটু আগে জগতের মধ্যে মহত্তম, শ্রেষ্ঠতম বলে মনে হয়েছিল, আজ তাকেই এখুনি প্রবঞ্চক বলে মনে হল। শান্তিকেও, তারা তার বন্ধু নয়, তারা তাকে ঠকিয়েছে। যে দেওয়ালে সে পিঠ ঠেকাবে ভেবেছিল সে দেওয়ালই যে নেই।

টুক্‌লা ! আমায় ভুল বুঝো না।

অনেকক্ষণ পরে যেন বলল বিকাশ।

তুমি আমার কত প্রিয়, কত আপন তা জান না। মোর দ্যান্ মাই সিস্টার

চাই না হতে।

না না, সত্যি টুক্‌লা। শান্তিও তোমায় ভালবাসে। তোমার কাছে আমরা একথা বলতামই। শুধু তুমি ছেলেমানুষ···

ছেলেমানুষ!

ভীষণ আহত হল টুকলা। কি খবর রাখে তারা তার মনের!

টুকলা, লক্ষ্মী চল আমাদের বাড়ীতে। আমি চলে যাব রাত নটার ট্রেণে। শান্তি রমা সব ওখানে।

জানি। আমি যাব না!

চল টুকলা, ওরা কত খুশী হবে, আমি তোমায় নিয়ে যাব। যাবে না? আমি তো চলে যাব একটু বাদে।

যেন সব রাগ ভুলে গেল টুকলা। সত্যিই তো বিকাশদা তো চলে যাবে। আর সে যাবে না কেন? কিন্তু...হঠাৎ যেন লজ্জা হল তার বিকাশকে। কি মনে করল, ওকে বিকাশদা। কেন এরকম আবেগ প্রকাশ করে বসল ও। না করলেই পারত। কিন্তু উপায় কি? অনেক কেঁদে বিকাশকে বলে তবে তার বুকের যন্ত্রণা কিছু কমেছে, যতক্ষণ না বলছিল ততক্ষণ যে মরে যাচ্ছিল সে। কিন্তু বিকাশ কি কিছু ভাবল তাকে? নির্লজ্জ?

তুমি কি ভাবলে! আমাকে!

একবার বিকাশের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল টুকলা।

কিছু ভাবিনি। শুধু ভাল লেগেছে তোমার কান্নাভেজা মুখ।

যাও:

সত্যি বলছি।

বিকাশদা!

কি!

শান্তিকেও বল না একথা, তাহলে আমার ভারী লজ্জা করবে।

একটু ভাবল বিকাশ, শান্তিকে না বলা তার পক্ষে সম্ভব হবে কি?

না, বলব না! কিন্তু ও তো তোমার বন্ধু, তোমায় ভালবাসে, ও যদি জানে তাহলে ক্ষতি কি?

—না। ওর কথা আমায় জানিয়েছিল?

হাসি পেল বিকাশের। টুক্‌লা কি বুঝবে, শান্তির কথা যে এত সহজে বলা যায় না, এত সহজে ভোলাও যায় না। টুক্‌লা কি ভুলে যাবে? হঠাৎ কেমন যেন ক্ষতি মনে হল বিকাশের। টুক্‌লার কাছে মহৎ হতে যায়নি সে, শান্তিকে ভালবাসে বলে তার কাছে একনিষ্ঠ থাকবার জন্যই সে নিজেকে একমুহূর্ত বিচলিত হ'তে দেয়নি। কিন্তু টুক্‌লা মুখ চোখ মুছে নিজেকে সামলিয়ে নিয়েছে দেখে হঠাৎ যেন কষ্ট হল নিজের ওপর। তাকে আর কি টুক্‌লার দরকার নেই? পরক্ষণেই হাসি এল। নিজেকে সাময়িকভাবে সামলিয়ে নিয়েছে টুক্‌লা, তা বলে ভালবাসা কমবে কেন? চিরদিন বন্ধু থাকবে তারা।

চলনা টুক্‌লা, আমাদের বাড়ী।

না থাক্। ভাল লাগছে না। তোমার গাড়ী কটায়?

রাত নটায়, বললাম যে!

ওঃ!

চল টুক্‌লা লক্ষ্মীটি। আর দেরী করতে পারব না।

না, আজ যাব না! আমায় একটু একা থাকতে দাও। প্লিজ ....আমায় ভুল না।

দু'হাতের ভেতর মুখ গুঁজল টুক্‌লা।

ওর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে, ওর হাতটা ধরে নাড়া দিয়ে বেরিয়ে গেল বিকাশ।

এক সপ্তাহের ভেতরই এক বিরাট লম্বা চিঠি পেল টুক্‌লা লক্ষ্ণৌ থেকে। বিকাশ লিখেছে। আর সেই সঙ্গেই চিঠি এল দিদির কাছ থেকে। ওরা দিল্লী গেছে। এখন বেড়াচ্ছে ওরা। সুবিনয়দা

ছুটী নিয়েছে। একমাস ওরা বেড়াবে, তারপর ফিরে এসেও থাকবে না কলকাতায়, দরখাস্ত করেছে পাসপোর্টের জন্য, লণ্ডনে চলে যাবে ওরা। এখানে থাকবে না। একথা গর্ব করেই লিখেছে অমিতা। যাকে গ্রহণ করলে সে সুখী হবে মনে করেছে, তাকেই সে জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করেছে, নিজেকে পূর্ণতর করার জন্য। ভুল সে করেনি। আজ সমাজের চোখে ভুল বলে গণ্য হলেও সময়ের কষ্টিপাথরে এটুকু নিশ্চয়ই একদিন যাচাই হয়ে যাবে। তবে মন খারাপ হয়, বাবাকে দুঃখ দিয়েছে বলে আর টুক্‌লাকে একা ছেড়ে এসেছে বলে।

আবার আনন্দ পায় টুক্‌লা। এই তো দিদি তাকে ভোলেনি। তার জন্য অতো সুখেও তার মন খারাপ লাগছে। হবেই তো নিজের বোন, তাকে ভুলবে কি করে? এতো পাতান বন্ধুত্ব নয়।

আগে হলে এ-চিঠি ও শান্তি আর বিকাশকে দেখাতই, এখন আর নয়। নিজের সব দুঃখ উজাড় করে ও সকলকে বলবে না। কি দরকার? সবাই তো ওর কথা জানতে উন্মুখ নয়, ও কেন বলবে যেচে, সেধে।

দিদির চিঠিতে সত্যিই সুখী হয় টুক্‌লা। এই তো জীবন। যদিও বাবাকে এভাবে কষ্ট দিয়ে দিদির এই কাজটাকে পুরোপুরি সমর্থন করে না সে কিন্তু সমাজের জন্য নয়। সমাজ সংসারের কথা সে ভাবে না, তার মাথায়ও আসে না। মামাবাড়ী, পাড়াপড়শি সকলেই তাদের ওপর বিরূপ। কথাটা জানাজানি হবার পর কয়েকজন তো বাড়ী বয়ে এসে বাবাকে কত কথা শুমিয়ে দিয়েই গেছে। কি যেন মহা অন্যায় আর পাপ হয়েছে তাদের পরিবারে, আর সে ব্যাপারে যেন প্রসন্নবাবুর প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় আছে। অথচ বাবার দোষ কি? শুধু এ নিয়ে গোলমাল করে নাটক করেননি। সর্বশক্তি দিয়ে তিনি বাধা দিতে চেয়েছিলেন, যখন পারলেন না তখন আর বাড়াবাড়ি করে দিদির জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতে

চাননি। শুধু চেয়েছেন অমিতা যেভাবেই হোক সুখী থাকুক, ওকে বিরক্ত করে লাভ নেই। টুকলা বোঝে, দিদির প্রতি বাবার কতটা স্নেহ তাও বোঝে। দিদিও কি বোঝে না? তা না হলে বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখবে কেন?

টুকলা সুখী হয়। দিদির সুখে, তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জীবনের কল্পনায় সুখী হয়। দিদি লিখেছে ওরা বিলেতেই থাকবে, সুবিনয় সেখানেই প্র্যাকটিস করবে. বিলেতে নাকি ডাক্তারদের খুব কদর। আর অমিতা পড়বে, দরকার হলে সেখানকার কাউন্টি স্কুলে একটা কাজ নেবে। মোটের উপর অত ভাবে না তারা, জীবনটা সুখে আনন্দে কাটাবে এই তাদের পণ। টুকলাকেও আহ্বান জানিয়েছে সে, তবে বাবাকে কে দেখবে?

দিদির দীর্ঘ চিঠি শেষ করে চুপ করে বসে রইল টুকলা জানলার দিকে তাকিয়ে। রাশি রাশি :সাদা মেঘ উড়ে চলেছে, কোথায় কে জানে। অমনভাবে টুকলাও সংসারে ভেসে থাকতে চায়, নির্মল আনন্দ মন ভরে, কোন দুঃখ বেদনার ভেতর দিয়ে নয়, মুক্ত আনন্দে।

মনে পড়ল বিকাশের চিঠির কথা হঠাৎ যেন কেমন লজ্জা করত লাগল। কি লিখেছে বিকাশ? ও কি প্রতীক্ষা করে ছিল এ চিঠির জন্য? কই এ কদিনে তো খুব বেশীবার মনে করেনি বিকাশের কথা? বিকাশ যাবার আগে কি যন্ত্রণাই পেল সারাদিন। কি সাংঘাতিক কষ্ট পেল সে, খালি কান্না পাচ্ছিল, কান্না আর কান্না। অথচ বিকাশ চলে যাবার পর কই তার তো অত কষ্ট হচ্ছে না? তবে? কি জানি, টুকলা মন থেকে ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে চিঠি নিয়ে খুলে বসল।

অবাক হয়ে গেল চিঠি পড়ে। এসব কি লিখেছে বিকাশ ওকে? ও না শান্তিকে ভালবাসে? হ্যাঁ সেকথাও লিখেছে কিন্তু টুকলার প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করবার সাধ্য না কি ওর নেই! একি?

তবে কি করবে বিকাশ। দুজনকেই ভালবাসবে নাকি? অবাক হল টুকলা। বারবার পড়তে লাগল সেখানটায় বিকাশ লিখেছে—

"তোমার সেই অশ্রুভেজা সুন্দর মুখখানা বারবার মনে পড়ছে টুকলা। এসে অবধি শান্তি পাচ্ছি না। কতবার নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে তবে তোমাকে এ চিঠি লিখছি। তুমি আমায় ভুল বুঝো না। শান্তিকে ভালবাসি এটা ঠিকই কিন্তু তাই বলে,......।

নিজের মনের দূরতম প্রান্ত অবধি তাকিয়ে দেখল টুকলা। কোথায় সেখানে বিকাশের জন্য প্রেম? বিকাশের এ চিঠি প'ড়ে তার যে রীতিমত খারাপ লাগছে। কেন? তার মনের এ অবস্থা কেন? তার মন এ রকম কেন? বুঝে উঠতে পারে না টুকলা। দিদির চিঠি প'ড়ে তার যতটা আনন্দ হয়েছিল, বিকাশের চিঠিতে তার মনোভাব জেনে তার দ্বিগুণ বিতৃষ্ণা যেন সে বোধ করতে লাগল। অথচ এক সপ্তাহ আগে শুধু বিকাশের এই ভালোবাসা টুকুর জন্যই কি সে অধীর হয়ে ওঠেনি? তবে? ভেবে কূল কিনারা পায় না টুকলা। তবে কি বিকাশকে সে ভালবাসেনি? তবে ভালবাসা কাকে বলে? আরও কি বেশী সে? সে কেন তেমনি ভাবে ভালবাসতে পারল না বিকাশকে, যেমন করে আর সবাই ভালবাসে, উপন্যাসের নায়িকারা যে ভাবে ভালবাসে। অমিতা যে ভাবে ভালবাসে সুবিনয়কে? তাহলে তো আজ সে খুসীই হ'ত এ চিঠিতে। তা না হ'য়ে তার মনের এই রকম একটা রিয়্যাক্‌সান হল কেন? সে কাকে ভালবাসে তবে?

কাউকে না? কোন ব্যক্তি বিশেষকে না। সে এই পৃথিবীকে ভালবাসে, সবাইকে, সবকিছু জড়িয়ে। তার মধ্যে দিদি, বাবা, শান্তি, বিকাশ সবাই আছে, আবার সবাই নেই ও। ও জীবনকে ভালবাসে, নিজেকে। স্বার্থপরের মত শুধু নিজেকে? বোধ হয় তাই। তবে এই মুহূর্তে আবার নতুন করে দিদিকে আর বাবাকে।

মনে একটা ধাক্কা লাগল। বিষম ঝট্‌কায় বিকাশের চিন্তা যেন ছিটকে দূরে সরে গেল। শান্তির কথা মনে পড়ে গেল তার। কদিন সে শান্তির খোঁজও নেয়নি। আজ যাবে সে শান্তির কাছে। আজ আর ওরা প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

সত্যিই শান্তির বন্ধু টুক্‌লা। জানতেও পারবে না শান্তি টুক্‌লার ভেতর কত বড় ঝড় বয়ে গেল এই কদিনের ভেতর।

কিন্তু তেমনভাবে যেন পেলনা কাছে শান্তিকে। বিকাশ কি বলেছে ওকে সব কথা? না, বিকাশ তো লিখেছে ও কিছুই বলেনি। ব'লে টুক্‌লার প্রেমকে ও ছোট করতে পারে না। তবে?

বার বার জিজ্ঞেস করেও কোন উত্তর পেল না। হঠাৎ কেঁদে ফেলল শান্তি। অঝোরধারে তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। সে আর পারে না। মাত্র এক সপ্তাহ গেছে বিকাশ, তার কাছে এক যুগ। দুঃসহ এ বিরহ।

বিরহ? এই তবে প্রেম। টুক্‌লা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। এ এক অন্য আস্বাদন। এর কথা টুক্‌লা জানে না।

আস্তে আস্তে নিজের মনটা টুক্‌লার কাছে খুলে ধরল শান্তি। সেই সেদিনের কথা থেকে, যখন রমার নামে বিকাশই চিঠি দিত শান্তিকে টুক্‌লারই মাধ্যমে। তারপর ক্রমে ক্রমে গভীরতর হ'ল ওদের প্রেম। নিজের কথা বলে গেল শান্তি। অপূর্ব অজস্র বৈভবে ভরা ওর দিনগুলোর কথা! প্রাণময় জীবন্ত। কিন্তু টুক্‌লার মনে এ হাওয়া লাগেনি। তার প্রাণসমুদ্রে এ ঢেউ জাগেনি। কি করে জানবে সে? সে তো এমন আত্মসমর্পন ক'রে ভালবাসেনি? তার আত্মকেন্দ্রিক একটানা জীবন, নিরুদ্বেগ আর নিরুচ্ছাসের ভেতর দিয়ে কাটছে। এই ভাল। তার জীবনে দিদি আর বাবা ছাড়া আর কারও স্থান নেই। তাই ভাল। শান্তিকে নতুন ক'রে ভালবাসে ও, সবাইকে, নিজের জীবনকেও।

আবার সমস্ত সংসার হেসে ওঠল টুকলার কাছে। শোকের সাময়িক দুঃখের ছায়ায় তার আকাশ যেন ঢেকে গিয়েছিল, কিন্তু আবার সব কালোছায়া মিলিয়ে সেই অপূর্ব আনন্দময় জীবনের আভাস পেয়েছে সে। সুখ চায় সে, যে সুখে সে আজন্ম লালিত, যা সে ক্ষনিকের জন্য হারিয়েছিল অথচ সেই সুখই তার মনের ভেতর সদা জাগ্রত প্রহরীর মত তাকে পাগল করে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আবার সে সুখকেই খুঁজে পেতে হবে। আনন্দ আর সুখ। মনে পড়ল সেই অপূর্ব গান "আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।" খুব ভাল গাইতে পারে টুক্‌লা এ গানটা। এবার তো কলেজে ওর এই গান দিয়েই উদ্বোধন হ'ল বাৎসরিক প্রতিষ্ঠান দিবসের। আজ, শুধু আজ কেন, মনেপ্রাণে ও অনুভব করে, বিশ্বাস করে "আনন্দধারা বহিছে ভুবনে"। সে আনন্দরসে ও অবগাহন করতে চায় সর্বক্ষণ। মাঝে মাঝে বিরতি আসে, বাধা আসে, যেমন এসেছিল মায়ের মৃত্যুতে, দিদির বিয়েতে তাছাড়া বিকাশকে ভালবেসে। হ্যাঁ ভালবেসেও ও দুঃখ পেয়েছিল। মাত্র দুদিন সে ভোগ করেছিল সে যন্ত্রণা, তারপর আবার যেন কাটা জায়গা জোড়া হয়ে গেছে! সত্যিই কি? মাঝে মাঝে খচ্‌-খচ্‌ করছে নাকি? মনের তল অবধি খুঁজে দেখতে চেষ্টা করল টুক্‌লা।...না, নেই। সে দুঃখবোধ আর নেই, সেই হারানর ব্যথা আর নেই, সবটুকু যেন আনন্দের বন্যায় ভেসে গেছে।

মনের এত পরিবর্তন কেন হয় টুক্‌লা ভেবে পায় না।

প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে বোধ হয় একটা না একটা অবলম্বন থাকে। যখন সুখ-দুঃখের দোলায় তার মন আলোড়িত হয়, সে বেদনা বোধ করে। বিশেষ ক'রে যখন আঘাত পায় তখন সে সেই আশ্রয়টুকুকেই আঁকড়ে ধরে প্রানপণে; তীরে বাঁধা নৌকার মত। ঝড়ের গর্জনে ঢেউয়ের দোলায় সে আঁকড়ে ধরতে চায় তীরকে, আবার ঝড় থেমে গেলে সেই তীর ছেড়ে আবার পাড়ি দেয়। ঘুরে ফিরে ঐটেই তার আশ্রয়। মানুষের মনও বোধ-হয় এমনি কোন তীর চায়, নাহলে হাল ভাঙ্গা নৌকার মত ভেসে বেড়াত! কেউ তাই অবলম্বন করে সাহিত্য, কেউ গান, কেউ আঁকা, কেউ বা পূজো বা অমনি একটা কিছু। সাময়িক আঘাতে টুক্‌লার মন যখন এমনি বিচ্ছিন্ন, আহত ছিল ও তখন গান আর সাহিত্যকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছিল। শত নিঃসঙ্গতার ভেতরও তাকে আশ্রয় দিয়েছিল তার গান, কবিতা আর লেখা।

আবার তার মনে আজ আনন্দের জোয়ার এসেছে, সকলেই মধ্যেই সে আশ্রয় পাচ্ছে। তখনও মনের মধ্যে সুরের সে রেষ, কবিতার সে মাধুর্য্য যেন থামতে চাইল না। শুধু তার প্রকাশ অন্যভাবে পেতে চাইল।

টুক্‌লা ঠিক করল, একটা সমিতি গড়বে। পাড়ার মেয়েরা শুধু নয়, কলেজের বন্ধুদের নিয়েও এই সমিতির কাজ আরম্ভ করার চেষ্টা করল টুকলা। সে গান ভালবাসে, খেলা ভালবাসে, সাহিত্য ভালবাসে, কি ভালবাসেনা; সমিতির মাধ্যমে সব কিছুকেই

সে ছড়াতে পারবে নিজের জীবনে, বন্ধুদের জীবনে। তাছাড়া কিছু ভাল কাজ, সমাজ সেবার কাজও তো করতে পারবে। অন্ততঃ মেয়েদের জন্য, সেই যে সেই সভায় সুভাস বোস বলেছিলেন। তেমনি কিছু কি করা যায়না? চেষ্টা করতে ক্ষতি কি?

কদিন থেকেই সে যাচ্ছে, আরতিদের বাড়ী। আরতিরা পাড়ায় নামকরা ধনী পরিবার। ওর বাবার লোহার ব্যবসা। পার্কের ওপাশে যে বিরাট বাগানওলা বাড়ীটা পাড়ায় সকলেরই সম্ভ্রমের উদ্রেক করে, সেই বাড়ীটাই আরতিদের।

আরতির মাকে সমিতির প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে। তিনি তাঁর বাড়ীর বড় একটী ঘর ছেড়ে দিতে পারেন সমিতির ব্যবহারের জন্য।

প্রথমে রাজি হননি তিনি কিছুতেই। দেখ, সমিতি মানেই তো নানান মেয়েদের ভীড়, আমার পক্ষে তা বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। মাসীমা!

টুকলা আবদার জানায়। আরতি ওর ক্লাসফ্রেণ্ড।

আপনি না করলে কে করবে? বারে; আমার তো বিশ্বাস, আর সকলকে বোলেওছি যে এসব সমাজ সেবা আর নারী প্রগতির কাজে মাসীমা আগে এগিয়ে আসবেনই।

খুসী হলেন আরতির মা। তবু.........

সে তো আমার একটা স্বভাব। কি যে করি, গরীবদের দুঃখ দেখলে স্থির থাকতে পারিনা। তা তোমার এইসব মেয়েরা কেমন পরিবার থেকে আসবেন? দেখ খুব বেশী গরীব হ'লে...

না মাসীমা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরাই সব আসবে।

মানে বুঝেছ তো? খুব গরীব বা নিম্নবিত্ত ঘরের মেয়েরা আবার বড় নোংরা হয় কিনা। তাই আমার বাড়ীতে তারা ঢুকলে মুস্কিল। একটী প্রেষ্টিজ আছে তো আমার!

ভয় নেই মাসীমা, নোংরা লোক ঢুকবে না। কিন্তু নোংরা লোকদের পরিচ্ছন্ন, ভাল করাও তো আমাদের সমিতির কাজ হবে মাসীমা। তাছাড়া গরীব মানেই তো নোংরা নয়।

সে কোর তোমরা, তবে আমাকে প্রেসিডেন্ট হয়ে কি করতে হবে? চাঁদা বেশী দিতে পারবনা বাপু।

বেশী দিতে হবেনা, আপনি যাহয় দেবেন। তাহলে রবিবার বিকেলে প্রথম মিটিং ডাকি?

রবিবার?

কিছু অসুবিধা আছে?

মানে রবিবার তো আমার আবার পার্টি থাকে কিনা।

টুকলা জানে আরতির মা এক ফোঁটাও লেখা পড়া জানেন না। অতি কষ্টে নিজের নাম সই ছাড়া। তবু পার্টিতে যাওয়া চাই? কাদের পার্টি? হাসি পেল তার। তবু মুখে বিনয় করে বলল।

কিন্তু রবিবার ছাড়া অন্যদের সময় হবে কি? তাহলে শনিবার বিকেলে?

শনিবারও তো নেমতন্ন রায়পুরের মেজ তরফের বাড়ী।

তাহলে মাসীমা?

একটু ভাবলেন আরতির মা, মিসেস রায়। তারপর অনেক দয়া করেছেন, অনেক ত্যাগ করেছেন এমনি মুখের ভাব দেখিয়ে বললেন, আচ্ছা শনিবার বিকেলেই কর। ঐ দিন একটু দেরী করেই না হয় নেমতন্ন যাব। তবে বেশীক্ষণ মিটিংএ থাকতে পারবনা। আমার তো অনেক কাজ। তোমাদের একটা সমিতিতে তো বেশী সময় দিতে পারবনা।

সে জানি মাসিমা। অনেক উপকার হ'ল। আপনি নাহলে সমিতি হ'তই না। কাদের বাড়ী এমনি হলঘর পাওয়া যেত।

গর্বিত হাসি হেসে ওর কথা সমর্থন করলেন মিসেস রায়।

শনিবার মিটিং এর কথা প্রচার করতে, ব্যবস্থা করতে, আবার সকলকে যোগাড় করে নিয়ে আসতেই এ কয়টা দিন কেটে গেল টুকলার, খুব ভাল লাগছে। বহুদিন পর ভাল লাগছে কি আনন্দ এ কাজে। সকলে কিছু ভাল ব্যবহার করছে না, যেন এতে টুকলার কিন্তু নিজস্ব উপকার হবে। তবু ভাল লাগছে। ও যে সৃষ্টি করছে একটা সমিতি, পুরো একটা মহিলা সমিতি, আনন্দ লাগবেনা? উৎসাহ পাবেনা? ও নিজের মনের মধ্যে থেকেই উৎসাহ পাচ্ছে, প্রেরণা পাচ্ছে যে যা বলুক, ভাল বা মন্দ কিছু এসে যায়না তার, সে গড়ে তুলবে এই সমিতি।

বিকাল সাড়ে পাঁচটায় মিটিং, ও পাঁচটার আগেই হাজির হল মিসেস রায়দের বাড়ী। আরতি ওকে নিয়ে গেল নির্দিষ্ট ঘরে। কেউই আসেনি এখন। খুব গম্ভীর হয়ে খাতাপত্র গুলো ঠিকঠাক করতে লাগল টুকলা।

সবাই এসে গেলে মিসেস রায়কে খবর দিল টুকলা।

প্রায় আধঘন্টা পরে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন মিসেস রায়। মোটা দেহ নিয়ে মুস্কিলেই পড়ে গেছেন তিনি। ঘরে তীব্র বেগে পাখা চলছে, তাতেও ঘেমে উঠছেন। কি করবেন? এত কাজ ঘরে বাইরে সামলান যায়? নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বড় কাঠের সিন্দুকে রাখা বিরাট বিরাট বাসনপত্র বার করিয়েছেন, কালকের জন্য। তার ওপর আবার এখনি গাড়ী করে বেরোতে হবে নেমতন্ন করতে, নেমতন্ন রাখতেও; তার ওপর আবার এইসব সমাজ সেবার কাজ, মিটিং। তবু তাঁকে সময় দিতে হয়। অপরের উপকারের জন্য তাঁকে এ ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়।

হাতে একটি হাতির দাঁতের হাতপাখা। প্রায়ই নেড়ে নেড়ে হাওয়া দিচ্ছেন নিজেকে। আধপাকা নরম সিল্কের মত চুলে পাতা কেটে

মাথায় উঁচু করে বড়ির মত একটি খোঁপা করেছেন তিনি! গলায় ঘাড়ে পাউডারের প্রচুর প্রলেপ। বড় ক'রে গলা কাটা হাত কাটা ব্লাউজে তাঁর বিরাট দেহ আরও বিশ্রী লাগছে। সাদা থলথলে মাংস যেখান সেখান থেকে ঝুলে পড়েছে। সযত্নে পিন আটা কাপড় মাঝে মাঝে সামলাচ্ছেন তিনি।

ঘরে ঢুকতেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল সবাই। টুক্‌লা টেবিলের কাছে দাঁড়িয়েই ছিল। সুগন্ধে সারা ঘর ভরে গেল। তাঁর কাছে এগিয়ে এল টুক্‌লা।

মাসীমা! আজকের....

তাকে কথা শেষ করতে দিলেন না মিসেস রায়।

দেখছি দাঁড়াও! কার্পেটের ওপর অত ধুলো লাগিও না তুমি! হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাকেই বলছি। তোমার পায়ে অত কাদা কেন? জুতো পরে আসনি?

যাকে উদ্দেশ্য করে বললেন সেই কমলা নামে মেয়েটি সসঙ্কোচে উঠে দাঁড়িয়ে অন্যত্র দাঁড়াবার চেষ্টা করল। ভারী খারাপ লাগল টুক্‌লার।

কমলা তুই পাপোষে পাটা মুছে এসে বস্। ওর পা তো ময়লা নেই মাসীমা। কার্পেটেও ধুলো লাগেনি বেশী।

বেশী কমের কথা নয়।

গম্ভীর হলেন মিসেস রায়।

দামী কার্পেট, তোমাদের সমিতির মেয়েরা নষ্ট করলে তো চলবে না। তারা এর মূল্য কি বোঝে?

ঘন ঘন হাতের পাখা নাড়েন মিসেস রায়।

আচ্ছা বল এবার! কি ব্যাপার তোমাদের?

খুব আহত হ'লেও, দমলনা টুক্‌লা। কাজ আছে। এতগুলি মেয়ে জড় হয়েছে দূর-দূর থেকে, মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্তদের ঘর থেকে, তারা সবাই কিছু করতে চায়, ভাল করে বাঁচতে চায়।

মাসীমা। আজ মিটিংএ আমাদের সমিতির প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলার জন্য রেখেছি। আপনিই সভানেত্রী কিনা।

অত সময় হবে না আমার। ওসব তোমরা নিজেরা কোর। আমার তো একটাই কাজ নয়, দু-চার মিনিটের ভেতর যা হয় দরকারী কিছু আলোচনা করে নাও। আমার সময় নেই এখুনি বেরোতে হবে।

তাহলে আজকের সভায় আগে কর্মকর্তাদের ঠিক ক'রে নেওয়া ভাল। এই যে খানিকটা কাজ এগোন আছে।

নিজের বড়ি খোঁপাটা আর একবার হাত দিয়ে দেখে নিয়ে খাতাটায় চোখ বোলালেন।

একি করেছ ?

কেন! আপনি তো প্রেসিডেণ্ট! আর সম্পাদিকা আপাততঃ আমি।

সে ঠিক আছে। সেজন্য ভাবছি না।

তবে ?

না না একে ভাইস প্রেসিডেণ্ট করা চলবেনা। এ-তো স্কুলের টীচার।

হ্যাঁ খুব ভাল উনি। কত বড় ওয়ার্কার।

না না, তাবলে একটা টীচারকে ভাইসপ্রেসিডেণ্ট? কেন তোমরা মিসেস দত্তকে বলনি ?

উনি তো কখনও কারও সঙ্গে মেশেন না।

দরকার কি মেশবার? নাম থাকলেই হ'ল।

সে কি মাসীমা!

টুক্‌লা হেসে উঠল।

খুব বিরক্ত হ'লেন মিসেস রায়।

হাসবার কি আছে এতে? যে সে এভাবে থাকলে আমার তো থাকা হয় না।

কেন, বাধার কি আছে ?

ওকোন থেকে অমলাদি বললেন। অসহ্য রাগে তাঁর মুখটা থমথমে।

বাধা নেই কোথায় তাই বল! আমার একটা প্রেস্টিজ আছে তো।

তাই জন্যই তো আপনি প্রেসিডেন্ট।

টুক্‌লা এবার বলল।

সবার ওপরেই তো আপনি।

সবাই মানে তো কতগুলো স্কুল টীচার আর যত সব···

বিরক্তিতে কথা শেষ করলেন না তিনি।

কিন্তু আমাদের মহিলা সমিতি তো এই সব সবাইকে নিয়ে মাসিমা। নির্যাতিত যারা অনেক ভারাক্রান্ত দুঃখকষ্টে, তারাই তো থাকবে, আমাদের সমিতির সমাজ কল্যাণ বিধান তো তাদেরই জন্য।···তাছাড়া স্কুলটীচার তো সম্মানীয়া, তাঁরা···

তা হোক। তাহলে এ সমিতিতে আমার থাকার অর্থ কি ?

আপনাকে আমরা চাই, কেননা আপনাদের মত কয়েকজন না থাকলে সমিতি চলে না। বাড়ী পাব কোথায় ? উৎসাহ দেবে কে ? টাকা দেবে কে ?

একটু খুসী হলেন মিসেস রায়, তাঁর টাকা—বাড়ির জন্যই যে শুধু তিনি প্রয়োজনীয় এতে যেন তাঁর লজ্জা করার কিছুই নেই বরং গর্বিত তিনি। তিনি ধনী ব'লেই তো সকলকে তাঁর কাছে আসতে হয়। মিসেস দত্তর তো অত দেমাক, কই তাঁর কাছে তো গেল না। কিন্তু মনের মধ্যে কাঁটা খচখচ্‌ করতে থাকে। মিসেস দত্ত যে সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্ট, তারই প্রেসিডেন্ট হ'লে তবেই না সুখ। কি যে সব করে এরা।

না না ছাখ, আমি ফোনে না হয় বলব ওঁকে, তোমরা মিসেস দত্তর নাম রাখ।

ভালই হবে রাখা যাক না! বেশ বেশী চাঁদা আদায় করা যাবে।

প্রতিমা বলল।

তা কোর।

একগাল হাসলেন মিসেস রায়।

এরকম আরও তুচার জনকে রাখ। তবে তো টাকার ব্যবস্থা হবে। তবে আমার কথা নিশ্চয়ই তোমরা ভেবেছ। আমি এই বিনা ভাড়ায় সব দিচ্ছি। কমপক্ষে এখানেই তো মাসে পঁচিশ টাকা দেওয়া হ'ল তাছাড়া, আলো, পাখা, আসবাব। কি নয়?

অবাক হ'য়ে গেল টুক্‌লা। এরকম ক'রে ভাবছেন নাকি উনি? সব হিসেব করা? অঙ্ক কষা?

তা হ'লেও, আপনি প্রেসিডেন্ট, আপনাকে একটা মোটা চাঁদা দিতে হবে।

আবার অমলাদি বললেন।

ভ্রূ কুঁচকে ওর দিকে তাকালেন মিসেস রায়।

তুমি কে?

তুমি নয়, আপনি বলুন!

তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়।

ঠিকই, কিন্তু সে দাবীতে তো বলছেন না। সেখানেই আপত্তি।

লাল টক্‌টকে হ'য়ে গেল মিসেস রায়ের মুখ।

বেশ! নাহয় আপনিই বললাম। আশ্চর্য!

ধন্যবাদ!

খুব বিব্রত বোধ করছিল টুক্‌লা। অমলাদি ওর স্কুলের জীবনের শিক্ষিকা। অসম্ভব শ্রদ্ধা করে ও অমলাদিকে। তাঁর মত মেয়ে কটা হয়? বিদ্যা-বুদ্ধি, হৃদয়বত্তায়? রুগ্ন স্বামী আর তিনটি ছেলেমেয়ের সমস্ত ভার নিজে নিয়ে হাসিমুখে সংসার চালান তিনি, শিক্ষাদান করে। কত ট্যুইশানি করেন। তবু আয়ের অর্ধেক যায়

পরের উপকারে, দরিদ্রের প্রয়োজনে। তাই সমিতির চিন্তা মাথায় এলেই ও ছুটেছিল অমলাদির কাছে। টুক্‌লাকে ভালবাসেন তিনি, তাই টুক্‌লার এমন কাজে না এসে পারেননি।

একটা কাল মেঘে হঠাৎ যেন আকাশ ছেয়ে গেল। কি যে করা যায়।

উঠে দাঁড়ালেন মিসেস রায়।

আমার আর সময় নেই। তোমরা নামের লিষ্টটা কেটে ঠিক ক'রে আমায় দেখিও, টুক্‌লা একলাই এসো। কাল এসো সকালের দিকে, আচ্ছা বিকেলেই এসো না কেন? এখানেই রাতে খেয়ে যাবে।

এতগুলো লোকের সামনে ওকে বিশেষ করে বলার জন্য বিব্রত হ'ল টুক্‌লা। এইমাত্র অমলাদির সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে ও আরও লজ্জা পেয়েছে।

তার দরকার কি মাসীমা! আমি না হয় পরে আসব। কাল আপনি ব্যস্ত থাককেন।

আচ্ছা! তবে এলে পারতে। আচ্ছা আমি যাই, অনেক সময় নষ্ট হ'ল। মিসেস দত্তর কথা ভুলোনা। ওঁর কাছে যেও। আহা-হা—টেবিলের ওপর অত ভার দিও না। হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি, ওসব দামী টেবিল। এই তো মুস্কিল, এসব তো টাকা দিয়ে হিসেব করা যায় না, এসব ঝামেলা কে পোহায় বলতো?

এসে মেয়েটিকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে দিলেন মিসেস রায়।

সাবধানে চলাফেরা করবে এখানে, বুঝলে সবাই?

শেষ উপদেশ দিয়ে তাঁর সিল্কের সাড়ী খস্‌খস্ করে মোটা দেহ নিয়ে হেল্‌তে দুল্‌তে বেরিয়ে গেলেন মিসেস রায়।

যেন ফেটে পড়লেন অমলাদি।

মানে হয় কোন এর? এসব প্রহসনের অর্থ কি?

বুঝতে পারলনা টুক্‌লা। ও নিজেও খুসী হয়নি আজকের

ব্যাপারে, কিন্তু কি করবে? এঁরা তো এইরকমই সব। ও মামার বাড়ীতে দেখেছে এমন সব জীবদের। অমলাদি কি দেখেননি? তবুও ও অবাক হ'ল। তাঁরও তো মা ছিলেন? তিনিও তো পছন্দ করতেন না লোকের ভিড়। তাইবলে আরতির মার মত? বেচারা আরতি, ওর জন্য কষ্ট হ'ল টুক্‌লার। বেচারা, কি যে মা ওর! অদ্ভুত।

টুক্‌লা!

চমক ভাঙ্গল টুক্‌লার।

শোন! তোমাকে একটি কথা বলি। তুমি ছেলেমানুষ, জগৎ চেন না, তাই তোমার জন্য ভয়। এ সব মানুষকে যত পারবে এ্যাভয়েড করবে, এরা সাংঘাতিক।

কেন? মাসীমা এমনিতে তো খারাপ নন।

এমনিতে জানিনা। আমাদের সমিতির প্রেসিডেন্ট হিসেবে।

তাহলে? বাড়ী কে দেবে?

একটা ঘরের জন্য এইসব লোকের সঙ্গে চলাফেরা, সমিতি গড়া?

বলতে পারলেন না আমি থাকেবনা। কি করবেন তিনি? টুক্‌লা যে তার সমস্ত উৎসাহ আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে এসেছে। শোন টুক্‌লা! আমার একটিই ঘর, না হলে ব্যবস্থা করতাম। তোমার বাবাকে রাজী করিয়ে তোমাদের বাড়ীতে কর। তোমাদের তো ঘরের অভাব নেই।

তা নেই। তবে........

সেই ভাল টুক্‌লাদি, সেই ভাল। বাবাঃ আমার এখানে বড্ড ভয় করে।

যে মেয়েটিকে টেবিল থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন সে ব'লে উঠল।

এখানে একটুও ভাল লাগেনা।

আমারও তো তাই।

টুক্‌লা বলে উঠল।

আচ্ছা বাবাকে বলে দেখি।

এরপর নানা আলোচনার ভেতর দিয়ে ওদের কাজকর্ম স্থির হল। অনুপস্থিত সভানেত্রীকে একটি ধন্যবাদ ও খাতায় লেখা হল। যাবার আগে আরতিকে বলে যাওয়া উচিত।

আরতিকে মিটিং-এর কথা বলনি?

হ্যাঁ ওতো ছিল। ওর মা আসবার পরই চলে গেল। বাইরে কোথায় যাবার কথা ছিল।

সে আবার কি?

অমলাদি বিরক্তি হলেন। অন্যরাও।

ওদের বাড়ীতে মিটিং, ও সমিতির সভ্যা আর এমন জরুরী কাজ সবাইকে ফেলে বাইরে যেতেই হল?

হয়তো সত্যি খুব জরুরী অমলাদি।

টুক্‌লা আরতিকে ভালবাসে। কাকে নয়?

হোক—তা বলে নিজেদের বাড়ীতে মিটিং······অমলাদি এসব পচ্ছন্দ করেন না।

সবাই চলে গেছে। খাতাপত্র গুছিয়ে সব লিখে নিয়ে দারোয়ানকে বলে বাইরে বেরিয়ে এল টুক্‌লা। অন্ধকার হয়ে গেছে। একা ফিরতে হবে। মনে পড়ল এখন একা ফেরার কোন বাধা নেই, বাবা অত দৃষ্টি দেন না। আর মা থাকতে? হঠাৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল টুক্‌লার। মা থাকতে সমস্ত জগতটাই যেন আলদাই ছিল ওর। একেবারে আলাদা। কিন্তু এখনও অন্য রকমে হলেও বেশ। কত কাজ তার, কত দায়িত্ব।

একটা গাড়ী ঢুকছে। হেড্‌লাইটের তীব্র আলোয় চোখ বুজে একপাশে সরে দাঁড়াল টুক্‌লা। গাড়ীটাও পাশে এসে বিরাট শব্দ

করে হঠাৎ থেমে গেল। ব্যাপার কি? ও তো সরে দাঁড়িয়ে রাস্তা দিল।

এই টুক্‌লা! খুব দুঃখিত রে। তোদের মিটিংএ থাকতে পারলাম না।

ঝুঁকে পড়ে আরতি বলল।

এখন যাসনা, চল কিছুক্ষণ গল্প করি।

গাড়ীর দরজা খুলে নেমে পড়ল আরতি।

তুমিও নাম না।

যে সুবেশ সুশ্রী ভদ্রলোক গাড়ী চালাচ্ছিলেন তাকে চিনতে ভুল হলনা টুক্‌লার। অশোক না? সেই সরলাদেবীর বাড়ীতে দেখা? সেই গানের প্রশংসা।

আলাপ করিয়ে দি তোদের! আমার বন্ধু শ্রীমতী পার্বতী চৌধুরী। আমার বিশেষ বন্ধু শ্রীঅশোক রায়।

নমস্কার!

নমস্কার!

দুজনেই অভিবাদন করল।

ভাগ্যিস সময় মত এসে পড়েছি। নাহলে তুই তো চলেই যেতিস। মিটিং এর কথা আর শোনা হ'তনা তোর কাছ থেকে, এত খারাপ লাগছিল, মিটিং না এ্যাটেণ্ড্ করতে পেরে।

লাল সুরকি দেওয়া রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে বলল আরতি।

ওরা এসে বাড়ীর ভেতরের বিরাট ড্রইং রুমটায় বসল। দামী পুরু কাপের্টে মোড়া ঘরটার্ দিকে তাকিয়ে হাসি পেল টুক্‌লার। ওঘরের অল্প দামী কার্পেট নিয়ে যে কাণ্ড করলেন মাসীমা, এঘরের এই কার্পেটে তার জুতো শুদ্ধ পা দেবে কি?

এই টুক্‌লা কি হচ্ছে? যাঃ জুতো পরেই আয়।

ওকে চটী খুলতে দেখে আরতি বলে উঠল।

আমার জুতোটা বড় ময়লা রে।

তাতে কি ? আমাদের ও তো। জুতো আবার পরিষ্কার হবে না কি ?

ওদের চক্‌চকে পালিশ করা জুতোর দিকে তাকাল টুক্‌লা। যাক্‌গে, ও অত ভাবে না। মাসীমার কথা ভেবেই যা। ঐ তো অশোক আরতি সবাই এগিয়ে গেল।

এতক্ষণ অশোক একটা কথাও বলে নি। আরতি সজোরে হেসে উঠল।

কি ব্যাপার অশোক ? হঠাৎ চুপ ক'রে গেলে যে ? ওঃ টুক্‌লার জন্য ? কিন্তু সী ইজ ভেরি মাচ ইনফরম্যাল্। ইউ নো।

কথায় কথায় ইংরেজী বলা আরতির অভ্যাস। বিকাশের কথা মনে পড়ল টুক্‌লার। ও এরকম ইংরেজী বলতো কথায় কথায়। কি কাণ্ডই করল ও যাবার দিনে। মাগো ! অশোকের দিকে তাকাল একবার। ভারী সুন্দর দেখতে ভদ্রলোককে। আগের থেকে আরও ভাল হয়েছেন। উনি কি চিনতে পেরেছেন টুক্‌লাকে ? টুক্‌লা যে পারল ? মানুষ এত সহজে সবাইকে ভুলে যায় না কি ? একটু দ্বিধা করে বলেই ফেলল,

অত ফরম্যালিটিস্ সত্যিই টুক্‌লা মানতে পারে না—আপনাকে কিন্তু আমি চিনি।

আমাকে ?

হ্যাঁ।

দুষ্টু হাসি হাসল টুক্‌লা।

আপনি চেনেন না আমাকে ?

আপনাকে ?

আরও অবাক হল অশোক। তার থেকেও বেশী আরতি।

মনে করতে চেষ্টা করুন তো ?

ভ্রূ কুঁচকে সত্যিই চেষ্টা করতে লাগল অশোক।

বাবা, ঘেমে গেলেন যে ? ইচ্ছে করে মনে করছেন না নাকি ?

সেকি ?

ভীষণ বিব্রত হল অশোক।

তার মানে ?

আরতি বোধহয় চটেছে একটু।

আহা! আপনার মামীমা—সরলাদেবী ?

হ্যাঁ।

সেখানে মনে নেই, আমি গান করলাম। আপনি আমার গানের কত প্রশংসা করলেন, বললেন……

এবার সত্যিই মনে পড়ল অশোকের, কিন্তু আরতির থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে ঢোঁক গিলল একবার।

কি ব্যাপার তোমাদের ? আমাকে কিছু বলনি তো ?

আরতির স্বর গম্ভীর।

বলবার কি ? মা বেঁচে থাকতে একবার ওঁর সঙ্গে একটা পার্টিতে দেখা হয়েছিল।

হ্যাঁ হ্যাঁ উনি খুব সুন্দর রবীন্দ্র সঙ্গীত করেছিলেন,…

টুকুলা সত্যিই ভাল গায়।

আরতি যেন একটু সহজ হয়েছে।

সত্যি টুকুলা তুই অদ্ভুত। কত বছর আগে পার্টিতে দেখা মুহূর্তের জন্য, আর তুই তা মনে ক'রে বসে আছিস, আর তাই নিয়ে এমন বললি যেন মনে হ'ল কত চিনিস অশোক কে।

বারে! মনে রাখবনা ? আমি তো সেই প্রথম অত ভাল আর সুন্দর কথা শুনলাম একজন ভদ্রলোকের কাছ থেকে।

রীতিমত ঘামতে সুরু করল অশোক। ভদ্রমহিলা তো জ্বালালেন দেখছি। আরতি যে কি ভাবছে।

থ্যাঙ্কস, আমার প্রশংসা করবার জন্য কৃতজ্ঞ।

কথাটা চাপা দেবার হাসি হাসল অশোক।

কিন্তু ভাল আর সুন্দর কথাটা কি ? জানতে পারি ?

আরতি মুখ আবার গম্ভীর ক'রে বলল। এবার জোরে হেসে উঠল টুকলা।

শোন। উনি বলেছিলেন আমি নাকি আমার গানে সবাইয়ের মনে 'নবীন মেঘের সুর' লাগিয়ে দিয়েছিলাম। ঐ গানটাই গেয়েছিলাম কি না।

ও:

মুখ গম্ভীর করল আরতি।

তুমি বুঝি গান খুব ভালবাস? জানতাম না তো? কখনও তো আমায় রিকোয়েষ্ট করনি!

আরতি অশোকের দিকে তার ঘন বড় বড় পাতাওলা কালো চোখ তুলে ধরল।

অস্বস্তি বোধ করছিল অশোক। প্রথমেই চিনতে পারলে হোত। এত গোলমালে পড়তে হ'ত না। কবে এঁর গানেরও প্রশংসা করেছে তাঁকে চিনতে পারল না, একথা আরতিকে বিশ্বাস করান যাবে কি?

আপনার তো স্মরণ শক্তি খুব বেশী? কবে কি কথা বলেছিলাম তাও মনে আছে? আমার নিজেরই তো মনে নেই।

ওর মনে নেই? এত সহজে ভুলে যায় এরা? কথাগুলো সত্যি সত্যি মন থেকে বলেনি? ভুলে গেল বলবার পরই? অথচ ও তো অশোকের এই কথা মনে করে কতবার হঠাৎ খুসী হ'য়ে উঠেছে। কতদিন অশোককে মনে করেছে শুধু এই কথাগুলো সে উচ্চারণ করেছিল বলে। আশ্চর্য, আশ্চর্য, এরা সব কেমন মানুষ? সে তো ভোলেনি কিছু, তা না হ'লে আজ চিনতে পারল কি ক'রে? কতদিন আশা করেছে অশোক আসবে, তাকে গান গাইবার জন্য পেড়াপিড়ি করবে, কি কি গান করবে তাও সে ঠিক করে রেখেছিল কতবার। ভাগ্যিস মনে মনে, কাউকে বলেনি। যদিও বন্ধুরা ঐ সন্ধ্যার কথা জেনে কতবার ওকে ক্ষেপিয়েছে। তবু

ভাগ্যিস ও কাউকে বলেনি ? তাই বুঝি মা আর দিদি কোনদিন এ নিয়ে আর ভাবেনি। ওরা বুঝি জানত লোকেরা এই সব কথা এমনি এমনি ব'লে আর তারপর ভুলে যায় ? যাক্‌গে, ওসব চিন্তা। কিন্তু হঠাৎ যেন টুক্‌লার মনে একটা বিষাদের ছায়া এল। কি জন্য ? অশোক বলেছে ব'লে ? না ? মনের কোন অবধি খুঁজে দেখল তা নয়, এমনি ? কোন কারণে ? এমনি। লোকেরা এমন সব ভাল ভাল মুহূর্ত ভুলে যায় কেন ?

কেমন যেন সুর ছিঁড়ে গেল। তাই টুক্‌লাই আবার জোড়া দিতে বসল। আস্তে আস্তে মিটিং এর কথা, একথা সেকথা বলতে বলতে কখন এক ঘণ্টা কেটে গেছে আর মাঝে মাঝে ওদের উঁচু গলার হাসিতে সারা ঘরটাই যেন চেহারা বদলে ফেলেছে। অবশেষে বিদায় নেবার সময় আরতির কাছে কথা দিতে হল কাল ও আসবে।

বাঃ মাসীমাকে বললাম, আসব না। উনি অত ক'রে বললেন।

তাতে কি ? এখন আমার কথায় আসবি ? আমি তোর বন্ধু না ?

নিশ্চয়।

খুব জোর দিয়ে বলল টুক্‌লা। ওর মনের সব মেঘ কেটে গেছে।

আচ্ছা তাহলে কাল আসব।

তাড়াতাড়ি। দুপুরে খাওয়া, বারটায়।

অবাক হল টুক্‌লা রাতে নয় ? তবু বলল···

বারটার আগেই আসব।

ঠিক ?

ঠিক।

ধন্যবাদ !

হঠাৎ অশোক বলল !

চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

পাগল ?

হেসে উঠল টুকলা।

পার্কের ওপাশেই আমাদের বাড়ী। গাড়ী ক'রে যাব কি?

তাতে কি? বাঃ রাত হয়ে গেছে না?

কি ভাবল আরতি, তারপর হঠাৎ উৎসাহ দেখিয়ে বলল

চল, দুজনেই যাই ওকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।

আর আপত্তি করল না টুকলা। বাড়াবাড়ি করা ওর স্বভাবেই নেই। সামনের সিটেই তিনজনে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল।

কিন্তু পরদিন যাওয়া হ'লনা ওর। সকালবেলা অমলাদি খবর পাঠালেন ওর সঙ্গে জরুরী দরকার, যেন দেখা করে টুক্‌লা ওঁর সঙ্গে, এখনই।

বাবার অফিস যাওয়া না হ'লে যায় কি ক'রে ও? কলেজে আজ ছুটি কি একটা পর্ব উপলক্ষ্যে। কিন্তু বাবা না বেরোন পর্যন্ত তার কোথাও যাওয়া মুস্কিল। দেখাশোনাও তো করতে হবে?

বেলা এগারটার পর ও যখন অমলাদির বাড়ী পৌঁছুল তখন সেখানে তাদের স্কুলের অনেক টীচার জমা হয়েছেন।

ব্যাপার কি? সুমনাদি, ছায়াদি, সুধাদি সবাই যে এখানে? তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন অমলাদি?

অমলাদির বসার আর শোয়ার মেশান ছোট ঘরেই সকলেই বসেছেন কোনরকমে চেয়ারে, তক্তাপোষে। অমলাদি তার রোগা ছোটছেলের পাশে বসে ওদের বোঝাচ্ছিলেন। টুক্‌লা ঢুকতেই হেসে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন অমলাদি।

এস টুক্‌লা। তোমায় খুব দরকার। তোমায় নাহ'লে কি কাজ হয়?

ভারী লজ্জা পেল টুক্‌লা। অন্য সব টিচাররা কি ভাবছেন! অমলাদি না হয় স্নেহ করেন। তাই বলে কোন মানে হয় একথার?

সলজ্জভাবে বসল টুক্‌লা তক্তাপোষের একপাশে।

শোন টুক্‌লা। কালই তো আরতিদের বাড়ী আমাদের

সমিতির মিটিং হ'ল, ভাবতে পারিনি আজই—সেটা এত তাড়াতাড়ি কাজে লাগবে।

মানে ?

টুক্‌লা অবাক হ'ল।

তুমি জানতো, আরতির বাবা স্কুলের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট। কাল সন্ধ্যায় যখন আমরা ওঁদের বাড়ীতে মিটিং করছিলাম সেই সময়ই স্কুলে এক জরুরী মিটিং ডেকে আরতির বাবা আমাদের স্নেহ আর সুধাকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত করেছেন। যদিও ওরা লিখিতভাবে নোটীশ পায়নি, তবু কালকের মিটিং-এ টীচার'স রিপ্রেসেন্‌টেটিভ সুমনা ছিল, ওই খবর এনেছে কাল রাতেই।

একবার সুধাদির দিকে তাকাল টুক্‌লা।

স্নেহদি আসেননি ?

স্নেহের জ্বর, বেচারা খুব ভুগছে, এই অবস্থায়, তাইতো আমি প্রতিবাদ জানালাম কাল। কিন্তু শুনবে কে ? হেড্‌ মিস্ট্রেস বলতে পারতেন, তা তিনি তো সারাক্ষণ বোবা-কালার মত বসে রইলেন।

সুমনাদি বললেন।

এখনও বুঝতে পারছেনা টুক্‌লা এসব কথা তাকে বলা কেন ? সে কি করবে ?

শোন সুমনা !

সজোরে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন অমলাদি।

এসব একার প্রতিবাদে কোন ফল হবে না।

তাহলে ?

সেইজন্যই তো টুক্‌লাকে ডেকেছি। নোটীশ কবে পাঠাবে ওরা ? জিজ্ঞেস করলেন সুমনাদিকে অমলাদি।

আজই। ওদের তাড়া খুব, একমাসের নোটীশ তো। যত তাড়াতাড়ি পারে। তাছাড়া পুজোর ছুটির মাইনেটায় ফাঁকি দিতে চায়তো, অতএব আর দেরী নয়।

ঠিক আছে। আমরাও দেরী করবো না।

শোন টুক্‌লা! কাল যেসব মেয়েদের জড় করেছিলে আজ তাদের জড় করতে পারবে? জান সুমনা! টুক্‌লা বেশ ভাল অর্গ্যানাইজার।

বার বার প্রশংসা করেন কেন অমলাদি? লজ্জা লাগেনা টুক্‌লার? ও তো এমনিতেই অমলাদি বা অন্যদের জন্য কোন কাজ করতে পারলে ধন্য হয়। কিন্তু এত অল্প সময়ে? তাছাড়া বারটার ভেতর তো আরতিদের বাড়ী যাবার কথা।

শোন এখন প্রায় দশটা বাজে। বিকেল চারটের ভেতর তুমি মেয়েদের খবর দাও, যে কজন পার আর এদিকে আমরা টীচারদের যোগাড় করছি। সকলে মিলে একটা বিরাট দল ক'রে যেতে হবে।

কোথায়?

টুক্‌লা অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করল।

বাঃ কোথায় আবার? প্রেসিডেন্টের বাড়ী!

সেকি?

লাল হ'য়ে যায় টুক্‌লা চিন্তামাত্রই, আজ সেখানে যাবে? দল বেঁধে? বিপক্ষে কথা বলবার জন্য? আরতিদের বাড়ী? সহস্র জিজ্ঞাসা তার মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল।

কেন? প্রেসিডেন্ট অন্যায় করেছেন ইচ্ছে ক'রে, তাঁকে ধরবো না?

নিশ্চয়ই! তিনিই তো আসল কাল্‌প্রিট্‌।

জোর দিয়ে সুমনাদি বললেন।

আরতির বাবাকে মনে করতে চেষ্টা করল টুক্‌লা। কই কালপ্রিট্‌ ব'লে তো মনে হয় না। বরং ওঁর জন্য কষ্টই হয় টুক্‌লার। রাতদিন খাটেন তিনি, ভোর থেকে কত রাত অবধি। আরতিও তো বলেছে বাবার খাটুনির কথা। বরং ওর মাকে ভাল লাগেনা

টুক্‌লার। কেমন যেন হৃদয়হীনার মত। কিন্তু আরতির বাবাকে দেখলে তো ভালই মনে হয় ভদ্রলোককে, বরং সব শুনে কেমন যেন মায়া হয় তার ওপর। হাজার হোক বাবা তো, বুড়ো মানুষ তার ওপরে। কিন্তু তাঁকেই তো সকলে খারাপ বলছে।

খুব ঘুঘু লোক! ডুবে ডুবে জল খায়।

অমলাদিও বলছেন? তাহলে তো নিশ্চয়ই তাই। হয়তো চেনেনা টুক্‌লা। সত্যিই তো চেনেনা টুক্‌লা। কি জানে তাঁর?

কতটুকু বোঝা যায়? ঐ ভাল মানুষি মাখান মুখ! মিছরির ছুরি!

শুধু তাই? জানতো আসল রোগ?

কি রোগ? টুক্‌লা বুঝতে পারে না।

হেসে উঠলেন ছায়াদি।

সত্যি মেয়েদের কাজ করা যে কত ঝকমারি।

কেন ঝকমারি কেন? তার তো কাজ করতে ভালই লাগে।

আরে! জান সুধা আর স্নেহের তো ঐখানেই মুস্কিল হয়েছে। ভদ্রলোকের আলু দোষ। ওদের বয়স কম, তার ওপর ওরা ওঁর কথা শুনল না। ত্র্যহস্পর্শ যোগ বলতে পার।

অমলাদি লজ্জা পেলেন।

থাক্‌ থাক্‌ ওসব কথা না বলাই ভাল। কথা চাপা দিতে চেষ্টা করলেন তিনি।

সকলেই জানে ওঁকে, কি আর করা যায়?

সুতরাং নিজেদেরই শক্ত হ'তে হয়। তবে কি জান এসব লোকেদের একবার লোকের সামনে একস্‌পোজ্‌ করতে হয়। বেহায়া মা বোন মানেনা এরা, অথচ সমাজের মাথায় উঠে বসেছে। নিজেদের মেয়েও তো আছে! অথচ স্নেহর বয়সইবা কত। ওঁর মেয়ের মত না?

খুব রেগে গেছেন সুমনাদি। তাঁর নাকের ডগাটা পর্য্যন্ত লাল হ'য়ে গেছে।

আশ্চর্য, কতকাল আর এসব সহ্য করতে হবে তাই ভাবি।

অমলাদি ছেলেকে হরলিক্‌স্‌ খাওয়াতে খাওয়াতে বল্লেন।

যাহোক টুক্‌লা, আমরা এদিক দেখছি, তুমি তোমার সমিতির প্রথম কাজ আরম্ভ করতো!

কি বলুন!

টুক্‌লার চোখের বিস্ময়ঘোর এখনও কাটেনি। এসব কি কথাবার্তা? একজনের বাবা সম্পর্কে? কি করেছেন তিনি; এত খারাপ লোক আরতির বাবা? কোনদিন তো মনে হয়নি?

শোন টুক্‌লা! তোমাদের, অর্থাৎ আমরা যে সমিতি করছি তার লক্ষ্য, আর যাই থাক, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান যে অন্যতম, তা বোধহয় জান।

এতটা টুক্‌লা ভেবে দেখেনি। তবে এক্ষুনি মনে হ'ল, তাই ঠিক আর তাছাড়া এঁদের কথা শুনে ধন্য হবে সে একটা কিছু করতে পারলে। এত মান্যগণ্য বিদ্বান দিদিমনিরা তার সাহায্য চান। একটী কিছু মহৎ কাজ করে সে তার যোগ্যতা প্রমাণ করবে। টুক্‌লাও পারে বড় কাজ করতে। কোন উত্তর না দিয়ে ঘাড় নাড়ল সে।

কিন্তু, শুধু লক্ষ্য থাকলেই হবেনা, চিন্তা বা পরিকল্পনা থাকলেই হবেনা······

অমলাদি ব'লে চললেন···

তাকে রূপ দিতে হবে, অর্থাৎ সত্যিকারের কাজ করতে হবে। মাঠে নামতে হবে, কেবল আদর্শবাদ নিয়ে বসে থাকলে চলবেনা।

কি করবে টুক্‌লা? কি তার আদর্শবাদ? কোন দিন তো ভাবেনি সে কথা টুক্‌লা! তবে কি তাই? সেই সুভাস চন্দ্রের বক্তৃতায় তার যে কথা মনে হয়েছিল? সেরকম একটী কিছু করতে হবে? সব ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে? কি জন্য? কি নিয়ে ঝাঁপাবে? আদর্শবাদ? প্রায় ঘামতে লাগল টুক্‌লা।

শোন! তুমি ছেলেমানুষ কিন্তু তোমার ক্ষমতা অনেক।

হ্যাঁ অনেক ক্ষমতা টুকলার। সে ছেলেমানুষ নয়, অনেক কিছু সে করতে পারে, তার আদর্শ আছে। কিছু একটা; বিরাট একটা কিছু করা, যাতে……যা আর কেউ করেনি।

ক্ষমতা আছে কি না জানিনা, কিন্তু আমি প্রাণ পণে আপনাদের সাহায্য করবো।

বাঃ এই তো চাই। আমি জানি, টুক্‌লা কাজের মেয়ে। তোমাদের বলেছি না।

অমলাদির মুখ প্রসন্নতায় ভ'রে গেছে।
আজ চারটের সময়, তোমার মেয়েদের যত জনকে পার নিয়ে আসবে আমার বাড়ীতে, এখান থেকেই মিছিল ক'রে যাব। ওঁকে অপমান করতে হবে? বুঝলে?

অপমান? আরতির বাবাকে ওদেরই বাড়ীর সামনে গিয়ে? আজই? কিন্তু—
কোন দ্বিধা নয় টুক্‌লা। আমরা মাত্র পাঁচ ছয় জন শিক্ষিকা একটী মিছিল করতে পারিনা। আরও মেয়ে চাই। জনমতের প্রাধান্যে উনি ভয় পেয়ে যান।

টুক্‌লার দ্বিধা দেখে অমলাদি জোর গলায় বললেন।

ওঁকে অন্য উপায়ে ভয় পাওয়ান যায়না?

টুক্‌লার সরল ছেলেমানুষি প্রশ্নে সুমনাদি হেসে উঠলেন, অন্যরাও।

হেসোনা সুমনা! ও কি জানে এসবের, তাই বলছে। শোন টুক্‌লা! এসব সমাজের শত্রু, এরা নির্লজ্জ, স্বার্থপর, দুকান কাটা। একমাত্র বাইরের লোকের কাছে যে শ্রদ্ধা ভক্তি তাদের প্রাপ্য নয় সেটুকুর জন্য এরা কাতর। কেননা মনে মনে এরা নিজেদের চেনে, জানে তাদের স্বরূপ।

তাই তো বলছি, চিঠি দিয়ে বা হুম্‌কি দিয়ে ভয় দেখান যায়না।

দুর্বল কখনও সবলকে হুমকি দিতে পারেনা সোজাসুজি।

আমরা অন্তরে দুর্বল না হ'লেও, সমাজের মাপকাটিতে তো কোন শক্তিই নেই আমাদের হাতে, তাই কৌশল করতে হবে। আর যেখানে দুর্বলতা সেখানেই তাকে আঘাত করতে হবে।

আর মিঃ রায়ের আসল দুর্বলতাও আমরা ফাঁস করবো, ছাড়বনা।

অতটা না করলেও চলবে। পাড়ায় এত মেয়ে গিয়ে ওঁর বিরুদ্ধে চেঁচামিচি করলে ওঁর মুখ দেখাবার উপায় থাকবেনা। আবার ঘটা করে দুর্গাপূজো করা হয়। এবার বুঝবেন।

আজও তো ওদের বাড়ী কি পূজো না? মাসীমার কি ব্রত উদ্‌যাপন। ওখানে আজই যেতে হবে। এত বড় কাজে তার ডাক পড়েছে, সে সাড়া না দিয়ে পারবে কি করে!

আচ্ছা অমলাদি, আমি খেয়েই বেরোব। মনে হয় অন্ততঃ ত্রিশ চল্লিশজন মেয়ে যোগাড় করতে পারবো। কিন্তু তারা কি করবে? এসব তো জানেনা কিছু।

তাদের কিছু জানতে হবেনা। মাঝে মাঝে স্লোগান দিলেই চলবে। তাও আমি ব'লে দেব। তুমি ভেবনা, এভাবেই কর্মী তৈরী হয়। ঠিক চারটের আগেই এস। দেরী ক'রনা। যত পার মেয়ে যোগাড় কর। সময়টা মনে রেখ।

সারাদিন রোদে ঘুরে ঘুরে মেয়েদেব যোগাড় করল টুক্‌লা। আশানুরূপ হ'লনা। অনেকেই নানা ওজর দেখিয়ে এলনা; অনেকের সোজাসুজি প্রশ্নের জবাব টুক্‌লা ঠিকমত দিতে পারলনা। ও নিজেই জানেনা কেন এই দুপুর রোদ্দুরে সকলে ওর সঙ্গে যাবে, তার আগের ইস্কুলের দুজন টীচার বরখাস্ত হয়েছেন বলে? কিন্তু ও তো জানে এ শুধু সে জন্য নয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। পরস্পরকে বিপদের সময় সাহায্য করা। তাই তো অমলাদি বললেন।

তবু ওকে ভালবাসে ব'লে কেউ কেউ, ও নিজে এসেছে বলে কেউ, আবার কেউ সত্যিই কারণটুকুর জন্যই এল। প্রায় কুড়িজন মেয়ে নিয়ে উপস্থিত হ'ল টুক্‌লা অমলাদির বাড়ী।

এই যে সব এসে গেছে! নাও ধর এই ব্যানারটা হাতে। টুক্‌লা তুমি আর ছন্দা দুজনে মিলে এই লেখা কাপড়টা নাও। তোমরা থাকবে সকলের আগে। সুধা ঠিক সেণ্টারে। তার পর দুজন করে মেয়েরা।

অমলাদির নির্দেশ মত দাঁড়াল সবাই। আশে পাশের বাড়ী ভেঙ্গে পড়ে দেখছে সবাই।

যেন বাঁদর নাচ খেলা হচ্ছে। হাসি পেল টুকলার। ঠিক ডুগ্‌ডুগির শব্দ শুনলে এমনি সবাই ভেঙ্গে পড়ে, বারান্দায়, জানালায়। কিন্তু কত বড় একটা মহৎ কাজের প্রস্তুতি এ তারা জানে না।

আরতিদের বাড়ীর দিকে এগোল তারা,

শোন! মেয়েরা।

অমলাদি চেঁচিয়ে উঠলেন।

"আমি যা বলবো, স্লোগান দেব, সেটাই রিপিট করবে তোমরা বুঝলে? আর কথার সঙ্গে এমনি ভাবে হাত ছুঁড়বে।

নিজের শীর্ণ হাত ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে দিয়ে ভঙ্গীটা দেখিয়ে দিলেন তিনি।

মিছিল এগিয়ে চলল। সারা পাড়া মেয়েদের গলার সমবেত সরু তীক্ষ্ণ চীৎকারে সচকিত হ'য়ে উঠল।

"চল্‌বেনা চল্‌বেনা—

মেয়েরা এগিয়ে চলল। আর টুক্‌লার সমস্ত উৎসাহ যেন কোথায় চলে গেল। কত সহজ ভেবেছিল সে এই মিছিল ক'রে যাওয়া, তাই যখন তাকেই ব্যান্যার নিয়ে সামনে দাঁড়াতে বললেন অমলাদি, সাগ্রহে এগিয়ে এসেছিল সে। কিন্তু রাস্তায় নেমে স্লোগান দিতে গিয়ে বুঝল, এত সহজ নয়, হঠাৎ মনে হ'ল রাস্তায়

সব লোক শুধু তাকেই দেখছে, কি ভাবছে ওকে? বস্তির মেয়েদের মত লাইন করে রাস্তা দিয়ে দয়া চাইতে যাচ্ছে? অমলাদি বলছেন দয়া নয় দাবী। কিন্তু টুক্‌লা তা অনুভব করছেনা কেন? নিজের জন্যও নয়। তার দিদিমনিদের জন্য যে দয়া সে চাইতে যাচ্ছে, অমলাদির ভাষায় যে দাবী সে জানাতে যাচ্ছে, তাতে মনের থেকে জোর পাচ্ছে না কেন? কিন্তু এগোতেই হবে, এখন থামতে পারবেনা।

এগিয়ে চলল ওরা। কিন্তু টুক্‌লার মুখে সে দীপ্তি নেই। সমস্ত রক্ত যেন কে শুষে নিয়েছে। আগে মনে হয়নি, এখন বাবার কথা, পাড়ার লোক, আরতিদের বাড়ী, সব কথা মনে হ'ল, গলা শুকিয়ে এল টুক্‌লার। কি করবে সে? ফিরতেও পারবেনা।

শরতের স্নিগ্ধ দুপুরেও রীতিমত ঘামতে লাগল সে।

তারা এসে গেছে। বিরাট ফটকের সামনে দারোয়ান কতজন চাকর বাকর মিলে গুলতানি করছিল। স্তব্ধ হ'য়ে গেছে তারা সবাই। ব্যাপার কি? এত মাইজী লোক তাদের বাড়ী এভাবে আসছে কেন? উপস্থিত বুদ্ধিতে গেটটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করল দরোয়ান।

আরতি এসে দাঁড়িয়েছে না? টুক্‌লা চোখ তুলে তাকাতে সাহস পেলনা। ওকে আজ আসতে বলেছিল আরতি, অশোকও। বার বার করে। কিন্তু এ ভাবে? ওরা তো ভাবতেও পারেনি। ওকি নিজে ভেবেছিল? ও কি জানত? কিন্তু কাকে বলবে এ কথা? তার গলা আটকে গেল। হাজার কালপ্রিট্ হন, তবু আরতির বাবা তো, তাঁকে এ ভাবে অপমান করার জন্য টুক্‌লা যেন প্রস্তুত ছিলনা। শুধু অন্যায়ের বিরুদ্ধে........

ক্রমশঃ চীৎকার বাড়তে লাগল।

আরতিদের বাড়ীর সামনে অনেক গাড়ী দাঁড়িয়ে। রাস্তার ও পাশের ডাষ্টবিন্ এঁটো পাতা আর ভাঁড়ে উপছে গেছে। মঙ্গল

কলস দেওয়া, আমপাতা ঝোলান গেটে সদম্ভে দরোয়ান দাঁড়িয়ে।

অনেক লোক দাঁড়িয়ে গেছে। 'মজা দেখতে নাকি? ছোট ছেলেরা শ্লোগানের সঙ্গে গলা মেলাছে।

টুক্‌লা কিছু যেন দেখছে না। কাঠের মত দাঁড়িয়ে আছে ব্যানারের একটি লাঠি হাতে নিয়ে। মাঝে মাঝে শ্লোগান দিতে চাইছে, পারছেনা। তার গলা দিয়ে কোন স্বর বেরোচ্ছে না। ঘামে সর্বত্র ভিজে যাচ্ছে তার। এল কেন ও তাহলে? এত দুর্বল? কিসের ভয়! কিসের লজ্জা আরতিদের কাছে? যারা অন্যায় করেছে! কিন্তু সত্যি কতটা অন্যায় করেছে, টুক্‌লা তার কতটুকু জানে? আরতির বাবাকে কেন ও অপমান করবার জন্য এগিয়ে এসেছে? কি করেছেন উনি ওর? আরতির চোখে একটি নীরব ধিক্কার ছিল না কি? অশোকবাবু ও এসেছেন নিশ্চয়ই, শুনেছেন টুক্‌লা এমনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে চীৎকার করছে। ছিঃ। কিন্তু ছিঃ কেন? তাতে কি হয়েছে? অশোকবাবু তো জানেন না, আরতির বাবা কি রকম কালপ্রিট্‌। কিন্তু টুক্‌লা নিজে জানে কি? ও তো শুনেছে কেবল।

পরিষ্কার বুঝতে পারছে টুক্‌লা তার শিরদাঁড়া বেয়ে গরম একটি স্রোত তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে, কান দুটো অসহ্য গরম হয়ে গেছে।

সামনে দরোয়ানের সঙ্গে চীৎকার ক'রে বচসা করছেন সুমনাদি। ওপর নীচের সব জানলা দরজা পটাপট বন্ধ করে দিচ্ছে আরতিরা। দুজন ভদ্রলোক বাড়ীর বাইরে চলে এলেন। মিছিলের দিকে দৃক্‌পাত না করে নিজেদের গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়ে চলে গেলেন তাঁরা, দামী সেণ্টের গন্ধ ছড়িয়ে। একজন ভদ্রমহিলা বের হ'তে গিয়ে আবার ঢুকে গেলেন। গাড়ী বারান্দার তলার বড় দরজা বন্ধ হ'য়ে গেল। চীৎকার থামল না। বরং প্রেসিডেন্ট-কে বাইরে বেরিয়ে

আসবার জন্য চীৎকার করে দাবী জানাতে লাগল সবাই। দল এ.
বেড়ে গেল কি করে? এত লোক সবাই চেঁচাচ্ছে কেন! এরাও
জানত? কোন দলে এরা? টুকুলার দলে? টুকুলা কোন দলে?
এই রাস্তার ধারে যাঁরা চেঁচাচ্ছে, নানা কটু ভাষায় আরতির বাবাকে
গালাগাল দিচ্ছে তাদের দলে? কই সুমনাদি, অমলাদিরা তো
আর চেঁচাচ্ছেন না। এখন অন্য লোক, আরও অনেক অনেক
লোক সকলে চেঁচাচ্ছে কেন? আরতির বাবাকে শুধু অপমান
করবে ব'লে? আরতির বাবাকে? তার নিজের বাবাকে?
বুঝতে পারছে না টুকুলা। সব গুলিয়ে যাচ্ছে। আর দাঁড়িয়ে
থাকতে পারছেনা। বড় ক্লান্ত সে।

"ক্লান্তি আমায় ক্ষমা কর। ক্ষমা কর।" সকলে টুকুলাকে
ক্ষমা করুক। আর পারেনা সে, হঠাৎ টুকুলার দেহটা মাটির
পুতুলের মত ঢলে পড়ল।

সেদিনের ঘটনার পর আরও কতদিন টুক্‌লা বাইরে বের হয়নি। কোথাও যায়নি। খালি বাড়ীতে থেকেছে, কলেজেও যেতে পারেনি, প্রথম ক'দিন। তারপর থেকে কলেজে যাচ্ছে, কিন্তু ব্যস্ ঐ পর্য্যন্ত। আর কোথাও যেতে পারেনি সে। মধ্যে খালি গান আর কবিতা নিয়ে থেকেছে। অন্য হাওয়া চায় সে, স্নিগ্ধ মধুর হাওয়া, সে বাঁচতে চায় নির্জনতার মাঝখানে, স্নিগ্ধতার মাঝখানে, সেখানেই, যেখানে হট্টগোল নেই, চেঁচামিচি নেই, কাউকে ভয় বা লজ্জা করবার নেই। আপন গৃহকোণ আর রবীন্দ্রনাথের বই। মনের গ্লানি আর আত্মধিক্কারের হাত থেকে বাঁচতে চায় সে।

পূজোর দীর্ঘ ছুটীর পর সেদিন কলেজে গিয়ে জানল, ওদের কলেজ থেকে 'শান্তিনিকেতন' যাবে একটি দল, ভাইস্ প্রিন্সিপল্ মিস দাসগুপ্তার সঙ্গে। মাত্র কুড়িজনকে নেওয়া হবে আর প্রফেসরদের ভেতর থেকে যাবেন ইলাদি, অরুন্ধতীদি, নৃপেনবাবু আর অবনীবাবু। লাফিয়ে উঠ্‌ল টুক্‌লা। ঈশ্বর অকৃপণ নন।

দুর্বিষহ হ'য়ে উঠেছে তার জীবন, সঙ্গী অভাবে, কাজ অভাবে। তার ওপর প্রসন্নবাবুর বিরক্তিতে। সব শুনেছেন প্রসন্নবাবু সেদিনের কথা। জ্ঞানহীন টুক্‌লার দেহকে যে অশোকবাবুই গাড়ী ক'রে পৌঁছে দিয়েছেন সে কথাও তাকে বাবাই বলেছেন। ডাক্তারও আনিয়েছেন অশোকবাবু। অফিসে ফোন করা, ব্যবস্থা করা সব।

টুক্লাও সব অনুভব করেছে, শুধু লজ্জায় চোখ খোলেনি। কি বিশ্রী একটা সীন্ করল সে। কি করতে গিয়ে কি করল। অমলাদিরা কি ভাবলেন। আর সকলে? সকলে পরিহাস করবে পরে। করুক কিন্তু সে কেন জ্ঞান ফিরে পেল। ঐ কাণ্ডের পর? অশোকবাবু তো তাকে আরও লজ্জায় ফেলেছিলেন। কি দরকার ছিল তাঁর বদান্যতার। শত্রু পক্ষের মেয়েকে কে কবে দয়া করে? সব শুনেছে পরে টুক্লা, লজ্জায় মরে গেছে সে। অশোকবাবু নাকি ভেতরে ছিলেন না, তখনই ঢুকতে যাচ্ছিলেন নেমতন্ন রাখতে। সংজ্ঞাহীন টুক্লাকে ঘিরে জনতা ভীড় করেছিল। সুমনাদির কোলে মাথা। ওঁদের শত অনুরোধেও নাকি এক ফোঁটা হাওয়া কেউ ছাড়েনি। আরও ক্ষেপে গিয়েছিল সবাই। প্রেসিডেণ্টের উপস্থিতি দাবী করছিল, দায়ী করছিল তাঁকেই।

অশোক সেই সময়ই দ্বিধা না করে অমলাদির সাহায্যে টুক্লার অচেতন দেহ তুলে নিয়ে সোজা গাড়ী করে টুক্লাদের বাড়ী চলে আসে, সব ব্যবস্থা করে। কৃতজ্ঞ প্রসন্নবাবু এ জন্য। বেশীক্ষণ থাকা সম্ভব হয়নি তার। তাই প্রসন্নবাবু আসতেই চলে গিয়েছিল সে। তাও টুক্লা জানে। ও তো ইচ্ছে করেই কোন কথা বলেনি। কি বলবে? লজ্জায় আর আত্মগ্লানিতে ওর নিজেরই কি মরে যেতে ইচ্ছে করেনি?

তারপর থেকে ও আত্মগ্লানির অশান্তিতে ভুগছে। কতবার মনে হয়েছে, কিছু অন্যায় হয়নি, এ রকম হয়, ওর তো অভ্যাস নেই, আবার ধিক্কার এসেছে নিজের উপর। একটা সীন্ ক'রে ও প্রমাণ করল যে, এসব ওর সখের সমাজ সেবা। সত্যিকারের দেশের বা মানুষের জন্য কোন কাজ করা ওর সম্ভব নয়। সে বাতিল কর্মী। তাকে সবাই চিনে গেছে। ভেবেছে আর ভেবেছে, নিজেকে ততই গুটিয়ে নিতে চেয়েছে সকলের কাছ থেকে। আশ্রয় নিয়েছে তার প্রিয় কবিতা আর গানের ভেতর।

আজ যখন জানল শান্তিনিকেতনে যাবার কথা, অদ্ভুত আনন্দে মনভ'রে গেল। ঠিক সময়েই তো সব জিনিষ এসে পৌঁছায়, বাবাকে রাজী করাতে বেগ পেতে হ'লনা। খুব বকাবকি ক'রে প্রসন্নবাবু নিজেও অনুতপ্ত। মাহারা, সাথীহারা মেয়েটার জন্য তাঁর কষ্টই হয়। কেমন বনের হরিণীর মত বেড়িয়ে বেড়াত, আর একি? তাছাড়া ঐ সব মিছিল আর উদ্ভুটে চিন্তা মন থেকে তাড়ান চাই। যাক্ ক'দিন ঘুরে আসুক। শান্তিনিকেতন হয়তো কিছু শান্তি দিতে পারে ওকে। সেই খোলামেলা জীবনের স্পর্শে আবার তেমনি নেচে গেয়ে হেসে উঠুক্ টুক্‌লা।

ট্রেনে উঠতেই আবার যেন নিজেকে ফিরে পেল টুক্‌লা। জোর গলা ছেড়ে গান ধরল ওরা কজন। প্রফেসাররাও সস্নেহ প্রশ্রয়ে গল্প করতে লাগলেন। অন্য জীবন এ। ট্রেন ছুট্‌ছে, তার থেকেও দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে টুক্‌লার মন। শান্তিনিকেতন যাচ্ছে সে, রবীন্দ্রনাথকে দেখবে। একেবারে সামনে? কবিতা আর গানের ভেতর দিয়ে কতবার, প্রতিদিনে কত অসংখ্যবার টুক্‌লা ওঁকে ছুঁয়ে যায়, কিন্তু এ আর অস্পষ্ট নয়, কোন আড়াল নয়। রবীন্দ্রনাথকে দেখবে সে, এ যুগের দেবতা তিনি।

যখন সত্যিই দেখল তখন মুখে আর কথা এলনা টুক্‌লার। মনে পড়ল শাপমোচনের কমলিকার কথা, 'পলক পড়েনা চোখে' একি আশ্চর্য, একি স্বর্গীয়, পৃথিবীতে এমন মানুষও আছেন? ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিলেন তিনি, সামনের নীচু চৌকিতে পা রাখা। সাদা লম্বা পাঞ্জাবী আর পাজামা পরে আছেন। পাতলা একটি চাদর বুকের ওপর টানা। একে একে প্রণাম করে বসল ওরা সবাই। হেসে সম্ভাষণ করলেন 'মর্তের দেবতা' রবীন্দ্রনাথ। মিস দাশগুপ্তাকে তাঁর থিসিস নিয়ে প্রশ্ন করলেন।

ঘরে ঢুকলেন সৌম্যদর্শন একজন ভদ্রলোক, তাঁকে আজকের খেলার খবর জিজ্ঞেস করলেন তিনি। আনন্দিত হলেন শান্তিনিকেতন দল জিতেছে বলে। কত খুঁটিনাটী জিজ্ঞেস করলেন। অবাক হ'ল টুক্‌লা। রবীন্দ্রনাথ এই সব তুচ্ছ কথাও ভাবেন? কিছুই তুচ্ছ নয় তাঁর কাছে? অবাক, শুধুই অবাক হচ্ছে টুক্‌লা। সব কিছু ভাবেন তিনি, সব কিছু জানেন, অথচ কেমন নিরাসক্তি, শিল্পী বলে। প্রকৃত শিল্পী বলেই এ সম্ভব হয়েছে। আর কারও দ্বারা সম্ভব হ'ত কি? টুক্‌লা পারেনা একদণ্ড স্থির হ'য়ে থাকতে, কিন্তু এই সব মহৎ শিল্পী সাহিত্যিকরা কেমন ক'রে সব কিছুর ওপরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বারবার প্রশ্ন করে নিজেকে, সব শিল্পীই, সব সাহিত্যিক, সব গুনীজনই কি এমনি? রবীন্দ্রনাথের মত? এমনি পরম পুরুষ? তাই হবে।

কত কথা হল এই নিয়ে তার রাত্রে বন্ধু ছবির সঙ্গে। ছবিরও একমত। ওর ছোটবেলা তো শান্তিনিকেতনেই কেটেছে। ও জানে এখানের বাতাসে অন্য সুর, এখানকার আকাশের রং অন্য। কেবল রবীন্দ্রনাথ আছেন ব'লেই নয়, সারা আকাশে বাতাসে তিনি শিল্প, সাহিত্য, জীবনের জয়গানের সুর ছড়িয়ে দিয়েছেন ব'লে। অপূর্ব স্রষ্টা তিনি।

ভোরে বৈতালিক থেকে রাতের নাচের মহড়া পর্যন্ত সবকিছুর ভেতর অন্যজীবন খুঁজে পায় টুক্‌লা। সব কিছু সম্ভব হয়েছে, এক মহৎ শিল্পীর প্রভাবে। নিজের অশান্ত বিক্ষুব্ধ মন শ্রদ্ধায় নত হ'ল, শান্ত হল। সব দিতে পারে টুকলা, সব কিছু এই পরম ঐশ্বর্যের জন্য। এমন পুরুষের পায়ে শ্রদ্ধা ভালবাসা জানাতে পারে, যার মনেও এই একই সুর ধ্বনিত হচ্ছে। যিনি হাঁসের মত সংসারের আবিলতার মধ্যে থেকেও নিজেকে এমনি শুভ্র রাখতে পারবেন। তেমন লোকের দেখা টুকলাও কি জীবনে পাবেনা? পাবে নিশ্চয়ই, তাঁর সঙ্গেই সেও মহৎ কিছু

করবে। খালি রাঁধা খাওয়া ও গল্প গুজব ক'রে নয়। স্রষ্টাকে সাহায্য করবে সে সৃষ্টি করতে, এক অনির্বচনীয় পবিত্র আবহাওয়ায় বাস করতে পারবে সে। প্রাণ যেখানে স্বাধীন, নিষেধের বেড়াজাল তাকে সেখানে বাঁধতে পারবেনা।

তাই ফিরে যাবার পর প্রসন্নবাবু যখন তাকে বিয়ের কথা বললেন প্রথমে আপত্তি করলেও পরে চুপ ক'রেই রইল। আশ্চর্য কি করে বাবা তার মনের কথা জানলেন? নাকি ভগবান অন্তর্যামী বলে এমন ব্যবস্থা করেছেন! বুঝতে পারলনা টুকলা। যাঁর সঙ্গে তার সম্বন্ধ এসেছে, তিনি প্রসিদ্ধ শিল্পী শুনে মনটা বেশ নাড়া খেল তার। কত রাত অবধি ভাবল সে। ভেবেছিল বিয়ে করবেনা। কত কি ভেবেছিল। কিন্তু শান্তিও চলে গেল তো লক্ষ্ণৌ, রেজেষ্ট্রী ক'রে বিয়ে করে। কত বাধা সত্ত্বেও। দিদির চিঠি পায় প্রায়ই। বিলেতে চলে গেছে ওরা। দিদির চিঠির প্রতি ছত্রে বোঝা যায় কত সুখী দিদি। তবে? একটা প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসার চিহ্ন তার সামনে এসে দাঁড়ায়। বর্তমানে তার জীবনে কি আছে? মা নেই, দিদি নেই, বন্ধুরাও একে একে যে যার নিজের জীবনে সরে যাচ্ছে. আর বাবা, থেকেও নেই। প্রথম প্রথম অত বকাবকি, এখন তাও চুপ। নেভবার আগে একবার দপ্ ক'রে জ্বলে উঠেছিলেন তিনি। চিরকালের শান্ত মানুষটি ভাগ্যের বিড়ম্বনায় হঠাৎ খেপে গিয়েছিলেন যেন। কিন্তু কেমন ক'রে জানি তাঁর আর টুকলার ভেতর একটা আড়াল পড়ে গেছে। খুব সুক্ষ্ম সে আড়াল, তবু তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায়না।

একা, ভয়ানক ভাবে একা টুকলা। কলেজ, সমিতি, পড়া কিছুতেই সে আর ভরাতে পারছেনা নিজেকে। যে কাজ করবে ভেবেছিল

তাও তো তার দ্বারা হ'লনা। যোগ্য নয় সে এইসব বড় বড় কাজের। যদিও সে শুনেছে, সীন হ'লেও সে ফেন্ট্ করাতে ফল ভালই হয়েছিল। অশোকই নাকি মিষ্টার রায়কে রাজী করিয়েছে স্নেহদি আর সুধাদিকে পূর্ণবহাল করতে। টুকলাকেই ধন্যবাদ জানিয়েছে সবাই। হোক, সে তো জানে তার অবদান কতটুকু। আর অশোকবাবু ! মনে করতেও লজ্জা পেল ! ও জানে, উনি আরতির বাগ্‌দত্ত স্বামী। সে নিয়ে ও ভাবেনা। ভালই হবে। কিন্তু উনি কেন আরতির বাবাকে মত করাতে গেলেন টুকলার জন্য। ওঁরা অন্য সমাজের লোক, কি দরকার ছিল এসবের। দয়া নাকি ? নাঃ ভাবতে পারেনা। টুকলা কল্পনাও করতে পারেনা, তাকে কেউ দয়া করবে। অসম্ভব। কি জন্য তাদের এমন স্পর্ধা হবে ? অশোকবাবু তো নয়ই। তিনি বুদ্ধিমান লোক। কত কি ভাবল টুকলা। অদ্ভুত লাগে। আগে কেমন ছিল। ভাবনার সময়ই পেতনা। কত আনন্দ, কত গল্প, কত কি ! আর এখন ? যা কিছুই করুক, ঘরে ফিরে এসে ভাবনা করা ছাড়া, আর কি আছে তার ? শুধু ভাবনা আর চিন্তা। একা একা চিন্তা করা, আকাশ পাতাল ভাবা। অথচ কেন যে সে এত একা তা ভেবে পায়না। শুধু বোন চলে গেছে বলে বিয়ের পর, শুধু মা মারা গেছেন বলে ? তা কখনও হয় ? সব সংসারেই তো এসব হচ্ছে। তাছাড়া কত মেয়ে তো একমাত্রই। আরতি কি ? তবু তারা তো একা নয়, নাকি তারাও এমনি একাকীত্ব অনুভব করে ? বুঝতে পারেনা টুকলা। আসলে সব থেকে তার মুস্কিল, সে সব কিছুতেই ভাল লাগাতে চায়, অথচ কোন কিছুই বেশীক্ষণ ভাল লাগেনা। কি করবে সে তার এমন মন নিয়ে ? কখনও মনে হয়, সে এই জগৎকে ভালবাসে, সব লোকদের ভালবাসে, জীবনকে ভালবাসে, এতেই সে সুখী ; আবার কখনও মনে হয় সে কাউকে ভালবাসেনা, তাকেও কেউ ভাববাসেনা। কেন এমন হল ? গ্রাহ্য করবেনা সে মনের এই ভাব। বেশ

কিছুদিন যায় এমনি বেপরোয়া মনোভাব। একটা নিশ্চিন্ত সুখী ভাব তাকে ঘিরে থাকে। অকারণে আনন্দ পায় সে, আবার কোথা থেকে বিষাদের কাল মেঘ তার মনের আকাশ ঢেকে দেয়। প্রথমে একটু কোন, পরে হঠাৎ কখন সারা মনটা। আর তখন খুব খারাপ লাগে তার। মনের এই অস্বস্তিকর অবস্থার থেকে ছাড়া পেতে চায় সে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবতে চেষ্টা করে কারণটা, ভাবে আর ভাবে। কূল পায়না সে ভাবনার।

বাবার কথাও আজ তাকে ভাবিয়েছে। বাবার কাছে সময় চেয়েছে। সে নিজে ভেবে বলবে। যদিও বাবা তুচ্ছ করেছেন তাকে, হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন তার কথা, ভাববার কি আছে? কেননা এত ধনী ঘরে, এত বিদ্বান ছেলে তিনি চট্ ক'রে পাবেন কোথায়? অবশ্য একটু পাগলাম আছে, ছবি আঁকার। সেজন্য তিনি ভাবেন না। বড়লোকের অনেক বিলাস থাকে। বুঝতেও পারেননি তিনি, টুকলার কাছে প্রস্তাবটা ভাববার যোগ্য মনে হয়েছে তখনই, যখন সে শুনেছে ভদ্রলোক শিল্পী, ছবি আঁকেন। মনের চিন্তাকে রূপ দিতে পারেন তিনি। সৃষ্টি করতে পারেন সেই সব অপূর্ব মুহূর্ত, সেই স্বর্গীয় আনন্দের জগত, সেখানে সংসারের প্রাত্যহিক দিনযাপনের গ্লানি তাকে স্পর্শ করতে পারবেনা। ঐটুকুই শুধু, বাবার যেখানে উপেক্ষা, সেখানেই তার আসক্তি। বাবাকে সে কথা ও বোঝাতে পারবেনা, অর্থ নয়, তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা নয়, কিছুই টানতে পারবেনা টুকলাকে, ঐ এক আকর্ষণ ছাড়া। শিল্পী তিনি। স্রষ্টা তিনি। নিছক স্থূল জগতে থাকেন না তিনি, সৃষ্টির স্বর্গে যে কোন মুহূর্তে তিনি চলে যেতে পারেন, আর ইচ্ছে করলে নিয়ে যেতে পারেন সঙ্গিনীকেও। ঐ একটুখানি আলো। আলোর ফুল্‌কি……

হঠাৎ আশ্চর্য ভাবে দেখা হয়ে গেল অশোকবাবুর সঙ্গে।
কোথাও বিশেষ ও বেরোয় না। সমিতি গড়া ওর আর হ'য়ে ওঠেনি। উৎসাহ হারিয়েছে মাত্র একটি দিনের ঘটনায়? তাই হবে। তবু নিজেকে নিয়ে মেতে আছে সে। বাড়ীতেই থাকে বেশীর ভাগ।

সেই সময়ই বর্ষার এক রাত্রে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল অশোক-বাবুর সঙ্গে। ইচ্ছে করেই ও যেন এড়িয়ে গিয়েছিল আরতিদের। মানে হয়না কোন, তবু মনে মনে নিজেকে ওদের শত্রু ব'লে ভেবে নিয়ে সরিয়ে নিয়েছিল নিজেকে। আর যায়নি, চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছিল সমিতি এখন হবেনা ব'লে, নিশ্চিন্তই হয়েছেন মিসেস রায়। ওসব ঝামেলা, তার ওপর ওই সরল মুখ দেখিয়ে টুক্‌লা। কি কাণ্ডই আরও না করতে পারতে পারত। পেটে পেটে এত? অশোক যাই বলুক, ওসব মেয়েদের তিনি বিশ্বাস করেন না। ভালই হয়েছে।

শান্তি চলে যাবার পর থেকেই টুক্‌লা আর পাড়ায় ও বিশেষ কোথাও যায়না। বিকাশদের বাড়ী গেলেই তো শান্তির নিন্দে। কি ভাবে ডুবে ডুবে এত বড় সর্বনাশ ও করল ওঁদের, টুক্‌লাও নিশ্চয়ই তাই। তাছাড়া ওর তো সামনে আর্দশই রয়েছে ওর দিদি। শুধু বিকাশদের বাড়ী নয়, অধিকাংশ বাড়ীরই টুক্‌লাদের সম্বন্ধে এই সব ধারনা। কোথাও যায়না টুক্‌লা, যেতে মন চায়না। অন্ততঃ পাড়ায় কোথাও নয়।

তাই দেখাও হয়না বিশেষ কারও সঙ্গে। এতদিন বাদে হঠাৎ অশোককে দেখে ভালই লাগল তার। স্বভাবসুলভ উচ্ছাসে স্বাগত জানাল সে অশোক কে।

খুব জোর বৃষ্টি আসায়, রাস্তায় একটী গাড়ী বারান্দার তলায় আশ্রয় নিয়েছিল টুক্‌লা। বিরাট গাড়ীটা এসে দাঁড়াল তার সামনে, দরজা খুলে ওকে ডাকল অশোক।

পার্বতী দেবী না? এই বৃষ্টিতে? আসুন!

অনেক লোক তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ঈর্ষা ও করছে বোধ হয় কেউ কেউ।

"ধন্যবাদ। গড্‌ সেণ্ট।"

গাড়ীতে সামনের সিটেই অশোকের পাশে বসে পড়ল টুক্‌লা।

কাঁচ তুলে দেব?

অশোক জিজ্ঞেস করল।

না নামানই থাক। বৃষ্টি ভাল লাগে। হাত দিয়ে জল ধরতে ধরতে বলল টুক্‌লা। তাই বুঝি ভাল লাগবার জন্য ভিজছিলেন? বাঃ তা কেন? পথে বৃষ্টি এসে গেল। তাছাড়া এ তো দিন নয় তা না হলে ভিজে ভিজেই বাড়ী ফিরতাম। কি মজাই হোত।

ওর দিকে তাকিয়ে একবার হাসল অশোক।

আপনি বুঝি ভিজতে ভাল বাসেন?

রাত্রে নয় দিনে! রাত্রে এই রকম শুধু হাত ভেজাতে, মাঝে মাঝে মুখটা।

বাঃ বেশ তো! সুবিধাবাদী আপনি!

মুখটা লাল হয়ে গেল টুক্‌লার। ওঃ মনে পড়েছে। কয়েক মাস আগের ব্যাপারটার উল্লেখ করছেন অশোকবাবু।

নাঃ তা কেন?....বারে...আপনি নিশ্চয়ই ঐ কথা বলছেন।... জানেন আমি খুব লজ্জিত।

অবাক হল অশোক।

হঠাৎ লজ্জা পাচ্ছেন কেন ?

না জিজ্ঞেস ক'রে পারলনা।

হঠাৎ নয়! আহা। সত্যি অশোকবাবু, আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন সেদিন। ফেন্ট ক'রে এমন সীন্ করলাম।....

হো হো করে হেসে উঠল অশোক।

ওঃ সেই কথা ভেবে? আচ্ছা লোক তো আপনি! আমার তো সে সব মনেই নেই। আপনি সেজন্য লজ্জিত বুঝি ?

মনে নেই ?

হঠাৎ টুক্‌লার মনে পড়ল, এদের তো সব মনে থাকেনা। তবে সহজ বোধ করল অনেক।

না মিথ্যে বলেছি। বা সত্যের অপলাপ করেছি বলতে পারেন

ওর দিকে মুখ না ফিরিয়েই বলল অশোক,

কি করে ?

আপনি বাড়ীই যাবেন তো ?

ওর কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল অশোক।

হ্যাঁ। কিন্তু........থাক্

কি? অন্য কোথায় যাবেন ?

না!

হঠাৎ হেসে ফেলল টুক্‌লা।

ঐ দেখুন, আমিও সত্যের অপলাপ করলাম।

কি করে ?

আপনি আগে বলুন, আপনি কি বলতে চেয়েছিলেন ?

আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা না বলাই ভাল।

অর্থাৎ আমি দুঃখ পাব ভেবেছেন তো!

দুঃখ পাবেন ?···হবে হয়তো।

কি যে হেঁয়ালি সুরু করলেন অশোকবাবু। বাঁদিকে চলুন। আমাদের বাড়ীতো চেনেন, তবে ?

কি তবে ?

বাঃ সোজা যাচ্ছেন যে ?

বাড়ীতে যাচ্ছিনা ব'লে ?

কেন আপনার ভাল লাগছেনা বুঝি এই দুরন্ত বৃষ্টির মধ্যে গাড়ী ছোটাতে ?

হঠাৎ ছেলেমানুষ হয়ে গেল টুক্‌লা। হাত তালি দিয়ে উঠল।

অসম্ভব।....অশোকবাবু, অসম্ভব ভাল লাগছে। স্পীড বাড়ান। প্লিজ।...জানেন! আমি মিথ্যে বলেছিলাম, কতবার, একবার বাড়ী যাব ব'লে, আরে বাড়ী থেকে বেরিয়েই তো এই বিপদ, আসল জায়গায় তো যাওয়াই হোলনা, তারপর আর একবার ফেরবার ইচ্ছে দেখিয়ে।

বাঃ বেশ লোক তো।

কিন্তু কি জানেন। ভিজছিই যখন, তখন এতে মজা হয় না হোক না রাত, আসুন গাড়ী খুলে আমরা ভিজি।

নিজের পরণের দামী স্যুটের দিকে একবার নজর করল অশোক। তারপর টুক্‌লার অসহ্য জ্বলজ্বল করা চোখের দিকে তাকিয়ে মূহূর্তে মনস্থির ক'রে ফেলল।

ডায়মণ্ডহারবার রোডে ততক্ষণে গাড়ী এসে পৌছেছে। রাস্তায় একপাশে গাড়ীটা দাঁড় করাল অশোক, তারপর দরজা খুলে দুজনে নেমে পড়ল।

বৃষ্টি আর বৃষ্টি, খালি ভেজা, খালি সমস্ত দেহ দিয়ে, সমস্ত অন্তর দিয়ে বর্ষাকে অনুভব করা, আপন ক'রে নেওয়া।

অশোকবাবু, অদ্ভুত ভাল লাগছে, আপনার লাগছে না?.... অদ্ভুত, অপূর্ব্ব, চেঁচিয়ে গান করতে ইচ্ছে করছে। আপনার করছে না?

ধন্যবাদ অশোকবাবু,....ধন্যবাদ....অদ্ভুত ভাল লোক আপনি... অসম্ভব ভাল লোক।

সমানে অনর্গল কথা বলে যেতে লাগল টুক্‌লা আর বৃষ্টির জল সর্বাঙ্গ দিয়ে গ্রহণ করতে থাকল।

অশোক ফিরে গিয়ে গাড়ীতে কোটটা রেখে এসেছে। তার জামা কাপড়ও সব ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছে। এই অনাস্বাদিত আনন্দে সেও খুসী। শুধু যে সামান্য বর্ষায় কাউকে এত সুখ দিতে পারে এ ধারনা অশোকের আগে ছিলনা। অবাক মনে, খালি ও দেখছে টুক্‌লাকে, আর শুনছে ওর প্রাণোচ্ছল স্বতঃস্ফুত আনন্দের প্রকাশধ্বনি। সে আনন্দে তারও অংশ আছে। অশোকের অজ্ঞাত জগত থেকে এ আনন্দের আহ্বান, কিন্তু যেন এতদিন এটুকু আস্বাদনের জন্যই তার অন্তরে বুভুক্ষা ছিল। আরও অবাক হল অশোক।

সত্যি অশোকবাবু। ভাগ্যিস আপনার মাথায় প্ল্যানটা এল.... ওঃ আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ....ভাববেন না কথার কথা.... সত্যিই কৃতজ্ঞ। চিরদিন মনে রাখব এই সন্ধ্যার কথা। আচ্ছা ...আপনি রাখবেন? না আবার সব কথার মত ভুলে যাবেন।

যদি বলি কোন কথাই আমি ভুলিনা।

বাঃ আমি কত বার দেখেছি, আপনাদের কোন কথা মনে থাকেনা। অবশ্য কাজের লোক বলে। কিন্তু জানেন আমি জীবনে কোন ঘটনা ভুলিনা। সুখ বা দুঃখের।

দুঃখের বা অপ্রীতিকর ঘটনা ভুলে যেতে চাই সেটি হয়ত মানুষের মনের ধর্ম বলে। কিন্তু যা প্লেসেণ্ট তা ভুলিনা, ভুলতে চাই ও না।

এই সন্ধ্যা তো আপনার কাছে প্লেসেণ্ট নয়। সব জামাকাপড় আমার জন্য নষ্ট হল। হয়তো কোন কাজে যাচ্ছিলেন, তাও নষ্ট।

নষ্ট? তা হবে......

নয়? দেখি আপনার সার্ট! ও মাঃ একেবারে ভিজে সপ্‌সপে্‌।

ওর বুকে হাত রাখল টুক্‌লা।

স্থির চোখে টুক্‌লার দিকে তাকিয়ে আছে অশোক। এ স্পর্শ

তাকে চঞ্চল করেছে। কিন্তু....এক অসম্ভব ইচ্ছে তাকে পীড়ন করছে। তার মৌন দৃষ্টিতে টুক্‌লা অস্বস্তি বোধ করল হঠাৎ। চলুন অনেক অনেক ভেজা হয়েছে। আপনি আবার পরে আমায় দোষ দেবেন না। তাছাড়া···

তাছাড়া কি?

গাড়ীতে উঠতে উঠতে বলল অশোক।

আসল কথা! আপনি দোষ না দিলেও আমার বন্ধুটি আমায় শেষ ক'রে দেবে। ওরা আবার এসব ভালবাসেনা জানেন তো?

কারা?

না বোঝার ভান করল অশোক।

ভিজে সাড়ীটা একটু নিংড়ে নিয়ে পাশে এসে বসল টুক্‌লা, তারপর জোরে হেসে উঠে বলল।

আচ্ছা। নামটা শুনে বুঝি কাণ তৃপ্ত করতে চান? তাহলে বলছি। আরতি তো জানেও না যে আমি আপনাকে এভাবে বৃষ্টিতে ভিজিয়ে আপনার সময় নষ্ট করছি।

সময় নষ্ট করছেন?···

গাড়ীতে ষ্টাট দিল অশোক। গাড়ী ঘুরিয়ে আবার ফিরে চলল ওরা।

নিশ্চয়ই। ওদের বাড়ীতেই তো যাচ্ছিলেন বোধহয়, বেচারা সারা সন্ধ্যা হয়তো বসে আছে, চট্‌বে যা আমার ওপর।....ঐ যাঃ আপনার সিটগুলো যা ভিজল। ভালই, যতক্ষণ না শুকোবে মনে থাকবে আমার কথা, কি বলেন?

অনেক জিনিষ আছে যা কোনদিনও শুকোয় না।

আপনার সীটগুলো কি তেমনি কোন জিনিষ দিয়ে তৈরী নাকি?

সীট নয়।

তবে।

আপনি বললেন না, যতদিন ভিজে থাকবে!

হ্যাঁ তাতে কি? বুঝতে পারছিনা অশোকবাবু, কি যে সব অল্প অল্প কথা বলেন আপনি। বুঝতে পারিনা, মাপ করবেন।

অনেক সময় অল্প কথাও বেশী মানে বহন করে তা জানেন তো!

হ্যাঁ, কিন্তু যাকে বলছেন তার বোধগম্য হওয়া চাই তো।

সব কথা তো অত ভেঙ্গে বলা যায়না।

কি জানি, আমার তো মনে হয়, আমি সব কথা সবাইকে বলতে পারি।

সত্যি?

নিশ্চয়ই, আমি সত্যি কথা ছাড়া বলিই না।

তাহলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো।

একটা কেন সহস্রটা। আজ আমার এত ভাল লাগছে অশোকবাবু, যদিও জানি বাড়ী গিয়ে বকুনি আছে, বাবা আর মন্তির মার কাছে, তবে অনেকগুলো মিথ্যে কথা ঠিক করে রেখেছি।

তবে যে এখনি বললেন সত্যি ছাড়া বলেনইনা।

আহা! মিথ্যে বলিতো আত্মরক্ষার্থে।

আমি আবার আত্মরক্ষার্থেই শুধু সত্যি বলি। যে সত্যিটুকু না বললে আমার পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়। আপনাকে তাই বলতে চাই।

অশোকের গলার স্বর বড় গম্ভীর। ওর দিকে একবার তাকাল ক্‌লা। কি বলতে চায় অশোক? ওর বান্ধবী আরতির বাগ্‌দত্ত স্বামী সে। টুক্‌লাকে কোন সত্যি কথা বলতে চায় ও। কি সত্যি? যা না বললে ও বাঁচবেনা। ঠাট্টা করছে নাকি? কিন্তু ওর মুখের ভাব দেখে তো মনে হয়না ও ঠাট্টা করছে। কি জানি কিছু বুঝতে পারেনা টুক্‌লা। হঠাৎ যেন তার কেমন লাগল। বেশ ভাল লাগছিল এই বৃষ্টিতে ভেজা আর অশোক-

বাবুকে। এত ভাল লোক উনি। কিন্তু সারাক্ষণ এত গম্ভীর হেঁয়ালিভরা কথা বলেন। বুঝতে পারছেনা টুক্‌লা।

হঠাৎ একটা নিস্তব্ধতা এসে গেল দুজনের মাঝখানে। অশোক কথা বেশী বলেনা। টুক্‌লাই এতক্ষণ নানারকম উচ্ছ্বাস আর কথায় ভ'রে রেখেছিল, কিন্তু ও থেমে যেতেই যেন একটা দূরত্বের আড়াল এসে পড়ল ওদের মাঝখানে।

টুক্‌লাই ভাঙ্গল সে নিস্তব্ধতা। এতক্ষণে ওর সত্যিই ভয় লাগছে এত রাত হওয়ার জন্য, ভেজার জন্য। বাড়ীতে কি বলবে? তাছাড়া যদি বাবা দেখেন অশোকবাবুর গাড়ী থেকে নামছে? কি ভাববেন? তাতে কি? আবার ভাবল সে, বাবাকে তো বলবেই জিজ্ঞেস করলে। তাছাড়া বৃষ্টির জন্য এমনিতেই তো সে গাড়ীতে লিফ্‌ট্ নিচ্ছিল, একটু যা রাত হয়েছে।

বাবা বোধহয় খুব ভাবছেন।

কেন? খুব তো দেরী হয়নি।

খুব না হ'ক একটু তো হয়েছে। তাছাড়া বাবাতো জানেন ও না যে আমি কোথায়, মতির মাকেও বলে আসা হয়নি।....তা হোক তবু ভাগ্যিস আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল, খুব এনজয় করলাম, যেমনটি আমি চাই।

মাঝে মাঝে আসলেই তো পারেন। যেখানে ইচ্ছে এমনি ঘুরে আসতে পারি।

আহা, এমনি ঘুরে আসার জন্য তো নয়। বৃষ্টি···জানেন! বৃষ্টিতে আমি পাগল হয়ে যাই।

বেশ বৃষ্টির তো আজকাল অভাব নেই। চলুন রোজ সন্ধ্যায় ভিজব।

আহা, খুব লোক। আর জানেন, আরতি একদম এসব ভালবাসেনা। ও নিজে আমায় বলেছে ওর মা এসব পছন্দ করেন না। জানেন, সামনে পার্ক অথচ ছোটবেলাতেও কোনদিন ওর

মা ওকে পার্কে খেলতে আসতেও দেননি। অথচ পার্ক! ওঃ আমার প্রাণ ছিল। বড় হয়ে তো এই একটা অসুবিধে হয়েছে।

আচ্ছা একটি কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে?

কতবার তো অনুমতি নিলেন, অথচ আসল কথাটা তো একবারও বললেন না।

আসল কথা বলবার সময় বোধ হয় এখনও আসেনি, তবে নকলটাও বলা দরকার।

কি সে?

আপনি বারবার আরতির কথা বলছেন কেন?

বারে! আপনি ওর সঙ্গে এন্‌গেজ্‌ড নন?

না কে বললে?

আমি জানি মশাই। আরতি আমায় সব বলেছে, আপনার ও বাড়ীতে অত ভয়েস কেন। ঐ জন্যই তো, তাছাড়া আমি কি বুঝিনা কিছু? আমায় ছেলেমানুষ ভেবেছেন নাকি?

ছেলেমানুষইতো আপনি। নাহলে কি আর আসল কথা এতদিনেও....যাক্‌ এটুকু জেনে রাখুন, আমি, আরতি কেন, কারও সঙ্গেই এন্‌গেজ্‌ড্‌ নই। সুতরাং আমার ভাললাগা বা কিছু করার ব্যাপারে কারও মতামতের কোন প্রশ্ন ওঠেনা। একজনের ছাড়া···

বুঝিনা কি যে বলছেন! আমি তো জানতাম, শুধু আমি কেন সবাই জানে। জানেন অমলাদি পর্যন্ত বলেছেন আপনি ও বাড়ীর উড্‌বি জামাই বলে টীচারদের পুনবহাল পসিবল্‌ হল।

যদি বলি কারণ তা নয়।

আর কি হ'তে পারে?

হেসে উঠল টুক্‌লা। হঠাৎ যেন অশোকের সব চালাকি ধরে ফেলেছে ও

আহা! আমাকে ঠকান হচ্ছে। জামাই হবার আগে বুঝি কারও কাছে ডিস্‌ক্লোজ করবেন না।

বিশ্বাস করুন, আর যাকেও হোক আপনাকে কোন কিছুতেই ঠকান আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ও বাড়ীর সঙ্গে কোন মধুর সম্পর্কের বিন্দু মাত্র ইচ্ছা বা সম্ভাবনা নেই।

গাড়ী সার্দান এভেনিউ এ ঢুকেছে। লেকের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। টুক্‌লা সেই দিকে তাকাল। হঠাৎ অশোকের গলার স্বর বড় বেশী গম্ভীর হয়ে গেছে। ও কিছু কিছু বুঝতে পারছে। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছেনা। না অসম্ভব, এ অসম্ভব। অশোক যেন ওর মনের অনুচ্চারিত প্রশ্নেরই জবাব দিল।

জানেন! মিস চৌধুরী!

আমাকে পার্বতী বলবেন। টুক্‌লাও বলতে পারেন। আরতি কে তো নাম ধরেই বলেন।

সে কথা যেন শোনেনি অশোক, আপন মনেই খুব আস্তে আস্তে বলল।

দেখছি পৃথিবীতে অসম্ভব ব'লে কোন কথাই নেই। স্বপ্নেও ভাবিনি আমি আবার এসব গোলমালে পড়ব।

কি গোলমাল?

....মানে আরতিদের বাড়ী, এবং আমার মামীমার কল্যাণে আরও দুএকটি বাড়ীতেও এসব সম্ভাবনা আমার পক্ষে প্রস্তুত করা আছে, অথচ আমার মনে কোন রেখাপাতই হয়নি কোনদিন।... কিন্তু মানুষ যে মানুষই, সেকথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

কিসের ভূমিকা। বাড়ীর আর দেরী নেই বেশী। খুব দূর কি? না হ'লেই ভাল বোধহয়।

সত্যিই মিস্ চৌধুরী! অন্ততঃ প্রত্যেক মানুষের, মানে সাধারণ মানুষের জীবনে নিশ্চয়ই এমন সময় আসে, যখন তার মনের ওপর কোন কণ্ট্রোল থাকেনা।

বুঝতে পেরেছে টুক্‌লা। আয়নার মত দেখতে পাচ্ছে টুক্‌লা অশোকের মন। কিন্তু এই রাত আর বৃষ্টিই কি সেজন্য দায়ী নয়?

হঠাৎ টুক্‌লাকে একথা বলবার কি অর্থ থাকতে পারে?
রীতিমত অস্বস্তি বোধ করে টুক্‌লা,

জানেন, মিস্ চৌধুরী!

গাড়ী চালাতে চালাতে বলল অশোক ওর দিকে না তাকিয়ে।

আমি ··আমি যে কত কষ্ট পেয়েছি·· আমার কতদিন যে....

একটি প্রচণ্ড আবেগকে সংযত করতে চেষ্টা করে অশোক।

অশোকবাবু বাড়ী এসে গেল প্রায়; আপনাকে আগে থাকতে ধন্যবাদ জানিয়ে রাখি। আর আপনার জামাকাপড় তো সব ভেজা। বাড়ী গিয়ে আগে সেসব ছেড়ে ফেলবেন কিন্তু।

আপনি আমায় পরের মত ধন্যবাদ দেবেন না। এতটা সহ্য করা মুস্কিল!

বাঃ এত সুন্দর সন্ধ্যার পরও ধন্যবাদ দেবনা?

না প্লিজ। এটুকু দয়া করুন।

আজকের সন্ধ্যাটিকে কোনদিন ভুলতে পারবনা।

আস্তে আস্তে বলল টুক্‌লা।

আমিও....একটা অনুরোধ রাখবেন?

বলুন!

কাল সন্ধ্যায় একটু দেখা করবেন!

কাল?

বেশ পরশু! নাহয় তার পরদিন।

একটু ভাবল টুক্‌লা। কি করবে সে! অশোকের দিকে একবার তাকাল, কেমন মায়া হ'ল মুখটার দিকে তাকিয়ে। ও বুঝতে পারছেনা তা নয়। কিন্তু কি করবে? আস্তে আস্তে বলল।

আচ্ছা পরশু হ'তে পারে। কিন্তু কোথায় দেখা হবে?

আপনি আশুতোষ কলেজের সামনে থাকবেন, নাহয় যদি বলেন তো বাড়ী থেকেও তুলে নিতে পারি।

তার থেকে আমাদের বাড়ীতেই আসুন না।

আপনাদের বাড়ীতে ?

হ্যাঁ সেই ভাল, এই সব যুদ্ধের সময়ে। বাবা সন্ধ্যার পর বাইরে থাকলে রাগ করেন। তাছাড়া আমারও এরকম ভয়ে ভয়ে থাকতে ভাল লাগেনা।

আচ্ছা। তাই ভাল।

গাড়ী থেমেছে, বাড়ীর সামনে। নেমে পড়ল টুক্‌লা,

তাহলে কথা রইল! পরশু ছটায়।

আচ্ছা।

ধন্যবাদ! সীট্ ভেজানর জন্য দুঃখিত।...নমস্কার।

আবার ?

ওর দিকে করুণ চোখে তাকাল অশোক, তারপর গাড়ীর স্পীড্ বাড়িয়ে বেরিয়ে গেল।

রাত্রে অনেকক্ষণ ঘুম এলনা টুক্‌লার। ওর মনে পড়ল বিকাশের কথা। হাসি পেল আবার। কি রকম পাগলাম করেছিল ও। আজ কোথায় বিকাশ! হ্যাঁ এখনও ও ভালবাসে বিকাশকে, বন্ধুর মত। শান্তি আর বিকাশ দুজনকেই, কিন্তু ওর মনে হয়েছিল ও বিকাশকে ভালবাসে প্রেমিকার মত। সত্যি কি? হঠাৎ তা না হলে অত ব্যাকুল হ'ল কেন ও! কি ছেলেমানুষিই না করল ও। আই এ. পরীক্ষার সময় কতবার বিকাশের কথা মনে পড়েছে। সে বন্ধু হিসাবেই। সত্যি বিকাশ থাকলে অনেক অনেক সাহায্য হ'ত। মনে পড়ল ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় কত ইম্‌পর্টেন্ট্ কোশ্চেন এনে দিয়েছিল বিকাশ। তাছাড়া আরও কত সাহায্য। আই এ পরীক্ষাতেও ও এমনি ভেবেছিল। অভাব বোধ করছিল। বন্ধুর অভাব, অভাবই। অশোকবাবুও অমনি বন্ধু হ'তে পারেন। উনিও বোধহয় টুক্‌লার মত নিঃসঙ্গ, একা। তাই টুক্‌লার বন্ধুত্ব চান। স্পষ্টই তো বললেন বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে ওর কাছে জানাতে চান কিছু কথা। আসুন না উনি। জানিয়ে দেবে টুক্‌লা, স্বচ্ছন্দে উনি টুক্‌লাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। টুক্‌লাও চায় বন্ধু, সঙ্গী সাথী! সেও একা।

কিন্তু শুধু কি বন্ধুত্বই চান আর কিছু নয়? সমস্ত বুকটা কেমন তোলপাড় করতে লাগল টুক্‌লার। মনের কোনাতেও তো সে অশোকবাবুর কথা ভাবেনি, শুধু সেই মিছিলের দিনের উপকারটুকুর কথা ভেবে কৃতজ্ঞ হওয়া ছাড়া। আরতির ভাবী

স্বামী হিসেবেই তো ভেবে এসেছে তাকে এতদিন। তবে একসময় ভালই লেগেছিল অশোকবাবুকে। মনে পড়ল মা আর দিদির সঙ্গে সেই সরলাদেবীর বাড়ীতে যাওয়া। অশোকই প্রথম পুরুষ যে তার সামনে প্রশংসা করে ছিল। বেশ খুসীই হ'য়েছিল টুক্‌লা। কতদিন ভাবত অশোক আসবে তাদের বাড়ী আর সে অনেক গান শোনাবে। কিন্তু তখন তো অশোক আসেনি। পরে তো বলেছেন, মনে রাখেনি সে কথা। এমনি কত কথা তো ও মনে রাখেনি। কত আগে তো এ সম্ভাবনা ঘটতে পারত অথচ ঘটেনি, অশোক কোনদিনও মনে করেনি। আজ এসেছে। কিন্তু বড় দেরী হয়ে গেছে। আজ তার প্রয়োজন নেই। সবাই কি প্রয়োজনের সময়টিতেই ঠিক আসতে পারে? না হ'ক, কিছুই তো মানুষের হাতে নয়। যা ভবিতব্য। কি ভেবেছিল, তার কি সব কল্পনা ছিল জীবনের, কত অন্যরকম হয়ে গেল। তবু আজ সে সুখী, সে এক শিল্পীর স্ত্রী হ'তে যাচ্ছে। আর কি চায় সে? অশোক বাগ্‌দত্ত কি না জানেনা সে, কিন্তু সে নিজে বাগদত্তা, নিজে কথা দেয়নি, কিন্তু তার বাবা দিয়েছেন। তার বি. এ পরীক্ষার পরই তার বিয়ে স্থির। এতে সে অসুখী নয়। তার ভবিষ্যৎ স্বামী শিল্পী জীবনের সৌন্দর্য্যটুকু আহরণ করে তাকে এনে দেবে। জীবনকে সুন্দরতর করবার চাবিকাটি তার হাতে আছে। তাই টুক্‌লার মনও আজ স্থির, পূজার ফুলের মত সে মনে মনে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে সেই অদেখা স্বামীর কাছে। যিনি শিল্পী, স্রষ্টা, যিনি অমৃতে জীবন ভরাতে পারেন।

যে নাহং অমৃতং শ্যাম্...

মনে মনে ভাবল টুক্‌লা।

তাই অশোকের কথার উত্তরে এ কথাটাই প্রকাশ করতে তার বাধেনি, যে সে নিবেদিতা। অশোক একথা বুঝবে কিনা টুক্‌লা জানেনা। সম্ভব কিনা তাও টুক্‌লা জানেনা, এসব নিয়ে ভাবেনা, শুধু জানে, তার যাত্রাপথ স্থির হয়ে গেছে। এখন শুধু প্রস্তুতি আর অপেক্ষা···।

কথাটা শুনে কষ্টে একটা জোর করা হাসি হাসল অশোক।

বলছেন কি? এযুগে এসব কথা শুনলে লোকে যে পাগল ভাববে আপনাকে?

কোন লোক? আপনি ঠিক বুঝবেন তো?

ধরুন আমিও এবং আমার মত কেউই যদি আপনাকে না বুঝতে পারে?

কেন? এটি কি এতই অসম্ভব?

অসম্ভব নয়? আপনি তো তাকে একবারও দেখেননি।

বাবা দেখেছেন। তাছাড়া কথা দেওয়া···

কি তার বিশেষ মূল্য! শুধু বাবা কথা দিয়েছেন বলে?

বাবা তো আমার মত নিয়েই কথা দিয়েছেন।

আপনি না দেখে, মত দিলেন যে? অবশ্য মাপ করবেন, আমি অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করছি বলে। আমি আপনার একজন শুভানুধ্যায়ী বন্ধু হিসেবে প্রশ্ন করছি।

জানি তা, কিছু মনে করছি না। অশোকবাবু, আমার মন বলছে, এঁকে বিয়ে করে আমি সুখী হ'ব।

তাহলে বলার কিছু নেই।

অশোকের গলার স্বর আবেগে ভারী হয়ে এল।

তবে আপনাকে আমি যতটুকু জানি তার জন্য ভয় হয়। আপনি যদি সুখী না হন?

আন্তরিকতায় গলা ধরে এল অশোকের।

শিল্পী তিনি। আমাকে তিনি সুখী করবেনই।

শিল্পী। শুধু শিল্পী বলে? ওন্‌লি বিকজ....

ওন্‌লি নয় অশোকবাবু! ঐটাই সব।

তাই হ'ক মিস চৌধুরী। ঈশ্বরের কাছে কোনদিন কিছু চাইনি। আমার একটি প্রার্থনা ছাড়া আর কিছু ছিলও না, কিন্তু আজ থেকে আর সে প্রার্থনা করব না, কোন অধিকার নেই তার। আমার সারা অন্তর দিয়ে শুধু ঐটুকুই চাইব, আপনি সুখী হন। আপনার স্বামী, তাঁকে আমি, থাক্… তিনি যেন আপনাকে পরিপূর্ণ বুঝতে পারেন।

চোখ দুটি জলে ভ'রে এসেছে অশোকের, টুক্‌লার চোখেও জল এসে গেল। সমবেদনায় ওর সারা বুকটা ভেঙ্গে যাচ্ছে যেন। কি বলবে সে? কত অসহায় লাগছে অশোককে, কিন্তু তার থেকেও কি সে নিজে বেশী অসহায় নয়? কি বলবে সে অশোককে, কি সান্ত্বনা দেবে? কি ক'রে বোঝাবে সে অশোককে তার ভালবাসা, তার শুভেচ্ছা সবটুকুকে সে গ্রহণ করেছে, দুর্লভ সম্পদের মত, সে তো সকলকেই ভালবাসতে চায়। কিন্তু…কি বলবে সে? আরতিকে ভালবাসতে পারে না অশোক? কি করবে সে? কোন সান্ত্বনার বাণী আজ সে অশোককে শোনাতে পারে? শুধু তাকে আরও আঘাত দেওয়া ছাড়া…

উঠে দাঁড়াল অশোক।

তার রুক্ষ চুলে, তার আরক্ত মুখে আর জলভরা চোখে এক বিরাট রিক্ততার প্রকাশ। এই পুরুষ আজ নিজেকে সমর্পণ করেও কিছু পেলনা, এর জন্য সমবেদনায় সারা মনটা হাহাকার ক'রে উঠল টুক্‌লার।

বসুন না আর একটু অশোকবাবু!

না যাই। আপনাকে আর বিরক্ত করব না। আপনার পড়া আছে।

বিরক্ত আপনি আমাকে কোনদিনই করতে পারেন না। এটুকু জেনে রাখবেন যেখানেই থাকুন আপনি আমার মস্ত বড় বন্ধু, আপনাকে আমার চিরদিনই আপন জন বলে মনে থাকবে।

ধন্যবাদ!

এবার অশোকের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল।

অশোকবাবু। :প্লিজ।

কেঁদে ফেলল টুক্‌লা। কি করবে সে, কি করতে পারে সে ?

আর দাঁড়াল না অশোক! ঘর ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গাড়ীতে স্টার্ট দিল। ওর চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল টুক্‌লা।

টুক্‌লাকে আজ অপূর্ব দেখাচ্ছে। তার সহজ সৌন্দর্য, বিয়ের সাজে একটি শান্ত ভাব নিয়েছে। প্রাণ চঞ্চলা সে, বিয়েবাড়ীর পরিবেশও আনন্দ-মুখর, কিন্তু তার মধ্যে সংযত পবিত্র মূর্তিতে বসে আছে টুক্‌লা। তার সারা দেহ মনে ছড়িয়ে আছে সেই পবিত্রতা। ওর এই অস্বাভাবিক স্তব্ধতা যেন কিসের প্রস্তুতি। সাগরের সঙ্গে মেলবার আগে উচ্ছ্বল নদীতে যেমন একটা অতল গভীরতা আসে।

কতটুকু জানে টুক্‌লা অমিতাভর? তবুও সে প্রস্তুত। ছোটবেলা থেকে কত কি শুনেছে ও বিয়ের সম্বন্ধে, কত প্রতিবাদ করেছে, ভেবেছে, ও আর সবাই এর মত নয়, ওর বেলা নিশ্চয়ই অন্যরকম হবে। কিন্তু আজ এই পরমলগ্নে মনে হ'ল ও যেন প্রস্তুত হ'য়েই ছিল। আত্মসমর্পনের সে শিক্ষা, তার অজান্তেই সে তার পরিবেশ থেকে পেয়ে গেছে। আজ সেই লগ্ন আসন্ন। অদ্ভুত উত্তেজনায় ভেতরটা তোলপাড় হচ্ছে তার। ওর মনের সব সুরগুলিই বুঝি বেজে উঠেছে। সে নিজেকে দিয়ে দেবে, সবটুকুই দিয়ে দেবে অমিতাভকে। নিজস্ব বলতে কিছুই রাখবে না। সে নিঃস্ব হয়ে যাবে কি? তাই হ'ক, তাতে ক্ষতি নেই, বরং পরম আনন্দ। তার দেহমনের অর্ঘ্যে অমিতাভ ভরে উঠুক। সম্পূর্ণ হয়ে উঠুক তাদের দ্বৈত জীবন।

মায়ের ছবিতে বড় ক'রে মালা পরান হয়েছে। সম্প্রদানের ঘরে নীচু জলচৌকিতে আলপনা কেটে সুন্দর ক'রে সাজান হয়েছে মায়ের ছবি। সব করেছে টুক্‌লার কলেজের বন্ধুরা। বাড়ী ভরে

গেছে লোকজনে, উৎসব-মুখর সারা বাড়ী। সানাইএর সুরে আর টুক্‌লার মনে বসন্তের প্রাণোচ্ছলতা। কিন্তু মনের মধ্যে সবকিছুর টানাপোড়েন চলেছে যেন। আনন্দ, ভয়, উত্তেজনা সবকিছু আজ একাকার হয়ে গেছে। বাইরের চঞ্চল পরিবেশের মাঝখানে চুপচাপ বসে আছে আবিষ্ট টুক্‌লা। অমিতার অনুপস্থিতি সে বিশেষভাবে অনুভব করছে। আজ টুক্‌লার বিয়ে, কত ঘটা হচ্ছে, শুধু আজ অমিতা উপস্থিত নেই। কত হাজার হাজার মাইল দূরে রয়েছে অমিতা। অথচ কোনদিন কি ভেবেছে টুক্‌লা যে তার জীবনে এই বিশেষ লগ্নটিতে দিদি থাকবেনা তার পাশে? বুঝতে পারছে না যেন টুক্‌লা কিছু। হর্ষ-বিষাদে মেশা এই অনুভূতি।

খুব ভয় পেয়েছিল ও সাতপাক ঘোরাবার সময়। এই পাক শেষ হ'লেই তো শুভদৃষ্টি। কাকে দেখবে সে? কার সঙ্গে শুভদৃষ্টি, এই দৃষ্টি বিনিময়? তার জীবনদেবতা? এতদিন এতগুলি বছর যার জন্য অপেক্ষা করে ছিল? যে আজ থেকে তার সবথেকে প্রিয়জন হবে!

ভাল ক'রে দেখতে পারেনি সে লজ্জায়, উত্তেজনায়। সবাই অত ক'রে বলছিল তবু ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখে নিতে পারেনি তার জীবন মরণ সাথীকে। এক মুহূর্তের জন্য শুধু। তবু তার মধ্যেই বুঝেছিল ভুল করেনি সে, পরম নির্ভরতা আর প্রশান্তির আভাষ আছে তার স্বামীর চোখে। বুকের ভেতরটা তোলপাড় করছিল। মন বড় উত্তেজিত। অসহ্য পুলকাবেগ, ভয় উত্তেজনায় তাকে যেন আচ্ছন্ন করে দিতে চাইছে।

সম্প্রদানের সময়ে অমিতাভর সুগৌর বলিষ্ঠ হাতে সে নিজের কম্পিত ভীরু হাতখানি পরম নির্ভরতার সঙ্গেই যেন ছেড়ে দিল। স্পর্শ মাত্রই অদ্ভুত এক অনুভূতি বোধ করল। পারবে টুক্‌লা, পারবে। এর হাতেই সব ভার ও তুলে দিতে পারবে। মন্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে ও এই অজানা অচেনা লোকটির হাতে তার ভবিষ্যৎ সুখ-

দুঃখ মান-সম্মান সব তুলে দিল, সব ছেড়ে দিল পরম নির্ভরতার সঙ্গে। সে ক্লান্ত হয়েছে নিজের কথা ভেবে ভেবে, নিজের অশান্ত মনের চঞ্চলতায় সে বিক্ষুব্ধ হয়েছে কতবার। আজ সবশেষ, নিশ্চিন্ত হ'য়ে আজ সে সব সমর্পণ করল।

নিবেদিতা টুক্‌লা সমর্পিতা হ'ল। কত কি শুনেছিল সে বিয়ের আগে, কত আলোচনা তাদের—সবাই বিয়ের বিপক্ষে। অথচ আজ কোন দ্বিধা নেই। ভয় ভাবনা মেশান অনুভূতির কোন চিহ্ন সে আর মনের কোথাও খুঁজে পায় না। আত্মসমর্পণের অপার্থিব আনন্দে সে মগ্ন হয়ে যায় যেন। একটি মধুর আবেশ তার সারা দেহ মনকে ঘিরে থাকে। বার বার মনের মধ্যে সেই মন্ত্রই ধ্বনিত হ'তে থাকে—যদেদদ্‌ হৃদয়ং মম....

স্বামীকে টুকুলা প্রথম দর্শনেই ভালবেসে ফেলেছে। বিয়ে সম্পর্কে, পুরুষ সম্পর্কে যে ক্ষীণ সংশয় আর দ্বিধা ছিল হাল্কা আবরণের মত তাও যেন খসে পড়ল। তার দেবতার জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত করছিল যেন এতদিন, সমস্ত হৃদয় মেলে দিয়ে যেন সে পূজার নৈবেদ্য সাজিয়ে দিল। কতদিন ও নিদারুণ নিঃসঙ্গতায় পীড়িত হয়েছে, কত নির্জন মধ্যাহ্ন তার কেটে গেছে চিন্তায় কল্পনায়, সে কি এরই জন্য? সারা মন যেন তার গান গেয়ে উঠল। তার বুক যেন তৃষায় শুকিয়ে ছিল, সে সমস্ত অঞ্জলি ভরে অমৃত পান করবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল।

আজ সে পরিপূর্ণ। শিল্পী স্বামী তার। শুধু সৌন্দর্যে নয় কথায়, লেখাপড়ায়, চিন্তার সংস্কৃতিতে আজ সে মহত্তর জীবনের আভাষ পেয়েছে। টুকুলা ভাবতেও অভিভূত হ'য়ে পড়ে। ভাগ্য-ফলে যে মানুষটির সঙ্গে আজ সে যুক্ত হ'ল, হাত ধরে সেই তাকে নিয়ে যাবে অনির্বচনীয় অমৃতের রাজ্যে। সে মহাযজ্ঞে তারও নিমন্ত্রণ। ভাবলেও কেমন হয় টুকুলার। কি সে ভবিষ্যৎ জীবন সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ধারণা নেই টুকুলার। কিন্তু একটু তার বিশ্বাস সে জীবন এমনি সাধারণ নয়, রাঁধাখাওয়া বেড়ানর ভেতরই তা শেষ নয়।

তার স্বামী সুন্দর বুদ্ধিমান, তাকে পেয়ে সে ধন্য। সাধারণ নয়, এক বিশিষ্ট শিল্পী। সে বৈশিষ্ট্য শিল্পী, সাহিত্যিক

বা কোন গুণীজনেই সম্ভব, যারা পারে এই সাধারণ তুচ্ছতার মাঝখানে অনির্বচনীয়ের আভাষ আনতে স্বর্গীয় আলোয় ভরে দিতে পারে সমস্ত পরিবেশ। সে আলোয় স্নান করে আনন্দ পেতে চায় টুক্‌লা, পরিপূর্ণভাবে পেতে চায় স্বামীকে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে অমৃতময় জীবনকে।

সে বুঝতে পারেনা কোথায় ছিল তার মধ্যে এত আগুণ? যে আগুনে ও জ্বলে উঠতে চায়; জ্বালাতেও চায়! কেউ তো কোনদিন তাকে বলেনি স্বামী কি? এই কি তবে সেই চরম পাওয়া? এ যে মহানন্দের আস্বাদন। দিনগুলো হাওয়ায় উড়তে থাকে টুক্‌লার। আনন্দ...দুকুল ছাপিয়ে আনন্দের জোয়ারে সে ভেসে যেতে চায়।

এই পণ মোর,
সমস্ত জীবন ভোর
দিনে দিনে দিব তার হাতে তুলি,
স্বর্গের দাক্ষিণ্য হ'তে, আসিবে যে শ্রেষ্ঠ ক্ষণগুলি....

সেদিন খুব ঝড় উঠল বিকেলে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করছিল টুক্‌লা। ওর সমস্ত মন যেন এই কথাই বলতে চাইছে।

পার্বতী।

একটা সেতারের সুর চড়তে চড়তে হঠাৎ ছিঁড়ে গেল যেন।

একটা কথা মনে রেখ, আমার ছেলেমানুষি মোটে পছন্দ হয়না।

অবাক হ'ল টুক্‌লা। কি অপছন্দের কাজ সে করেছে? মোটে তো দ্বিরাগমনের পর ফিরেছে তারা।

কি ছেলে মানুষি?

ভালই জান তুমি। যা করছিলে! আমার পক্ষে মনের লঘুভাব সহ্য করা মুস্কিল।

মনের লঘু ভাব ? কি বলছ, বুঝতে পারছিনা ঠিক।

অর্থাৎ তোমার ঐ হঠাৎ আবেগ প্রবণ হওয়া। আজ আবৃত্তি, সেদিন রাতে গান....

লজ্জা পেল টুকুলা। মনে পড়ল পরশু রাতের কথা, টুকুলাদের বাড়ীতে ছিল সেদিন ওরা আর হঠাৎ ঝম্‌ঝম্ ক'রে বৃষ্টি নামল। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল টুক্‌লা। হাত দিয়ে জল ধরতে ধরতে হঠাৎ গেয়ে উঠেছিল

বারি ঝরে ঝরঝর........

থাকতে পারেনি সে, কি: করবে ?

কিন্তু তাতে কি অমিতাভ রাগ করেছিল ? সে তো বুঝতে পারেনি ? কিছুতো বলেনি তাকে ? বাপের বাড়ী বলে ? আজ তাই বুঝিয়ে দিচ্ছে ? সে তো আরও ভেবেছিল তার গান ঘরের ভেতর থেকে ভালই লাগবে অমিতাভর। সেজন্যই তো বেশ জোরে শুনিয়ে শুনিয়ে গান করছিল—কেমন ধাক্কা খেল যেন টুকুলা।

আহাঃ তোমার এমন কথা, আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমি ভেবেছি বুঝি ভীষণ কোন অন্য কথা। বাবাঃ, এমন করে বল।

হেসে স্বামীর কাঁধে মাথা রাখল টুক্‌লা।

না না। কথাটা অত তুচ্ছ নয়। সত্যিই আমার খুব খারাপ লেগেছিল সে রাত্রে।

খারাপ লেগেছিল ? কই কিছু বলনিতো ?

কি বলবো ? ওটা আমার বাড়ী ?

ওর বাড়ী নয় বলে কিছু বলেনি ? মনের ভেতর পুষে রেখেছিল ? দুদিন মনের ভেতর রেখে দিয়েছিল ? আজ নিজের বাড়ীতে এনে তবে বলছে ? যদি ওরা আরও অনেকদিন ও বাড়ীতেই থাকত ? তবে, অনেকদিন বাদে বলত ? এত মনে রাখে ? আবার মনে রেখে তবুও অত আদর করতে পারে, যে আদরে গলে গিয়ে টুক্‌লা আরও প্রগল্‌ভা হয়ে ওঠে ? নিজেরই লজ্জা লাগল

টুক্লার। চোখে জল এসে গেল। ছিঃ ছিঃ সে আবার শুনিয়ে শুনিয়ে কতবার ক'রে গাইল গানটা। ছিঃ ছিঃ তার স্বামী ভালবাস্ছেনা তবু গেয়ে চলেছিল সে তাকেই শোনাবার জন্য ?

তার জল ভরা চোখে দৃষ্টি পড়তেই তাকে কাছে টানল অমিতাভ।

ভারী পাগল তো তুমি ? অমনি চোখে জল এসে গেল ? আমি যা ভালবাসিনা তা না করলেই হয়।

তুমি কি কি ভালবাসনা কি করে বুঝতে পারব ?

ওর বুকে মাথা লুকিয়ে বলল টুক্লা।

এমনি করেই বুঝে নেবে।

এমনি করে ? তা পারবেনা টুক্লা ? তার থেকে ও আগে থাকতে সব ব'লে দিক। টুকলা সেই মত চলবে। এমনি লজ্জাহীনার মত কাজ করে ফেলে, পরে শোধরাতে পারবেনা।

অসম্ভব।

ন্ না। প্লিজ—

কি না ?

ওর মুখ দুহাত দিয়ে তুলে ধরতে চেষ্টা করল অমিতাভ।

আমাকে বলে দাও, তুমি কি কি ভালবাসনা; আমিও সেসব ভালবাসব না।

পারবে ?

নিশ্চয়ই !

অমিতাভর সন্দেহে রীতিমত আহত হল টুকলা।

তাহলে বুঝে নিও।

কি ক'রে ?

তোমার ভালবাসা দিয়ে ?

যদি ঠিক বুঝতে না পারি ?

পারবে, খানিকটা ম্যাচিওরিটি আসলেই পারবে।

আহা আমি বুঝি ম্যাচিওরড্ নই ?

একেবারেই নয়।

স্ত্রীর গালটা সস্নেহে নেড়ে দিয়ে হাসল অমিতাভ, অদ্ভুত সে হাসি। আবার মুগ্ধ হল টুক্‌লা।

তোমার যেমন করে ইচ্ছা গড়ে নাও আমায়, যোগ্য করে নাও তোমার।

কিন্তু অমিতাভর সে সময় কোথায়? শিল্পী সে। বেশীর ভাগ বন্দী থাকে তার নিজের স্টুডিওতে।

বাড়ীর পূবদিকের ওপরতলার প্রায় সবটাই অমিতাভর স্টুডিও। প্রথম দিন দেখে আনন্দে আর গর্বে আত্মহারা হয়ে গেছে টুক্‌লা। সমাপ্ত, অর্ধসমাপ্ত কত যে ছবি তার ইয়ত্তা নেই। কত বিক্রী হ'য়ে গেছে। এই যুদ্ধের সময় কত বিদেশী আসছেন, অপ্রত্যাশিত দাম দিয়ে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা কত ছবি। ভাবে, আর সমস্ত বুকখানা ভরে ওঠে টুক্‌লার, আর কিছু সে চায় না। এমন স্রষ্টার জীবনটুকু সুখ-শান্তি আরামে রাখাই তার একমাত্র সাধনা হবে। তার বাঁচার সার্থকতা সেখানেই। সে শিল্পীর সহধর্মিণী। সত্যিকারের সহধর্মিণী হবে সে। ভালবাসে সে চিত্রবিদ্যাকে, আর্টকে এখন থেকে সে শুধু হৃদয় দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে বুঝে নিতে শিখবে। পড়বে সে অনেক, জানবে সে অনেক। গুণী স্বামীর যোগ্য হতে হবে.... হতেই হবে। এজন্য সাধনা করবে সে। তপস্যা। পার্বতীকে তো তপস্যা করতেই হবে। মনে মনে হাসল সে।

কিন্তু বড় খেয়ালী অমিতাভ, শিল্পীরা বুঝি এমনিই হয়। ভাবল টুক্‌লা। তাতেও খুসী সে। স্বামীর এই খেয়ালের ভালবাসাতেই সে পূর্ণ। তবু যেন মাঝে মাঝে কেমন ফাঁকা বোধ করে। আরও কি চায় সে? বুঝতে পারে না।

বিয়ের একমাসের ভেতরই যারা বাড়তি লোকজন এসেছিলেন তাঁরা চলে গেলেন। রইলো শুধু খুড়শ্বাশুড়ী আর এক রুগ্ন ননদ। তার স্বামীর কাকীমা, মায়েরই মত, তারও, বার বার উচ্চারণ করল টুক্‌লা। মা মা, কতদিন ডাকেনি সে, তাই কারণে অকারণে শ্বাশুড়ীকে ডেকে ডেকে মনের অতৃপ্ত ক্ষুধা মেটাল যেন। ননদ উমার বয়স কতটা আন্দাজ করতে পারেনা টুক্‌লা বোধহয় তারই সমবয়সী। স্বামীকে জিজ্ঞেস করতে সঙ্কোচ হয়, যদি অন্য কিছু ভাবেন তিনি? না কোন রকম ছেলেমানুষি সে করবে না! খুব গম্ভীর আর ম্যাচিওরড হবে সে। সব কিছু বুঝে নিতে চেষ্টা করবে। সে কত বড় ইন্‌টালেক্‌চুয়ালের স্ত্রী। এ কথাটাও বলেছে অমিতাভ নিজে তাকে। টুক্‌লা বোঝে সব। সে তো এর জন্যই নিজেকে উৎসর্গ করে দিতে পারে। ত্যাগ, একজন ইন্‌টালেক্‌চুয়ালের জন্য। ভাবতেও গর্ব বোধহয় টুক্‌লার।

উমাকেও সে ভালবেসে ফেলেছে। সে যে অমিতাভরই খুড়তুত ছোট বোন। হোক সম্পর্কিত, বোন তো, সে যেমন অমিতার। দিদির কথা মনে পড়লে এখনও ভারী অভিমান হয় টুক্‌লার। সত্যি দিদিটা কি। কি ক'রে ওদের সকলকে ছেড়ে ঐ দূরদেশে পড়ে আছে? ভাবতেও কেমন লাগে।

কিন্তু যত সহজ ভাবে টুক্‌লা, তত সহজে যেন কিছুই তার হয় না।

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ও যখন বেরিয়ে এল ঘরথেকে উমা সামনেই দাঁত মাজছিল।

বাবাঃ এতক্ষণে তোমার ভোর হ'ল বৌদি?

লজ্জা পেল টুক্‌লা!

হ্যাঁ ভাই বড্ড বেলা হয়ে গেছে আজ—

আজ কেন রোজই তো হয়, জান, মা বেলায় ওঠা পছন্দ করেন না।

আমায় আগে বলনি কেন? যত ভোরেই বল, তত ভোরেই আমি উঠতে পারি জান?

বেশ আজ তো বললাম, কাল থেকে উঠ। আর দেখ, ভোরে মায়ের চিরতার জল খাওয়া অভ্যেস আছে, ওটুকু নিজে ছেঁকে মাকে দিও। মায়ের কাজ তোমারই করা উচিত।

নিশ্চয়ই।

লজ্জিত হ'ল টুক্‌লা। ও তো প্রস্তুত। সবকিছু করবে, সকলকে সেবা করবে, সবাই ওকে ভালবাসবে, এইতো ও ভেবেছিল। তাই তো সে চায়।

বাড়িয়ে দিল কাজের সময়। ক্লান্তি লাগলেও সে ভোরবেলাই উঠে পড়ে, দুপুরে শ্বাশুড়ীর বিশ্রামের সময় চুল দেখে দেওয়া থেকে রাত্রে স্বামীর ঘুমোবার সময় পর্যন্ত তার মুখে মুখে পান জল এগিয়ে দেওয়া পর্যন্ত, সব সব করতে চায়। মাকেও তো সে তাই দেখেছে। এ আর অস্বাভাবিক কি? সকলকে সুখী করতেই তো চায় সে।

কিন্তু পারে কি? শ্বাশুড়ী ননদের জন্য সে ভাবে না। তাঁরা চিরদিন থাকেন না। দেশে থাকেন। মাঝে মাঝে কলকাতার বাড়ীতে আসেন। তাই কিছুদিন পরই তাঁরা চলে গেলেন। মাত্র এই কদিনের জন্য উমা অতটা কঠিন হল কেন? টুক্‌লা ভেবে পায়না। তবু তারা সকলেই যেন ভাল। তাছাড়া টুক্‌লাও তো তাই চায়। বেশ কেমন আরও বড় সংসার, দেবদাসের পার্বতীর মত। তাকে সবাই ভালবাসবে, মানবে, সে সবাইকে স্নেহ করবে, আশ্রয় দেবে! তাদের জন্য পরিশ্রম করবে, আহা তেমনটি হ'লে বেশ ভাল হ'ত। খুব সুখী হ'ত টুক্‌লা। কিন্তু তা হবার নয়। অমিতাভ নিজেই পছন্দ করে না এ সব। ছোটবেলায় মাতৃহারা তাকে কাকীমা মানুষ করলেও। শান্তিপ্রিয় মানুষ সে একা থাকতে চায়। শিল্পী সে, ঝামেলা আর হট্টগোল ভালবাসে না। টুক্‌লারও কাজ নেই ভালবেসে। কার স্ত্রী সে ভেবে দেখবে না? অন্য সব সাধারণ

মানুষের মত সব চাইবে ? তা হ'তে পারে না। একজন জিনিয়াসের স্ত্রী সে, একথা ভুলবে কেমন করে ?

কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে গেছে। কিছুতেই যেন তার নাগাল পাচ্ছে না টুক্‌লা। অমিতাভ তাকে ভালবাসে, টুক্‌লা বুঝতে পারে, কিন্তু তাও যেন খেয়াল মত। সব সময় নয়, তাহ'লে টুক্‌লা কি ওর স্বামীর মন ভরাতে পারেনি ? হাসিও পায় টুক্‌লার, কি পাগলাম ওর নিজের মনের, আগেকার মত নাকি ? স্ত্রীর সঙ্গে মনের সম্পর্ক নেই, অথচ স্বামী।

ভাবে, আর ভাবে টুক্‌লা। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় রবীন্দ্রনাথের পূজা থেকে কতকগুলো গান চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে করে, যেমন আগে করত নিজের বাড়ীতে। কিন্তু না, তা মরে গেলেও করবে না। বরং একটু অন্য কাজ নিয়ে থাকবে সে। আগা ও যদি আঁকতে পারত। একবার ইচ্ছে হয়, চেষ্টা ক'রে দেখবে। বুঝি কত সুখ আঁকায়, কত তৃপ্তি। অমিতাভ কোথাও যায় না, যেতেও চায় না। নিজের আঁকা নিয়ে থাকে, মাঝে মাঝে বেরোয়, সেদিন ফিরতে খুব রাত করে। আর এসে কিছু খায় না। টুক্‌লার সঙ্গে কথাও বলে না। ঘুমিয়ে পড়ে। আবার কোনদিন ফিরেই প্রচণ্ড আদরে টুক্‌লাকে ভয় পাইয়ে দেয়, টুক্‌লা এর কোনটাই পছন্দ করেনা। ও বলতে চায় অমিতাভের পছন্দ মত কাজ টুক্‌লা করবে আর টুক্‌লার পছন্দমত কাজ তাহলে ও করবেনা কেন ? কিন্তু বলতে পারেনা। কোথায় আটকায় টুক্‌লা জানেনা। কিন্তু তখন ওর ভারী কান্না পায়। মা, দিদি, বিকাশ, শান্তি, অশোক সকলের কথাই মনে হয়। বিশেষ ক'রে অশোকের কথা। অশোক কি চিনত অমিতাভ কে ? তা নাহ'লে কেন ভয় পেয়েছিল ওর স্বামী ওকে চিনতে বা বুঝতে পারবেনা ভেবে ? পরক্ষণেই মনে হয় অশোক তো সে ভয় পায়নি। ও আন্তরিক ভাবেই চেয়েছিল যাতে তার স্বামী তাকে পরিপূর্ণ ভাবে বুঝতে পারে। পেরেছে তো। না হলে ওকে গড়ে নেবার কথা বলে

কি ক'রে ? জানে কোথায় টুক্‌লার কতটুকু অসম্পূর্ণতা, সেটুকু ঠিক করে নিয়ে আপন মনের মত সম্পূর্ণ ক'রে গড়ে তুলবে টুক্‌লাকে। তাই হোক।

তখনি আঘাত পায় টুক্‌লা।

কার কাছে সমর্পণ করবে নিজেকে ? সেকি গ্রহণ করতে প্রস্তুত ? বুঝতে পারেনা টুক্‌লা। কোথায় নিজেকে সমর্পণ করবে যাতে আর কোন অতৃপ্তি না থাকে ? কি ভাবে ? সেই সময়ই একদিন সন্ধ্যা বেলা যেন আবিষ্কার করল ও।

অমিতাভ সারাদিন একবারও এদিকে আসেনি। টুক্‌লা জানে যখন ও ষ্টুডিওতে আঁকে, তখন টুক্‌লার সেখানে যাওয়া ও পছন্দ করেনা, তাই বার বার অদম্য ইচ্ছাকে সে প্রাণপণে সংযত রেখেছে সারাদিন। বিকেলে খোঁজ নিয়ে জানল যে অমিতাভ বেরিয়ে গেছে। ভারী খারাপ লাগল টুক্‌লার, বেশ লোক তো ! বেরিয়ে গেল অথচ ব'লে গেলনা টুক্‌লাকে। অনেকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াল, তারপর হঠাৎ মনে হ'ল অমিতাভ নেই, ওর ষ্টুডিও ঘরে গেলে কেমন হয় ? দরকার হলে একটু গুছিয়ে দিয়ে, অমিতাভকে অবাক ক'রে দেবে।

তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। ষ্টুডিওর ঘরে জমাট বাঁধা অন্ধকার। এসেই জানলাগুলো খুলে দিল টুক্‌লা। খোলা জানলা দিয়ে অস্তমিত সূর্য্যের শেষ রশ্মি এসে পড়ল সামনেই রাখা একটি অর্ধ-সমাপ্ত ছবির ওপর। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল টুক্‌লা। কি অপূর্ব চেহারা। কে এই মেয়েটি। একে কি মন থেকে আঁকছে না মডেল দেখে ? কোন দিন তো কোন মেয়েকে দেখেনি ষ্টুডিওতে ও, তাহলে ? ইজেলের আরও সামনে এগিয়ে এল ও। তুলির মোটা মোটা

আঁচড় গুলোতে ছবিটা ভাল লাগল না। দূরে সরে গিয়ে আবার দেখতে লাগল। দূর থেকেই ভাল দেখায়, কাছে এলে সব যেন বেশী বোঝা যায়, তুচ্ছ আঁচড়গুলো অবধি। একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস টুক্‌লার বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। মানুষের জীবনও কি এমনি? দূর থেকে ভাল, কাছে এলেই তার সব কিছু তুচ্ছতা, দীনতা, তার সাধারণত্ব নিয়ে হাজির হবে, দাবি জানাবে নানা অসঙ্গতির আর সেই অসঙ্গতির জন্য মন ক্লান্ত হবে? চমকে উঠল টুক্‌লা, এ চিন্তা কেন? সে কি অমিতাভকে দিনের পর দিন ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্টতায় আরও বেশী ক'রে ভালবাসছে না? যত দিন যাচ্ছে, টুক্‌লার সমস্ত চিন্তা, মন, আবেগ অমিতাভর দিকেই কি নিবিড় ভাবে জড়িয়ে পড়ছে না? তবে এ চিন্তা কেন? মন থেকে জোর করে ঝেড়ে ফেলে দিল টুক্‌লা বিষণ্ণতার আমেজটুকু, তারপর একে একে সব জানলাগুলো খুলে দিল।

ঘরের দক্ষিণেই ওদের বাগান। সেখান থেকে ফুলের সুগন্ধ ভেসে এল ঘরের ভেতর। হঠাৎ আবার মনটা ভারী ভাল হয়ে গেল টুক্‌লার। সবই তো আছে, কিছুই তো যায়নি হারিয়ে, বরং ওর নতুন নিজস্ব জীবন আরম্ভ হয়েছে, যেখানে ও নিজেকে সব কিছু তুচ্ছতার থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছে, যেখানে এমন ফুলের গন্ধ ভেসে আসা, পাগল করা সন্ধ্যার আলোয়, এমন এক সৃষ্টির জগতে ও সময় কাটাতে পারছে।

টুক্‌লা অমিতাভর টেবিলের পাশে একটা রিভলভিং চেয়ারে বসে পড়ল। খানিকটা ঘুরে দোল খেয়ে তার পর হঠাৎ কি মনে হোল, অমিতাভর টেবিলের দেরাজটা একটানে খুলে ফেলল। কি হয়েছে? পারেই তো সে খুলতে তার স্বামীর টেবিল; স্বামীর টেবিল! তার নয়? কিন্তু কেমন যেন অবাক লাগল। পর পর থাক থাক করে সাজান একরাশ চিঠি। এক এক বাণ্ডিল সুতো দিয়ে বাঁধা। অত অগোছাল মানুষ অমিতাভ কিন্তু চিঠির বাধা বাণ্ডিল দেখে মনে

হবে যেন আর কেউ সাজিয়ে রেখে গেছে চিঠিগুলো। কার চিঠি? কে লিখেছে? কাকে? সবই এক হাতের লেখা। লেখা হয়েছে অমিতাভকে। নাঃ আরও বাণ্ডিল আছে। সেগুলো একটা গেরুয়া কাপড়ে জড়ান। খুব অন্যায় মনে হ'ল টুক্‌লার। অমিতাভর অনুপস্থিতিতে তার চিঠি দেখা, কিন্তু স্ত্রী হিসেবে একটা অধিকার বোধ, আর কেমন একটা যন্ত্রনাদায়ক কৌতুহল তাকে পীড়ন করতে লাগল। এক টানে খুলে ফেলল সে গেরুয়া কাপড়ের আচ্ছাদন। কোন এক শ্রীমতি সবিতা সেনকে লেখা একরাশ চিঠি। হাতের লেখা কার? অমিতাভর? মাথা ঘুরছে টুক্‌লার। কে এ? অমিতাভর সঙ্গে এর কিসের সম্পর্ক, কি লিখেছে অমিতাভ ওকে? তাড়াতাড়ি খুলে ফেলল একটা খাম। প্রেমপত্র, সবিতা সেনকে লেখা অমিতাভর প্রেমপত্র। নিঃশ্বাস বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে, ওর সমস্ত হাতপা ঘামছে। বিশ্বাস করতে পারছেনা ও। চিঠিটা পড়তে পারছেনা। শুধু হাতেই ধরা রইল। ও তাকিয়ে রইল জানালার বাইরে সন্ধ্যার আকাশের দিকে, যেখানে সূর্যের গলান সোনার রংএ সারা আকাশ ছেয়ে গেছে।

কতক্ষণ বসে ছিল, টুক্‌লার মনে নেই। কখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। উঠে পড়ে চিঠিগুলো যথাস্থানে রেখে দিল। তারপর আস্তে আস্তে জানলা দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে ফিরে এল।

কি যেন একটা হ'য়ে গেল। টুক্‌লার মনে একটা ঝড় বইছে যেন। কি করতে পারে সে, এখনকার দিনে এমনকি অসম্ভব? যাকে বসে একটা এ্যাফেয়ার থাকা। কত লোকের জীবনেই তো ঘটে থাকে। জানে তা টুক্‌লা, সব জানে। সব স্বাভাবিক, কিন্তু তার নিজের জীবনে এ স্বাভাবিকতাকে সে কিছুতেই স্বীকার করতে পারবেনা। অসম্ভব, অসম্ভব....একটা ভীষণ জ্বালায় সারা বুকটা জ্বলে যাচ্ছে এরই নাম কি জেলাসি? হিংসে? কেন? কার প্রতি জেলাস টুক্‌লা। সবিতা সেন? যাকে দেখেনি,

শোনেনি, যাকে জানেনা? কে সে? যেই হ'ক তাকে তার স্বামী তো ভালবাসত একসময়; ভালবাসত কেন? অতীত কেন? বর্ত্তমানেও তো হ'তে পারে। কি ক'রে জানবে টুক্‌লা? সব কিছুই তো অজানা। কি করবে টুক্‌লা? ওর বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে, ও আর সহ্য করতে পারছে না। ও একা একা পারেনা এত জ্বালা বহন করতে। কিন্তু এ জ্বালা তো ওর একারই? কাকে বলবে সে, কে তাকে সব কথা খুলে বলবে? অমিতাভ? তাহলে এতদিন বলেনি কেন? টুক্‌লাতো সব বলেছে তাকে বিকাশের কথা, অশোকের কথা শুনে হেসেছে অমিতাভ, ওর ছেলেমানুষি ব'লে সেটাও উড়িয়ে দিয়েছে। কত মহৎ মনে হয়েছে তখন অমিতাভকে, কত উদার, সব কিছু কেমন ঠিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে পারে, সবাই কি তা পারে? আজ মনে হ'ল ঠকে গেছে টুক্‌লা, নিদারুণ ভাবে ঠকে গেছে। ওর স্বামীর মনের ভেতর টুক্‌লার স্থানই নেই, কি করে সে মাথা ঘামাবে? টুক্‌লা কবে কি ক'রল না করল, তাতে তার দরকার কি? উপকার নয়, ক্ষমা নয়, উপেক্ষা। টুক্‌লাকে উপেক্ষা করেছে অমিতাভ, তাই এ নিয়ে কোন প্রশ্ন করেনি। এতদিন সব বুঝতে পেরেছে টুক্‌লা, সব। কেন তার তুচ্ছতম ত্রুটীতেই অমিতাভর রাগ হয়। কেন তাকে সহ্য করা কঠিন, তার চাপল্যকে তার প্রাণোচ্ছাসকে, সব বুঝতে পেরেছে। সে তার স্বামীর মনের মত নয়। তার আগেই একজন সে আসনে পাকা হ'য়ে বসে আছে। তবে? কেন মিছামিছি টুক্‌লাকে বিয়ে করল অমিতাভ? শুধু অপমান করবার জন্য? কি করেছিল টুক্‌লা অমিতাভর? মনের ভেতর একটা প্রচণ্ড বন্যার আবেগকে ও যেন সংযত করে রাখছে। কি করবে সে? কেন ও ঘরে গেল? দাঁত দিয়ে নিজের আঁচলটাকে কুটি কুটি করে ফেলতে লাগল। তার পর বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইল।

একি ঘর অন্ধকার কেন? আজ যে আলো জ্বালোনি?

অমিতাভ ঘরে ঢুকেছে কখন।

মুখ তুলল না টুকলা। মুখ তুলে তাকাতে পারছেনা ও অমিতাভর দিকে। আরও জোরে মুখটা বালিশে চেপে ধরল। কাঁধে অমিতাভর স্পর্শ অনুভব করল।

শোন! ওঠ! কি ব্যাপার? লক্ষ্মী শোনতো!

হঠাৎ মুখতুলে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে অমিতাভরই বুকে মুখ লুকাল টুক্‌লা।

খুব অবাক হয়ে গেল অমিতাভ।

কি ব্যাপার? কান্না কেন? কি হয়েছে···

কিছু বলতে পারলনা টুক্‌লা, কান্না, আর কান্না। ভেঙ্গে পড়ল সে অবিরাম কান্নায়, মরে গেলেও ও জানাবেনা।

বল লক্ষ্মীটি। আমায় বল।

ন্‌ না।

তাহলে আমি কি ক'রে বুঝব?

তোমায় বুঝতে হবেনা।

মহা মুস্কিলে পড়ল অমিতাভ। সারাসন্ধ্যা বাইরে ঘুরে ক্লান্তও লাগছিল তার। অথচ....

কি যে ছেলে মানুষের মত কান্নাকাটি কর বুঝিনা।

ওর মুখটা বুক থেকে সরিয়ে দিতে চাইল অমিতাভ। নিজেই সরে গিয়ে নিজের আঁচলে মুখ ঢেকে বালিশে মুখ গুঁজল টুক্‌লা।

কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে জামাকাপড় ছাড়তে পাশের ঘরে গেল অমিতাভ।

টুক্‌লাকে যেন ভূতে পেয়েছে, ও অপেক্ষা করে আছে, কখন অমিতাভ বেরিয়ে যাবে, ও যাবে ষ্টুডিও ঘরে। দেখবে, সব চিঠি-গুলো, পড়বে জানবে। ছট্‌ফট্‌ ক'রে মরছে ও, কিন্তু তারপরেও এক সপ্তাহ বেরোলনা অমিতাভ। শুধু শনিবার, হঠাৎ সিনেমা যেতে চাইল টুক্‌লাকে নিয়ে। খুব অবাক হ'ল টুক্‌লা। বিয়ের পর থেকে বারদুয়েক বোধ হয় অমিতাভর সঙ্গে সিনেমা গেছে। তাও ওর বন্ধুদের অনুরোধে একবার, আর একবার টুক্‌লার বন্ধুদের নিয়ে। শুধু টুক্‌লাকে নিয়ে এই প্রথম। আগে হ'লে খুসী হত টুক্‌লা, কিন্তু এখন তার প্রস্তাবটা গ্রহণ যোগ্যই মনে হ'লনা। কোন দরকার নেই। তাকে নিয়ে সিনেমা না গেলেও চলবে। অবাক হ'ল অমিতাভ ও খুব। বাইরে বেরোনর ব্যাপারে টুক্‌লার আগ্রহ লক্ষ্য ক'রে সে বিরক্তই হয়েছে বরং, ভেবেছে আস্তে আস্তে ঠিক হ'য়ে যাবে। কিন্তু এবার টুক্‌লার আপত্তিতে ও অবাক না হয়ে পারলনা।

আমার শরীর ভাল নেই, আমি যাব না।

সে কি? টিকিট কাটবার সময় বলনিতো!

তখন শরীর ভাল ছিল।

বাঃ, এত অল্প সময়ে এত বেশী শরীর খারাপ হ'তে পারে না, চল তুমি।

না, আমি যাবনা।

তোমারই তো বেশী আগ্রহ দেখেছি। সিনেমা যেতে।

সব সময়েই তো মানুষ একরকম থাকেনা।

হ্যাঁ অন্ততঃ কদিন তুমি যে একটু অন্য রকম আছ তা বুঝতে পারছি।

চমকে উঠল টুকলা। বুঝতে পেরেছে নাকি অমিতাভ। ও আবার যেমন লোক। তাহলে ষ্টুডিও ঘরে ঠিক চাবি দেবে বা চিঠিগুলো লুকিয়ে ফেলবে।

কি অন্যরকম?

থত মত ভাবে জিজ্ঞেস করল টুকলা।

এই আমার প্রতি আর মনোযোগী নও। বোধ হয় আমার ওপর ক্লান্তি এসেছে। ভাল লাগে না আমাকে।

বাঁচল টুকলা। যাক্ কিছু জানেনা। গলা আটকে আসছিল টুকলার আবেগে, ভাল লাগেনা? অমিতাভকে? তাহলে টুকলা বাঁচবে কি ক'রে।

বল তাহলে যাবেনা? জানতে হবে আমাকে।

নিজেকে যেন আবার গুটিয়ে নিল অমিতাভ। এই রকমই হয় কখনও আবেগে তার স্বর ভারী, পরমূহূর্তে কঠিনতার আবরণে নিজেকে মুড়ে নেয় সে।

একবার টুকলার মনে হ'ল বলে যাবে, সত্যি মিছামিছি কি দরকার। ও তো সব কিছু শেষ করতে চাইছেনা তবে? অনর্থক এই তিক্ততা। কিন্তু তার আগেই অমিতাভ কেমন যেন দূরে সরে গেছে।

থাক তাহলে যেতে হবে না।

ছিঁড়ে ফেলল আস্তে আস্তে টিকিট দুটো।

বাঃ রে, অত টাকার টিকিট দুটো ছিঁড়ে নষ্ট করলে। কাউকে দিয়ে দিলে হোত।

তার থেকে বেশী দামী জিনিষ তুমি নষ্ট করেছ।

কি সে?

তা বুঝতে পারলে আর তোমার…

কি বলতে চায় অমিতাভ? বুঝতে পারলে কি হোত? ওতে আর সবিতাতে কোন পার্থক্য থাকতনা? কথা শেষ করলনা কেন?

কি নষ্ট করলাম বলতে হবে।

মুড্। আমার মুড্‌কে আমি সামান্য কটা টাকার চেয়েও দামী মনে করি।

সকলেই করে, ভাবল টুক্‌লা। টাকার জন্য ও ভাবেনা। অমিতাভর মুড্ নষ্ট করেছে ও শুধু আজ সন্ধ্যায়, আর ওর জীবন, সুখ সব নষ্ট করেনি অমিতাভ? তার দাম নেই? একটা রুদ্ধ উচ্ছ্বাসে ঠোঁট কাঁপতে লাগল টুক্‌লার।

যাক্…আমার কাজ আছে, এক জায়গায় বেরোচ্ছি আমি।

ভালই। টুক্‌লা তাই চায়। লুকোন প্রেমের মত ঐ চিঠিগুলো ভাল ক'রে দেখবার নেশা তাকে পেয়ে বসেছে। জানতে হবে, তাকে জানতেই হবে। অমিতাভর সমস্ত অতীত তাকে জানতে হবে। এতদিন ভাবেনি সে ও কথা, উদারতায় নয়, পরম বিশ্বাসে, ভেবেছিল জানবার নেই কিছু, কেন ভেবেছিল তাও টুক্‌লা জানেনা। অনায়াসেই তো যে কোন লোকের জীবনে এ সব ঘটে যায়। কিন্তু ও যে ভেবেছিল অন্য রকম। তাই সব কিছু জানবে সে আপন অধিকারে

অমিতাভ বেরিয়ে যেতেই ও হাজির হ'ল ষ্টুডিও ঘরে। ছবিটার কাজ আরও অনেকটা এগিয়েছে। নিশ্চয়ই এই সবিতা সেন। হঠাৎ মনে হ'ল, মেয়েটিকে সে সুন্দরী ভেবেছিল মোটেই তা নয়। কুশ্রী, অতি কুশ্রী ঐ মেয়েটি। ছবিটার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল টুক্‌লা তারপর সরে এসে টেবিলের দেরাজটা খুলে ফেলল একটানে।

আবার জ্বালা ক'রে উঠল বুকটা চিঠিগুলো দেখা মাত্রই। প্রবল উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল তার হাত। হাতের মুঠোর ভেতর চিঠির বাণ্ডিল। জ্বলন্ত সীসের মত লাগল যেন। একবার মনে

হ'ল দেখতে হবে কি আছে ওদের মধ্যে, অমিতাভের মনটাকে পরিষ্কার ভাবে দেখতে চায় ও, সে মন ধরা আছে এই চিঠি গুলোরই মধ্যে। মনস্থির করে বাণ্ডিলটা খুলে ফেলল। তারপর এক এক করে সবগুলোই পড়ে ফেলল।

পড়তে পড়তে সমস্ত ভেতরটা কাঁপতে লাগল তার। সব চিঠিতে ছড়ান অমিতাভর মনের উত্তপ্ত ভালবাসা। যে উত্তাপের খবর টুক্‌লা এখনও পায়নি, হয়তো কোনদিনও পাবেনা। এই তো! এত জানে অমিতাভ, শুধু ভালবাসতে নয়, ভালবেসে কাঙাল হ'তে, ভালবেসে দুঃখ পেতে, ভালবেসে সমর্পণ করতে; তবে? টুক্‌লা এ অমিতাভকে চেনেনা, জানেনা, এ অমিতাভ টুক্‌লার স্বামী নয় তার জীবনমরণের সাথী নয়। এই অজানা প্রেমিকের জন্য প্রবল ঘৃনার সঙ্গে একটা অসহ্য যন্ত্রনার প্রবল পীড়া তার সমস্ত অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ওর অবশ হাত থেকে চিঠিগুলো পড়ে যায়। মাটীতে ওর দেহও যেন এলিয়ে পড়ে। কি করবে? এ কোন অনুভূতি তার জন্য অপেক্ষা করছিল। চোখ দুটো জ্বালা করছে, জল আসছেনা, মরুভূমির মত যেন শুকিয়ে গেছে, সমস্ত গা মাথা জ্বালা করছে। ঠকে গেছে, নিদারুণ ভাবে ঠকে গেছে টুক্‌লা। আশ্চর্য আর সেই বঞ্চনা করেছে তাকে তারই পরমাত্মীয়, সবথেকে প্রিয়জন ...যে তার স্বামী।

অনেকক্ষণ পরে উঠে আস্তে আস্তে চিঠি গুলো তুলে গুছিয়ে রাখল। এ কোন জগতে এসে পড়ল টুক্‌লা। কি করবে সে, কাকে বলবে সে, কে তার আপন? বাইরের খোলসকেই সে শুধু আসল ব'লে জেনে নিয়ে আনন্দ পেয়েছে এতদিন। একবার মনে হ'ল, সে শিক্ষিতা মেয়ে, অমিতাভর ব্যক্তিগত জীবনের গোপন অন্তঃপুরে ওরই অজান্তে এভাবে ঢোকা অন্যায় বোধহয়। পরক্ষণেই মনে হ'ল সে অমিতাভর স্ত্রী। সব অধিকার আছে তার, স্ত্রীকে লুকিয়ে স্বামীর কোন আলাদা ব্যক্তিগত জীবন থাকতে পারেনা,

যেমন স্ত্রীরও। কিন্তু কার কাছে জানাবে সে দাবী ? স্বামীর কাছে? কার স্বামী ? অসহ্য জ্বালায় জ্বলতে লাগল টুক্‌লা। আর নয়, আর সহ্য করতে পারেনা। চিঠিগুলো তুলে রেখে ডালাটা সশব্দে বন্ধ ক'রে দিল টুক্‌লা।

বুকের ভেতটা যন্ত্রনায় টনটন্ করছে। ও জানতনা মনের কষ্ট দেহেও এভাবে রূপ নেয়। কেন এমন হল ? টুক্‌লার কেন এমন হ'ল ? ও তো কাউকে ঠকাতে চায়নি। ও তো কিছু গোপনতার আশ্রয় নেয়নি ! তবে ? ওকে কেন এমন ঠকতে হ'ল।

অনেক রাত ক'রে ফিরল অমিতাভ। যেমন প্রায়ই হয়। অনেক রাতে ফিরে ও টুক্‌লার সঙ্গে কথাও বলেনা। আজও তাই হ'ল। বাইরে খেয়ে এসেছে বলে শুয়ে পড়ল। তারপর নিমেষের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল।

ওর ঘুমন্ত দেহের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ঘৃনা হ'ল টুক্‌লার। নিজের মনকে শাসন করতে চাইল টুক্‌লা, স্বামীকে সে ঘৃণা করতে পারেনা। উচিত নয়, কি আর এমন ? ঘরে ঘরে যা হচ্ছে, স্বামীর একটা এ্যাফেয়ার ছিল। পূর্ব প্রণয়ে দিশাহারা হ'লে এখনকার দিনে চলেনা। কিন্তু যুক্তি বিচার সব যেন ভেসে গেল। খাটের ওপর অমিতাভর সুন্দর ঘুমন্ত দেহের দিকে তাকিয়ে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই অনুভব করতে পারলনা টুক্‌লা।

সারারাত ও ঘুমোতে পারলনা। চিঠিগুলো, অমিতাভর প্রতিটি আবেগের প্রকাশভঙ্গী তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। খোলা জানলা দিয়ে তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে তার চোখ দুটো হঠাৎ জলে ভরে এল।

সকালে উঠে দাড়ি কামাতে কামাতে মিষ্টি করে ওর দিকে তাকিয়ে হাসল অমিতাভ ; ওর চোখের দিকে তাকাতে পারলনা টুকৃলা। অমিতাভর লজ্জা নেই হয়ত, কিন্তু টুকৃলার আছে। অমিতাভর জন্য তার নিজেরই লজ্জা করতে লাগল। দয়া হল ওর ওপর। জানেও না, বুঝে গেছে টুকৃলা ওর আসল রূপ।

কি ব্যাপার? হঠাৎ বয়স বাড়াবার তালে আছ নাকি? আমার সেই আদুরে পত্নীটিকে আর যেন খুজে পাচ্ছিনা, খুব গুরুগম্ভীর।

অবাক হ'য়ে গেল টুকৃলা। এসব লোকদের লজ্জাও নেই নাকি? এত সহজে এরা সবকিছুকে গ্রহণ করে? নিজেদের নির্লজ্জতাও।

কি ব্যাপার? মৌন নিয়েছ নাকি? কথা বলছ না যে? কি গো হৃদয়েশ্বরী?

হৃদয়েশ্বরী! এই সব কথাই কি কত ভাবে বলেনি অমিতাভ সবিতাকে। আগে জানতনা এখন জানে অমিতাভর প্রতিটি আদর প্রতিটি কথা, প্রতিটি সোহাগের ডাক সব আগে আর একজনকে বলেছে, সব সব। ওর কাছে কিছু নতুন নয়, সব রুটিনে বাঁধা অভ্যস্ত। চিঠিতে জেনেছে ও, দীর্ঘ সাত বছরের প্রেম ওদের, স্বামী স্ত্রীর মত ঘনিষ্ট সম্পর্ক, কেন শেষ অবধি হ'লনা তা টুকৃলা জানেনা তার আভাস চিঠিতে নেই। হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে নাকি সবিতা? জিজ্ঞেস করবার অদম্য ইচ্ছেটাকে সংযত ক'রে অমিতাভর খাওয়া চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এ কয় মাসে ও বেশ বুঝেছে অমিতাভ সেবা চায়। স্ত্রীর হাতের নিরলস সেবা। তাতেই বোধহয় সে অভ্যস্ত। কিন্তু কার হাতের সেবায়? যে স্ত্রী হ'তে না পেরেও তার মনে স্ত্রীর বেশী আসন পেতে বসল তার? থাকত নাকি তারা একসঙ্গে? প্রশ্ন করবে কাকে?

তারপর ? তারপর আর তারা একসঙ্গে থাকতে পারবে কি ? কাচের দেওয়ালের দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে তারা, কোন আঘাত তো সহ্য হবেনা তাদের। তার থেকে এই ভাল। যতটুকু জেনেছে ততটুকুই ভাল। বাকাটুকু থাক অজানার অতল অন্ধকারে। তলিয়ে যাক্ সে দুঃখের পসরা টুক্‌লার অজ্ঞানতার গভীর পাতালে। তাকে আর তুলে আনতে চায়না। পারবে না সে সহ্য করতে।

রীতিমত অবাক হয়ে গেল অমিতাভ। প্রশ্ন ক'রেও উত্তর পায় না। এ টুক্‌লা যেন অন্য আর কেউ। বেশী প্রশ্ন করা তার স্বভাবেও নেই, সময়ও নেই তার। অনেক গুলো অর্ডার আছে ছবির, শেষ করতে হবে। টুক্‌লা না বোঝে তো সে নিরুপায়।

যখন অমিতাভ হাল ছেড়ে দিল তখন টুক্‌লা ছিঁড়ে যাওয়া রাশ আবার ধরতে চাইল যেন। এতদিন নিজের মনে যুদ্ধ ক'রে ক্ষত বিক্ষত হ'য়েছে সে। আর পারেনা, অথচ অমিতাভর আগ্রহ যেন ফুরিয়ে গেছে। নিজেকে বেশী মূল্য দিয়ে ফেলেছিল টুক্‌লা অমিতাভ তাকেঅত মূল্যবান মনে করেনা বোধহয়, তা না হলে একেবারে গুটিয়ে নিয়ে প্রায় ষ্টুডিও ঘরেই নিজেকে বন্দী ক'রে ফেলবে কেন ?

প্রায় সপ্তাহ খানেক কেটে গেছে। পারেনা আর টুক্‌লা। কার ওপর রাগ অভিমান করবে ? সে কি লক্ষ্য করছে এসব ? নিজেকেই কি বেশী ক'রে শাস্তি দিচ্ছে না ?

শনিবার দুপুর থেকে দেখতে পাচ্ছেনা অমিতাভকে, গেল কোথায় ? ষ্টুডিও ঘরে তালাবন্ধ বাইরে থেকে। ব্যাপার কি ? তাহলে বেরিয়ে গেছে নাকি ?

আবার সেই পাগলামটা টুক্‌লাকে পেয়ে বসল যেন। দেখবে, পড়বে, আবার চিঠিগুলো। দরজায় কাছে গিয়ে হাত দিয়ে ঠেলতেই

তালা খুলে গেল। একটি কড়ায় তালা এমনিই লাগান ছিল। ও লক্ষ্য করেনি।

ঘরের ভেতর প্রায় অন্ধকার। আস্তে আস্তে দরজা খুলে ঘরে ঢুকতেই একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। অমিতাভ........কোথাও যায়নি। আলগা করে তালা বাইরে লাগিয়ে দরজা ভেজিয়ে রেখেছে। কেন? এর অর্থ কি?

ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখল টুকুলা। সামনে রাখা বোতলটা প্রায় শেষ। আরও আছে একটা। আর ডিভানে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় অমিতাভ। হাতে একটা গ্লাস ধরা আছে। পড়ে যাচ্ছিল প্রায় টুকুলা। দরজায় হাত রেখে নিজেকে সামলে নিল সে।

কে!

ওর দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল অমিতাভ।

আমি!

উঠে পড়তে চেষ্টা করল অমিতাভ।

তুমি হঠাৎ? এখানে? এসময়ে?·····

কি করছ তুমি? এসব কেন খাচ্ছ?

প্রায় আর্তনাদ করে উঠল টুকুলা।

কি এসে যায় তোমার?

তার মানে? আমার ছাড়া আর কার আসে যায়? না না··· ওগো আমায় এ ভাবে শাস্তি দিওনা তুমি! প্লিজ।···

ওকে প্রায় ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল টুকুলা। ওর হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে নেবার চেষ্টা করল।

নাঃ ছুঁওনা। এখানে হাত দিতে পারবেনা। আমায় শান্তিতে থাকতে দাও।

খুব গম্ভীর গলা অমিতাভর।

কিন্তু টুকুলা ভ্রূক্ষেপ করলনা। অসম্ভব উত্তেজিত ও,

তুমি···তুমি ড্রিঙ্ক কর? আমি....

ঠোঁট কাঁপছে টুক্‌লার। কত সহ্য করতে পারবে আর ও?

হ্যাঁ করিই তো। বেশ করি। আমি কি ভয় পাই কাউকে যে লুকোব?

জোরের সঙ্গে বলল অমিতাভ।

না ভয় পাওনা! কিন্তু লুকিয়েছ তো আমায় তবু!···আমি তো কোনদিনও জানিনা···ভাবতে পারিনি···

আমার কি জান তুমি?

সব জানি তোমার···সব, সব···তুমি...তুমি....তুমি সবিতাকে ভালবাস....আমাকে তাই ভালবাসতে পারনি।....তাই আমি···

কথা শেষ করতে পারেনা টুক্‌লা। অসহ্য কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

সমস্ত নেশা ছুটে যায় যেন অমিতাভর। এর থেকে আশ্চর্য হবার আর কি থাকতে পারে? টুক্‌লার মুখে সবিতার নাম? কি করে সম্ভব হ'ল? ডিভানের ওপরই সে উঠে বসে। তারপর বিস্ফারিত চোখে সে চেয়ে থাকে রোরুদ্যমানা টুক্‌লার কম্পিত দেহের দিকে।

কেঁদে চলে টুক্‌লা। অসহ্য ব্যথায়, যন্ত্রণায় সে কেঁদে যায়, আর তার কান্না যেন ছড়িয়ে পড়ে, সারা ঘরে। অমিতাভর মনে হ'ল এ কান্না যেন সমস্ত বাঁধ ভেঙ্গে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। তার সারা জীবনেও বুঝি এ কান্না থামবেনা। এ কান্না থেকে বুঝি অমিতাভর আর নিষ্কৃতি নেই।

আস্তে আস্তে ডিভান ছেড়ে সে উঠে এল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে এল সে টুক্‌লার পাশে, মেঝের ওপর পড়ে যেখানে ফুলে ফুলে কাঁদছিল টুক্‌লা।

শোন্। শুনছ?

টুক্‌লা শুনবেনা। কোন কথা আর তার শোনার নেই। সব কথা ওর জানা হয়ে গেছে। নতুন করে কি আর শুনবে ও?

শোন তোমায় শুনতেই হবে!

ওর মুখটা তুলে ধরল অমিতাভ।

আমি কতগুলো কথা তোমায় বলতে চাই সেগুলি তোমার শোনা দরকার।

না না। দয়া কর আমাকে। আমি আর সহ্য করতে পারবনা।

তোমায় সহ্য করতেই হবে। সুতরাং যা সহ্য করতেই হবে, যা জানতেই হবে, সেটুকু এখনই তোমার জানা দরকার।

অসম্ভব নির্দয় মনে হোল অমিতাভকে। ওর কি হৃদয় ব'লে কোন পদার্থ নেই? কি দিয়ে গড়া ও?

তুমি কি?

অমিতাভরই কোলে মুখ রাখল টুকুলা।

আস্তে আস্তে সব ঘটনা ওকে বলে গেল অমিতাভ। কেমন করে সবিতার সঙ্গে আলাপ হ'ল ওর ছাত্রাবস্থায়, কেমন করে তাদের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠল। তারপর কাটল তাদের কত মধুর দিন, পদ্মের পাপড়ির মত একটি একটি করে দিনগুলি তাদের সামনে নিজেদের মেলে ধরল। কিন্তু কি হ'ল সবিতার শেষকালে কে জানে। বিয়ের সব ঠিকই তো ছিল। ও জানিয়ে দিল অমিতাভকে, যে বিয়ে করা তার দ্বারা আর সম্ভব নয়। অমিতাভকে তো নয়ই! আর, আরও ধনী এক ছেলেকে সে বিয়ে করবে। যাতে সে জীবনে সত্যিই সুখী হ'তে পারবে। হ্যাঁ সবিতা নিজেই তাকে জানিয়েছিল সে কথা। অবশ্যই তার ভুল হয়েছিল সবিতাকে বুঝতে। কিন্তু....

তারপর?

তারপর আর কি? অমিতাভ আগেই মনস্থির ক'রে ফেলেছে ও শাস্তি দেবে সবিতাকে। ও বিয়ে করবে। অবশ্য তার আগে ও অনেক চেষ্টা করেছিল সবিতাকে ফেরাবার, কিন্তু বম্বেতে চাকরি নিয়ে চলে গেছে সবিতা, সব সম্পর্ক কাটিয়ে। বিয়ে করার কথাটা যে বাজে, সেটা অমিতাভ বুঝেছে ওর নিজের বিয়ের পরে।

তাহলে সবিতাকে শাস্তি দিতেই ও টুক্‌লাকে বিয়ে ক'রে দিচ্ছে? সমস্ত বুকটা আবার জ্বলে ওঠে টুক্‌লার।

না তা নয়। ও নিজেও শাস্তি পেতে চেয়েছে। একটি নিশ্চিন্ত নির্ভয় গৃহ কোণ। সেখানে ও মনের আনন্দে ছবি আঁকবে আর স্ত্রীর সেবাযত্নে ভরে থাকবে। যদিও সে জানে যাকে সে বিয়ে করছে সে সবিতা নয়, তবু চেষ্টা করবে তাকে গড়ে নিতে।

অমিতাভর বেদনায় কখন নিজের বেদনা ভুলে গিয়েছে টুক্‌লা। এত কষ্ট পেয়েছে লোকটা? উপন্যাসের মত মনে হয়? আহা কেউ বোঝেনি একে, টুক্‌লা সে ভার নেবে। ও অমিতাভর সব দুঃখ, হারানর ব্যথা, মুছিয়ে দেবে ভুলিয়ে দেবে ওর চোখের জল তার হাসি দিয়ে। পারবে না সে? পারতেই হবে তাকে। তাছাড়া কে বুঝবে অমিতাভকে? কোথা থেকে আশার আলো দেখতে পেল সে, একটা জয়ের আলোও। একজন মেয়ে নির্বুদ্ধিতায় তার প্রতিভাবান স্বামীকে বুঝতে পারেনি, কিন্তু টুক্‌লা তো বোকা নয়। সে বুদ্ধিমতী, হৃদয়বতী, অমিতাভকে ভালবেসে, তাকে সুখী করে তার জন্য ত্যাগ করে সে দেখিয়ে দেবে সবিতার থেকে মেয়ে হিসেবে ও কত বড়।

কিন্তু কাজটা যত সহজ ভেবেছিল ততো সহজ যেন হ'লনা। সে রাত্রের পর আবার টুক্‌লা যেন নতুন করে বেঁচে উঠল। "নূতন করিয়া লহ আরবার চির পুরাতন মোরে" অমিতাভর এ কামনাকে সে উপেক্ষা করতে পারে না। সে যে ভালবাসে অমিতাভকে। বার বার মনে করতে চেষ্টা করল টুক্‌লা, যা ঘটে গেছে তা তো গেছেই, সে তো অতীত, মৃত, তাকে বর্তমানে কল্পনায় এনে নিজেকে দুঃখ দিয়ে লাভ কি? নিজের মনকে বোঝাল টুক্‌লা।

ওদিকন্তু অমিতাভর ব্যবহার যেন ক্রমশই অন্য রকম হ'তে লাগল। যে মানুষ সেদিন অত গভীর রাত অবধি পরম স্নেহপ্রেমে টুক্‌লাকে নিজের ব্যর্থ প্রেমের কথা, নিজের মনোযন্ত্রণার কথা, নিজের আকাঙ্ক্ষার কথা একে একে বলেছে, সে যেন অন্য মানুষ। তাকে টুক্‌লা আর যেন খুঁজে পাচ্ছে না। সে রাত্রে দুঃখের ভেতর দিয়ে তারা বড় কাছাকাছি এসেছিল, আর কি তেমন পারেনা? টুক্‌লা তো সব মেনে নিয়েছে, ও তো সব কিছুর জন্যই নিজেকে প্রস্তুত করেছে, তবে? আরও কি চায় অমিতাভ? কি ভাবে আর সুখী করতে পারে অমিতাভকে টুক্‌লা?

জানেনা, অমিতাভ বোধহয় নিজেই জানেনা ও কি চায় টুক্‌লার কাছে, নাহলে তার সব কিছুতেই এত বিরক্তি আসবে কেন অমিতাভর?

আমি বুঝতে পারিনা তুমি কি চাও!

বুঝতে চেষ্টা করলেই পারবে।

তোমার কি মনে হয় চেষ্টা আমি করিনা? আর আমারই কি খুব সুখ এভাবে দিবারাত্র ঝগড়াঝাটি করতে?

তা জানিনা। কিন্তু তোমার স্বভাব যে বদলায় না, কোনদিনও বদলাবে না ব'লে যে প্রতিজ্ঞা ক'রে বসে আছ কিনা। কি জেদ!

অমন ক'রে বল কেন? আমার ভেতর কি জেদ দেখলে?

ন্যাকাম ক'রনা। আচ্ছা যাও এখন আঁকতে দাও আমায়, বিরক্ত ক'রনা।

আমি দাঁড়িয়ে থাকি তুমি আঁকনা নিজের মনে, কে বারণ কচ্ছে?

নাঃ—

প্রায় ধমক দিয়ে উঠল অমিতাভ।

আস্তে আস্তে সরে এসে খোলা জানলায় দাঁড়াল টুক্‌লা। শরতের নীল আকাশে সাদা সাদা রাশি রাশি মেঘ উড়ে যাচ্ছে।

সে পারেনা অমনি নিরুদ্বেগে ভেসে যেতে যেখানে সেখানে? ছোটবেলায় তো পারত। মনে পড়ল তার পার্কের কথা, বন্ধুদের কথা। কি সব উজ্জ্বল বিকেল, কত প্রাণোচ্ছল দিনগুলি তার। এখন তাকে সব থেকে প্রিয় বলে পরিচিত স্বামীর কাছে প্রায় প্রতিদিনই বকুনি খেয়ে দিন কাটাতে হয়। আজ তিন বছর তাদের বিয়ে হয়েছে, ক্রমশঃ বাড়ছে তিক্ততা। অথচ কি সুন্দর ছিল তার আগেকার দিনগুলি। মা বাবা দিদি সকলের স্নেহচ্ছায়ায় কেমন অমনি মেঘের মতই ভেসে বেড়াত টুকলা। এমনকি দিদিমাকেও কত স্নেহময়ী মনে হ'ল টুকলার। ওঁরা জানতেন এ পৃথিবীকে, এত কঠিনতা, এত নির্মমতা, এত তিক্ততায় ভরা ব'লে তাই, তো সাবধান করতেন তাকে বার বার। কিন্তু টুকলা তো বোঝেনি। সব তোলা ছিল তার জন্য। হঠাৎ সেই ফেলে আসা ছোটবেলার দিনগুলোর জন্য মন কেমন করতে লাগল তার।

জানলায় দাঁড়িয়ে কেন অতক্ষণ? কোন কাজ নেই বুঝি?

আঁকছে তো আঁকুক না। মন পড়ে আছে টুকলা কি করছে করছে তার ওপর। কোন উত্তর না দিয়ে দাঁড়িয়েই রইল টুকলা। কেমন যেন সত্যিই জেদ চেপে গেছে তার, সব সময়ই ভাল লাগেনা। তার হুকুম মত সব সময় চলতে হবে, এ কি রকম? সে স্ত্রী না? না—না, টুকলা জানে সেখানেও ফাঁকি পড়েছে। তাদের মাঝখানে সবিতা দাঁড়িয়ে আছে বাধার মত, চিরদিন দাঁড়িয়ে থাকবে, যতই অস্বীকার করুক না কেন অমিতাভ। এ বিষয়ে নিঃসংশয় টুকলা। কিন্তু কিই বা করতে পারে সে। বাধা পড়ে গেছে অদৃশ্য বন্ধনে। যত তার থেকে মুক্তি পেতে চায় তত যেন জড়িয়ে ধরে তাকে। এর থেকে তার আর নিষ্কৃতি নেই, অব্যাহতি নেই।

এই সময়ই বুঝতে পারল টুকলা, সে মা হ'তে চলেছে। শরীরের পরিবর্ত্তনেই শুধু নয়, তার মনের পরিবর্তনেই সে অবাক হ'ল সবথেকে বেশী। এক অদ্ভুত নম্রতা, কুণ্ঠা, আনন্দ তাকে ঘিরে

খরল। তাই আশ্রয় পেতে চাইল সে স্বামীরই কাছে। কিন্তু অমিতাভ যেন খবরটা শুনে তত খুশী হ'লনা।

যুদ্ধ শেষের সঙ্গে আমার আঁকারও অনেক আয় কমে গেছে, তা জান'ত।

তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক টুক্‌লা বুঝতে পারে না। যে শিশু-দেবতার আবির্ভাবের সম্ভাবনা হয়েছে তাকে বরণ করবার জন্য আজও কি অমিতাভ তার সমস্ত আড়াল ভেঙ্গে দিয়ে এগিয়ে আসবে না? সে সন্তান কি ওরও নয়? বেশ অমিতাভর কাছে অবাঞ্ছিত হলেও তার কাছে এ শিশু ভগবানের আশীর্বাদ।

কমে যাক্, আমি তার জন্য ভাবিনা।

ঠোঁট উল্টে, অনেকদিন বাদে ছোট খুকীটির মত স্বামীর বুকে মাথা রাখল টুক্‌লা।

কারণ তোমার চিন্তা করবার শক্তি নেই ব'লে, কিন্তু আমার তো না ভাবলে চলে না।

বেশ তুমিই ভাববে, তুমি তো···

সব সমস্যার শেষ করে দিতে চায় টুক্‌লা।

না না ব্যাপারটাকে এত সোজা ভেবনা। তাছাড়া···

কি তাছাড়া?

তাছাড়া জড়িয়ে পড়লাম আবার একটা···

স্তম্ভিত হ'য়ে গেল টুক্‌লা। জড়িয়ে পড়ল মানে? ও কি ছাড়াতে চেয়েছিল নাকি নিজেকে? তাই, তাই। অর্থ চিন্তা কিছু নয়! টুক্‌লা জানে তাদের খরচ তো আঁকার আয় থেকেই চলছেনা। তার জন্য পৈতৃক সম্পত্তি ও আছে। জমিদারী না থাকলেও কিছু সম্পত্তি তো আছেই। তাতেই চলে যাবে। স্বচ্ছল ভাবে না হ'তেও পারে। তাতে কি? দারিদ্র্যকে টুক্‌লা ভয় পায় না, দরিদ্র কি সুখী নয়?

কিন্তু অমিতাভকে বুঝতে পারেনা টুক্‌লা। কত সময় কত কথা

বলে দারিদ্র্য সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে আগের দিন রাত্রে, অমিতাভর
আসলে কি চায় তাহলে ও? যদি
তবে বিয়ে করেছিল কেন ও? শিল্পীদের টুক্‌লার কাছে। প্রায়
হয় নাকি? যারা প্রতিভাবান তারা কি চায় ছাড়াছাড়ি থাকেনি এক-
পারেনা টুক্‌লা। একটা ধাক্কা খেল যেন, প্রচণ্ড কলার অমিতাভর
যাচ্ছে বুঝে, সমস্ত জগত তার কাছে নতুন সুরে গান নে ভেবেছ.
তলিয়ে ভেবেছিল এই সে চায় কি না। আজ বুঝল শূন্যস্থান
চলেছে সে, এই তার পরম কামনার বস্তু ছিল এতদিন, স্বা তাভর
প্রেমকে সে ব্যাকুল দুহাতে ও ধরতে পারেনি, তার দেহের ম
তাকে বন্দী করে দিতে পেরেছে। একি কম তৃপ্তির কথা? ভেবেছিল
আর নিষ্কৃতি নেই অমিতাভর, তাকে এড়াতে পারে, কিন্তু তার নিজের
সন্তানকে? সে তো অমিতাভেরই পূর্ণজন্ম! তবে? জয়ের আনন্দে,
গর্বে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু আজ বুঝল, ভুল করেছে।
অমিতাভ চিরদিনই তেমনই দূরে থাকবে ওকে বাঁধতে পারেনি ও,
নিজেও না, তার সন্তানও পারবেনা। হঠাৎ হতাশায় যেন ভরে গেল
দেহ মন। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সে।

একি? হঠাৎ কান্না আরম্ভ করে দিলে কেন?

তুমি কেন···

কি? আমি কি করলাম?

তুমি তো খুসী হওনি···

ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল টুক্‌লা।

খুসী হইনি বলা ভুল, তবে বিব্রত বোধ করছি।

এ যেন প্রথম সন্তান সম্ভাবনায় গর্বিত স্বামীর সম্ভাষণ নয়, কোন ক্লাশ নিচ্ছেন শিক্ষক। এ শিক্ষককে টুক্‌লা ভয় পায়। তার কান্না থেমে গেল, তার চোখের জল আর পড়তে পারলনা যেন। উঠে বসল সে অনেকক্ষণ পর। নাঃ ছিঃ, নাই বা খুসী হল অমিতাভ! কি হয়েছে তাতে? টুক্‌লাকে তো ও কোনদিনই ভালবাসেনি?

ধরল। তাই আশ্রয় পেতে দিকে তাকিয়ে কি ভাবছিল

অমিতাভ যেন খবরটা শুনে̐য়ে স্তব্ধ হয়ে গেল টুকলা। এ মানুষ

যুদ্ধ শেষের সঙ্গে ...া জানেনা, এই তার স্বামী! তার সবথেকে

জান্‌ত। ...ন্তান টুক্‌লার দেহে মিশে আছে? দিনে

তার সঙ্গেও প্রাণ মন দিয়ে বেড়ে উঠবে টুক্‌লার দেহের

দেবতার ...মন ভয় পেল টুক্‌লা।

আজও —

না ... দিকে ফিরে ওর কাছে এগিয়ে এল অমিতাভ।

শোন, শুনছ! কান্নাকাটি করছ কেন? আমি খুসীই হয়েছি।

চাইনা তোমার খুসী হওয়া...

তুমি না চাইলেও হয়েছি। পাগলাম ক'র না। উঠে ব'স। কতগুলো জিনিষ ভাববার আছে; ছেলেমানুষি কর না।

উঠে বসল টুক্‌লা। সত্যিই ছেলেমানুষি করবে না। অভিমানে ঠোঁট ফুলে উঠলেও না। ওকে শক্ত হ'তে হবে। নির্মম পৃথিবী এ। বাস্তব জগতের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে ওকে।

আস্তে আস্তে ওকে বলল অমিতাভ সব কথা। বাপের বাড়ী যেতে হবে ওকে। এ অবস্থায় এখানে রাখা যায় না।

রাজী হল টুক্‌লা। কেউ নেই সেখানে, বুড়ো মানুষ প্রসন্নবাবু ছাড়া, আর মতির মা, কিন্তু সেই ভাল। ও তার আজন্ম পরিচিত স্নেহনীড়েই সুখে থাকবে। ও নিজেও বুঝছে, বড় বেশী ভাবপ্রবণ হয়ে যাচ্ছেও দিনদিন। যার ফলে কত সময়ে নিজেকে ছোট করেছে। যদিও একবার মনে হয়েছে, এ বাড়ীতেই থাকুক, তার ননদ এসেও থাকতে পারে। কিন্তু অমিতাভ বলেছে পছন্দ করে না ও এসব। মা নেই, উমা ভালই আছে দেশের বাড়ীতে। আবার ওসব ঝামেলার দরকার নেই; টুক্‌লা জানে, যা দরকার নেই, তা হওয়ার সম্ভাবনাও নেই অমিতাভর কাছে।

কিন্তু সপ্তাহখানেক বাদে যাবার আগের দিন রাত্রে, অমিতাভর কথা শুনে পাথর হয়ে গেল টুক্‌লা।

সে রাত্রি যেন মোহময়ী হ'য়ে এসেছিল টুক্‌লার কাছে। প্রায় তিনবছর হল বিয়ে হ'য়েছে তাদের, অথচ ছাড়াছাড়ি থাকেনি এক-দিনও। সম্ভব হয়নি। অমিতাভর প্রয়োজন আর টুক্‌লার অমিতাভর প্রতি ভালবাসা। ভালবাসাই কি? কতবার মনে মনে ভেবেছে, মনের কোন অবধি তলিয়ে দেখেছে, চমকে উঠেছে সেখানে শূন্যস্থান দেখে। সত্যিই কত সময়ে প্রবল ঘৃণা অনুভব করেছে—অমিতাভর জন্য, আবার পরক্ষণেই দ্বিগুণ টানে ফিরে গেছে অমিতাভেরই দিকে।

কাল ওর যাবার দিন। আজ রাত্রে ও যেন মন্ত্রোচ্চারণের মত বলে নিল নিজেকে, স্বামীর কাছে সম্পুর্ণ করে নিজেকে নিবেদন করে দেবে। কোন কথা কাটাকাটি বা তিক্ততার সৃষ্টি হ'তে দেবে না। ভরিয়ে দেবে স্বামীর মন বিচ্ছেদের পূর্ব রাত্রে।

কিন্তু বাধা পেল প্রথমেই।

ওর সাজ আর খোঁপায় ফুলের মালা দেখে হাসল অমিতাভ।

হঠাৎ সাজ কিসের?

সাজ কই? লালপেড়ে সাড়ী তো পরেছি মাত্র!

না না ঐসব ফুলের মালাটালা,

ইচ্ছে ক'রল তাই।

ভাল!

বালিশটা ঠিক ক'রে নিয়ে শুয়ে পড়ল অমিতাভ।

তোমার বুঝি ভাল লাগছে না দেখতে আমায়।

তাহলে তো ভাল করে দেখতে হয়। ঘরে আরও হাই পাওয়ারের বাল্‌ব দেওয়া উচিত ছিল।

যাও:—

গড়িয়ে পড়ল টুক্‌লা স্বামীর গায়। অমিতাভর সহজ কথায় ও সহজ হয় নিমেষে।

কিন্তু···

কি কিন্তু···বলনাগো।

কিছু না। শুনলে তুমি তো, আবার হয় তো···

না বল।

ভাবছিলাম সত্যি কথাটা তোমায় জানাই ভাল।

কি কথা।

এখন প্রায় বছরখানেক কিন্তু আর আমাদের দেখাশোনা হবে না?

কেন?

খুলে বলাই ভাল। তোমার চেহারা এখন ক্রমশঃ জঘন্য দেখাবে। সুতরাং আমি তোমাকে তখন আর দেখতে চাই না।

বলে কি? উন্মাদ নাকি? মা হ'তে যাচ্ছে সে, অমিতাভরই সন্তানের মা, আর তাকে দেখতে খারাপ লাগবে ওর শারীরিক পরিবর্তনের জন্য? সম্ভব নাকি? যুগ যুগ ধরে কি মেয়েরা মা হ'য়ে আসছে না? এর জন্য কারও স্বামী, ত্যাগ করে নাকি স্ত্রীকে? তবে?

ত্যাগ করবে নাকি আমাকে?

সাময়িকভাবে বলতে পার। আসলে তোমাকে এত তাড়াতাড়ি পাঠাবার উদ্দেশ্যও তাই। আই কাণ্ট ষ্ট্যাণ্ড। কি সাংঘাতিক ফিগার হবে তোমার।····ব্যাপার কি হল, আমি সৌন্দর্য ভালবাসি। দেহের বিকৃতি আমি সহ্য করতে পারি না।

বিকৃতি? এমন প্রলাপ কখনও শোনেনি টুক্‌লা। এই মুহূর্তে ওর মনে হল ছোটবেলা থেকে যত কথা ও বলেছিল সব মিথ্যে, ও মা হ'তেই চেয়েছিল। এই উন্মাদের বিকৃত রুচি নয়, মায়ের গর্বে গর্বিত হতেই চেয়েছিল সে, নিজের দেহে শিশু দেহের স্পন্দন অনুভব করতে চেয়েছিল। তার জন্য সে গর্বিত, সে সুখী।

হঠাৎ অমিতাভকে প্রচণ্ড ঘৃণায় ঠেলে ফেলে দিতে ইচ্ছে করল

তার। যে সম্ভাবনায় সে পুলকিত, যে শিশু দেবতার আবির্ভাবের জন্য সে সমস্ত দেহ মন দিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে, তারই জন্মদাতার এই মনের_কথা? কি বলবে সে। খাটের ওপাশে সরে গিয়ে আস্তে আস্তে খোঁপা থেকে মালাটা খুলে ফেলল। বেড্ সুইচ্ টিপে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে বালিশে মুখ গুঁজল।

ঘুমোলে নাকি?

সাড়া দিল না টুক্‌লা। চায় না সে আদর, চায় না কাউকে, অমিতাভকে। ভগবানের আশীর্বাদের মত যাকে পেয়েছে তাকেই একান্ত নিজস্ব, একেবারে আপন ক'রে নেবে, সেটুকুই তার যথেষ্ট। আর কিছু সে চাইবে না। অন্ততঃ এটুকুর জন্য কৃতজ্ঞ ও অমিতাভর কাছে। আজ বুঝতে পারছে, প্রথম সন্ধ্যায় হঠাৎ অমিতাভ, আবেগের স্রোতে সবিতার কথা বলেছিল কি ভাবে! কেমন করে ভোলাতে পারত, মন ভরাতে পারত কেমন করে, সে খুব বেশী লেখাপড়া না জানা সত্বেও। সারা জীবনটাকেই সে সুন্দরের ছোঁয়ায় কেমন ভাবে রাঙাতে পারত। কতবার এ কথা পরে ভেবেছে টুক্‌লা। প্রথম প্রথম চেষ্টা করেছে অন্যভাবে নিতে সমস্ত ব্যাপারটা, যত দিন গেছে, ভুলেই গেছে সে। কিন্তু যখনই আঘাত পেয়েছে অমিতাভর কাছে, কাঁটার মত খচখচ ক'রে বিঁধেছে তাকে এসব চিন্তা। আজ বারবার কেন জানে না, সেই অদেখা, অজানা সবিতা তাকে যন্ত্রণা দিতে লাগল।

অমিতাভ নিজেই ওকে পৌঁছে দিতে গেল। আর হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেল অশোকের সঙ্গে। ঠিক তেমন আছে অশোক, একটুও বদলায় নি।

ওদের গাড়ীটার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল অশোকের গাড়ী। ওদের দেখে সশব্দে ব্যাক করে পাশে দাঁড়াল। টুক্‌লাদের গাড়ীও ততক্ষণে থেমেছে।

অশোকবাবু !

অদ্ভুত করে হাসল অশোক।

আমি এ বাড়ীতে থাকছি আজ থেকে। আসুন না।

টুক্‌লা আবার প্রগল্‌ভা হ'য়ে উঠল যেন।

ওঃ তোমাদের আলাপ করিয়ে দি ! আমার স্বামী অমিতাভ বোস, আর আমার বন্ধু অশোক।

ওঃ, ইনিই সেই অশোক দি গ্রেট !

প্রায় ফিস ফিস ক'রে বলল অমিতাভ, মুখে বিদ্রূপের হাসি।

ততক্ষণে গাড়ী ঘুরিয়ে ওদের বাড়ীর দিকে যাত্রা করেছে অশোক।

টুক্‌লাকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে যাবার সময় অশোকই প্রস্তাব করল।

চলুন মিঃ বোস। আজকের প্রথম আলাপ। দুজনে গল্প করতে করতে বাড়ী ফেরা যাক্।

কি দরকার ছিল ? আমি তো ট্যাক্সিতেই ফিরতে পারতাম !

সে তো পারতেনই।

হেসে বলল অশোক।

কিন্তু বাহন যখন রয়েছে তাকে উপেক্ষা করা কি ভাল ? চলুন না।

ওকে কেমন জানি এড়াতে পারলনা অমিতাভ।

যাবার সময় বারবার বলে দিল টুক্‌লা আবার আসবার জন্য। সত্যি খুব খুসী হয়েছে ও এত দিনের পর অশোককে দেখে। কত খোঁজ করেছে ও সব বন্ধুদের কাছে। পাত্তা পায়নি অশোকের। শুধু এটুকু জেনেছিল, শত চেষ্টাতেও আরতির সঙ্গে বিয়ে দিতে পারা যায়নি। অশোক নাকি ফেরার হয়েছে। হাসি পেয়েছিল

টুক্লার। চেনে তো অশোককে ? কিন্তু প্রথমে ভেবেছিল বেচারা আরতিও বোধ হয় সত্যি ভালবেসেছিল অশোককে। কিন্তু সে ভুলও ভাঙ্গতে দেরী হয়নি। মার্কেটে একদিন দেখা হয়ে গিয়েছিল আরতির সঙ্গে, সাজগোজ আর পেছনে বেয়ারার হাতে সদ্য কেনা একগাদা মাল পত্তরে হিম্‌সিম খাচ্ছিল আরতি। খুসীর উচ্ছাসে ভেঙ্গে পড়েছিল আরতি। আজ সে কথাও মনে হল টুক্লার। আরতি বলেছিল ও নাকি জিতেছে অশোককে বিয়ে না করে। অশোকের ওপর ওর একটুও রাগ নেই। ও জিতেই গেছে। ওর স্বামীর মাইনে আরও বেশী, আর অশোকের মত একটি গাড়ীই ভরসা নয়, প্রায়ই মডেল বদলায় তার ইচ্ছে মত। অতএব টুক্লার মনে আর কোন সন্দেহ নিশ্চয়ই থাকা উচিত নয় আরতির উজ্জ্বল জীবনে। তাছাড়া অশোককে নাকি সত্যিই আরতির ভাল লাগতনা ভাল করে চেনবার পর। ভেতরে ভেতরে অশোক বোধহয় কম্যুনিষ্ট বা ঐরকম কিছু। নাহলে টীচারদের জন্য অত বাড়াবাড়ি দরদ ? থাক্ ওসব কথা, নিঃশেষে মন থেকে মুছে ফেলেছে আরতি।

টুকলা তারপরই আবার অশোকের কথা মনে করেছে নতুন করে। ভাল ছেলে সে। বড় হৃদয়বান। তবু খোঁজ পায়নি। অশোক ফেরার হয়েছিল।

সে কথাটাই হেসে হেসে জিজ্ঞেস করল টুক্লা অশোককে।

আবার ফেরার হবেন না তো ?

ওর দিকে গভীর চোখে তাকাল অশোক।

ফেরার হ'য়ে ছিলাম কে বলল ?

আপনি খোঁজ না রাখলেও আমি সব রাখি জানেন ?

তাহলে একথা বলতেন না। অফিসের কাজে বছর খানেকের জন্য জার্মানি যেতে হয়েছিল।

ওমা তাই নাকি ? কি মজা। অন্য সব দেশও ঘুরেছেন ?

হ্যাঁ। কন্টিনেন্টের প্রায় সব জায়গায়ই গেছি।

লণ্ডনে যাননি ?

হ্যাঁ। তিনমাস ওখানে ছিলাম।

আগে জানলে দিদির ঠিকানা দিতাম!

যদি বলি আপনার দিদির সঙ্গে আমার খুব বেশীই আলাপ হয়েছে।

ওমা তাই নাকি ?

প্রায় ছোটবেলার মত উজ্জ্বল হয়ে হেসে উঠল টুকলা।

অশোকবাবু, প্লিজ কালই আসুন, আপনার কাছে দিদির গল্প শুনব। আপনি এসেই কেন বলেননি ?

আপনাকে পেলাম কোথায় ?

যেন কত চেষ্টা করেছিলেন।

আপনি তার কি বুঝবেন ?

খুব আস্তে আস্তে যেন স্বগোতোক্তি করল অশোক।

আমাদের ঠিকানা জানতেন না ? কারও কাছে পেতে পারতেন না ?

ঠিকানা জানতাম, কিন্তু যাওয়া হয়নি।

কেন ?

ওর বড় বড় চোখ মেলে ধরল টুকলা।

টুকলার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল অশোক।

যাইনি, কেন না···

আচ্ছা শুনুন! আসুন না কাল। গল্প করা যাবে। বিয়ে করেছেন ? তাহলে বৌ নিয়ে আসুন।

বৌ নিয়ে ? আচ্ছা!

হেসে অমিতাভর দিকে ফিরে বলল অশোক।

চলুন যাওয়া যাক। কাল আপনাকেও তুলে নিয়ে আসব কি বলেন ?

নাঃ আমার সময় হবেনা, কাজ আছে।

কি কাজ তোমার ? আহা, এসনা কাল। বুঝলে ?

আছে কাজ। আসা সম্ভব নয়।

মনে পড়ল টুক্‌লার, সত্যিই তো অমিতাভ তো আর আসবে না। ছিঃ ছিঃ ও কেন আবার বলতে গেল।

আচ্ছা থাক।

ম্লান হয়ে গেল ওর মুখ। সেটি অশোকের দৃষ্টি এড়াল না।

আসুন না কেন মিঃ বোস কাল।

এবার অনুরোধ করল অমিতাভকে।

না।

জোর গলায় বলে, উঠে পড়ল অমিতাভ।

চলুন অশোকবাবু যাবেন এখনি ? না এখনও কিছুক্ষণ থাকবেন ?

স্ত্রীর দিকে তাকাল অমিতাভ।

আচ্ছা আজ যাই। চলি !

আসবেন কিন্তু কাল, ঠিক।

উজ্জ্বল চোখে অশোকের দিকে তাকাল টুক্‌লা।

নিশ্চয়ই !

হ্যাঁ হ্যাঁ আসবেন বই কি ! তোমার অত ব্যগ্র নিমন্ত্রণ কি কেউ উপেক্ষা করতে পারে ?

টুক্‌লাকে উত্তর দেবার সময় না দিয়ে, অশোকের পিছু পিছু গাড়ীতে উঠল অমিতাভ।

ভাবতেও পারেনি টুক্‌লা অশোক আসবেনা। কোথায় একটা বিশ্বাস ছিল তার এতদিন বাদে দেখা, নিশ্চয়ই অশোক আসবে, বিশেষ ক'রে সে অত ক'রে বলবার পর। কিন্তু অশোক এলনা। শুধু পরের দিন না, তার পরে পাঁচ ছমাসেও নয়।

টুকলা বড় নিঃসঙ্গ বোধ করল এখানে এসে. ওখানেও সে একা, কিন্তু অমিতাভ তো ছিল। হোক না সে উপস্থিতি উপেক্ষা দিয়ে ভরা, তবু ঝগড়া ভালবাসা মেশান দিনগুলি তো তাকে ভরিয়ে রেখেছিল। টুকলা অবাক হয়ে যায়, ওখানে থাকতে যে লোকটার জন্য মাঝে মাঝে ঘৃণাও অনুভব করত, তার নির্ম্মমতা আর আত্মকেন্দ্রিকতার জন্য, তার জন্যই এই মনকেমন করা পাগলাম কেন? বিশেষ করে আসবার আগের দিন রাত্রে যে ব্যবহার অমিতাভ করেছে, যে ভয়ঙ্কর সব কথা বলেছে তার পরও? কি দরকার? আস্তে আস্তে নিজেকে সরিয়ে নেবে টুকলা। এ তিনবছর তো অনেক চেষ্টা করল টুক্‌লা। মাঝে মাঝে ক্লান্তও লাগে বই কি। তাছাড়া ভগবান তো তাকে বঞ্চিত করেননি। অমিতাভর অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে অমূল্য সম্পদ সে পেতে যাচ্ছে তাই নিয়েই তো সে পূর্ণ হ'তে পারবে। তাই ভাল, সে আর কিছু চায়না, যা তার একান্ত নিজস্ব সেটুকুর ওপরই দাবী রাখবে সে. এখানে ওখানে আশ্রয় খোঁজার দরকার কি তার?

কিন্তু দিন তো কাটতে চায়না, তাই তার কৈশোর জীবনের অসমাপ্ত কাজকেই হাতে তুলে নিতে চাইল টুকলা। এমনিতে শরীর ভাল থাকায়, আর প্রসন্নবাবুর সঙ্গে গল্প করা ছাড়া অন্য কাজও না থাকায়, মোটামুটি তার হাতে প্রচণ্ড অবসর। এই অবসর টুকুকে কাজে লাগাতে চাইল টুকলা।

আবার গেল অনেকের বাড়ী। দেখা করল অনেকের সঙ্গে, যাতে তাদের সেই স্বল্পায়ু মহিলা সমিতিটাকে আবার নতুন ক'রে গড়ে তুলতে পারে। পৃথিবী তো দাঁড়িয়ে নেই, কত পরিবর্তন হয়েছে। ঠিক যেমনটি ছিল তিন চার বছর আগে, তেমনটি যেন কিছুই পেল না টুকলা। তাছাড়া যে টুক্‌লা তখন তার সমস্ত অপরিণত মনের কল্পনায় সমিতি গড়ে একটা মহৎ কিছু, একটা অসম্ভব কিছু করবার জন্য প্রস্তুত ছিল, সে টুক্‌লাও তো এখন নেই।

এই চারবছরে তার মনের ভেতরেও যে অনেক স্তরের প্রলেপ পড়ে গেছে, বোধহয় টুক্‌লা নিজেও তা জানতে পারেনি।

তার বাল্যবন্ধুদের ভেতর নমিতাকেই পেল সে। প্রচুর উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এল নমিতা। কিন্তু এ নমিতা সে নমিতা নয়, যে টুক্‌লার সব কাজেই সায় দিত আর টুক্‌লারই মত অদ্ভুত একটা প্রত্যাশায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠত যার মুখ।

তুই সব কাজে বড় বেশী ক'রে ভাবিস নমিতা।

না ব'লে পারলনা টুক্‌লা।

আগে তো তুই এমন ছিলিনা ?

আগে বুঝি তুইই এমন ছিলি ?

নিশ্চয়ই, আমার কিছু পরিবর্তন হয়নি। একথা জোর গলায় ব'লতে পারি।

হাজার জোর গলায় বললেও তা সত্যি নয় রে টুক্‌লা। তুই তুই নিজেও জানিস না তুই কত বদলে গেছিস। না বদলে পারবিনা। প্রকৃতির নিয়মই এই। সব কিছু বদলাচ্ছে, চলছে আর তুই স্থির, অনড় থাকবি, এ হ'তে পারে ?

রাত্রে শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ভেবেছে টুক্‌লা একথা। না ভেবে পারেনি। সত্যিই সে বদলেছে, অনেক বদলেছে, আগে হ'লে এই যে ছাড়া পেয়ে এখানে আসতে পারল এটুকুতেই আনন্দিত, সুখী হ'ত সে। অথচ এই স্বাধীনতা, এই ছাড়পত্র তাকে পীড়ন করছে প্রতিদিনই। তার মনটি কোথায় বাঁধা পড়ে গেছে। প্রতিমুহূর্তে সে অনুভব করছে, বেশ আছে অমিতাভ তাকে বাদ দিয়ে ? পাঁচছ'মাসেও একবারও আর কাছে না এসে। ঠিক কথা রেখেছে—সে প্রায় প্রতিদিনই ফোন করে কিন্তু আসে না। কি করতে পারে সে ? মরে যাচ্ছে টুক্‌লা তাকে দেখবার জন্য, তার উপেক্ষার সঙ্গে দেওয়া আদর-সোহাগের জন্য। সেটুকুও কি অনুভব করেনা অমিতাভ ? কি জানি বুঝতে পারেনা টুক্‌লা। হয়ত শিল্পী

ব'লে, হয়তো টুক্‌লার মতই সাধারণ রক্ত-মাংসে গড়া তার শরীর নয় ব'লে। শুধুই কি শরীর? মন নেই তার? দেহে মনে যে উদগ্র বাসনা তাকে পীড়ন করছে তার লেশমাত্র আভাষও কি অনুভব করেনা অমিতাভ? সেও করবে না। এই অদ্ভুত পরিবর্তনকে সে স্বীকার করবে না। একজন পুরুষ তার কাছে এত প্রাধান্য পাবে কেন? উপেক্ষা নয়, শুধু বার বার মনে পড়ে টুক্‌লার, কি হীনতার সঙ্গেই না কতদিন তাকে কাটাতে হয় ওখানে। বাড়ীর ঝি চাকর ছাড়া আর কি সে? তার সঙ্গে অমিতাভর সম্পর্ক শুধু সেবা-যত্নের। কোথায় সেই সম্মান, সেই অমৃতময় জীবন? যে জীবনের জন্য সে শিল্পী স্বামীকে তার হৃদয়ের সবটুকু পূজা দিতে প্রস্তুত ছিল? ফিরিয়ে নেবে এ অর্ঘ্য টুক্‌লা। অভিমান নয়, একটা প্রচণ্ড আত্মসম্মানবোধের তাগিদেই যেন সে আর অমিতাভর প্রেমের কাঙাল হয়ে থাকবে না।

মহিলা সমিতির কাজ নিয়ে সে মেতে উঠল। নমিতার এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা ছিল। সে এখন আর বালিকা নেই, মায়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তার সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে। বিয়ে সে করেনি, করবেও না কোনদিন, ডাক্তারি পড়ছে সে। এবার ফাইনাল ইয়ার—কিন্তু মায়ের বন্ধুদের গড়া "নার্সদের ইউনিয়ন"-এর সে একজন ভাল কর্মী। তার সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাল তারা। দু তিন মাসের মধ্যেই একটি সুন্দর সমিতি তারা গড়ে ফেলল টুক্‌লাদেরই বাড়ীতে আর তার কাজ-কর্মের পাকাপাকি খসড়াও হয়ে গেল। অবাক হ'য়ে দেখল টুক্‌লা তাকে বাড়ী বাড়ী ঘুরে কড়ামিষ্টি কথা শুনতে আর তত হোলনা। সত্যিকারের অনেক দুঃস্থ মেয়ে এসে জড় হ'ল তাঁদেরই গড়া সমিতির ছায়ায়। নিজেকেই অনেক ভাল লাগল টুক্‌লার। এ অভাবনীয় তৃপ্তি! কোথায় লুকিয়ে ছিল এত কাজের ক্ষেত্র আর তার মধ্যে এত পরিতৃপ্তি? তার ক্রমশঃ অপটু শরীরে সে নিপুণ ভাবে গড়ে তুলতে লাগল তাদের মহিলা সমিতিকে।

এই সময়েই যেন অশোকের আসবার সময় হ'ল।

সেদিন বিকেল থেকেই শরীরটা খারাপ ছিল তার। নিজেদের ঘরে শুয়ে শুয়ে দিদির সন্থ আসা চিঠিটা পড়ছিল সে। এই চিঠি তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। ক্রমশঃ দিদির চিঠিতে অন্য সুর বাজছে। সে দেশে ফিরতে চায়, ক্লান্তি এসেছে তার এই প্রাণহীন বিদেশ জীবনে। চোখে জল এসে গেছে টুক্‌লার, দিদির এ চিঠি পড়তে পড়তে। বেচারা, কত দূরে। বোনের কাছে চিঠিতে দুঃখ জানানো ছাড়া আর কিই বা সান্ত্বনা পেতে পারে সে? কেন সুবিনয়দা? সে কি আর পারছেনা তাকে ভরিয়ে রাখতে যেমনটি পেরেছিল এত বছর? তার পাশেই মনে পড়ল শান্তি বিকাশের সুখী জীবনের কথা। সব চিঠিতেই ও বুঝতে পারে তাদের মধুরতার মাত্রা চড়ছে দিনের পর দিন। সুখ আর শান্তির আনন্দে মগ্ন হয়ে আছে ওরা। অথচ অমিতা, তার দিদি? দিনের পর দিন তার চিঠিতে ব্যথার সুর ধ্বনিত হচ্ছে। কোথায় একটা দুঃখ তাকে পীড়ন করছে। মন খুলে সব লেখেও না চিঠিতে, কিন্তু নিজের জীবনের আলোয় সে দুঃখের রূপ স্পষ্ট ধরা পড়ে টুক্‌লার চোখে। জানেওনা দিদি, টুক্‌লাও যে এমনি। এমনি একটা হাহাকার তাকেও ঘিরে আছে। কাকে বলবে সে? তার স্বামী তাকে ভালবাসেনা, তাকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করতে পারেনি, সে তার প্রতিভাবান স্বামীর মনের নাগাল পায়নি, একথা জানাবে কাকে? সে লজ্জা কি টুক্‌লারই একান্ত নয়? তাই থাক, তার মনের গভীর কোণে জমা থাক ব্যর্থতার এই জ্বালা, কাউকে তা জানতে দেবে না টুক্‌লা, জানতে দিতে পারে না।

মতির মা খবর দিল। অশোক নামে একজন ভদ্দরনোক তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। যদিও মতির মা তাকে বলে দিয়েছে,

টুক্‌লা বিশেষ অসুস্থা, কিন্তু তাইতেই নাকি ভদ্দরনোক খবরটা নেবার জন্যে ব্যাকুল হ'য়েছেন বেশী।

কেমন লজ্জা করল টুক্‌লার। অনেকদিন বাদে অশোক এসেছে, দেখা করতেও ইচ্ছে করছে, মনের এই অবস্থায় বন্ধুর সঙ্গে হুটো কথা বলতে পারলে বেঁচেও যায়, তাছাড়া অশোক দিদির খবরও বলতে পারবে; কিন্তু নিজের চেহারার জন্য লজ্জা করল টুক্‌লার। মনে পড়ল অমিতাভর কথা। তার চেহারা নাকি বীভৎস। এতদিন বাদে অশোকের সামনে এইরকম চেহারা নিয়ে দাঁড়াতে সঙ্কোচ লাগল টুক্‌লার। পরক্ষণেই মনে হ'ল, সে মা হ'তে যাচ্ছে। পৃথিবীতে পবিত্রতম ডাকের সে অধিকারিণী হবে, তার লজ্জা কেন? এ তো স্বাভাবিক? হোক না তার চেহারা একটু অন্যরকম, কিন্তু আসন্ন মাতৃত্বের গৌরবে সে চেহারা কি লজ্জার বস্তু হ'তে পারে? বীভৎসর কথা তো ভাবাও পাপ।

টুক্‌লার মনের কথাই যেন অশোক বলল কতক্ষণ পরে।

"বাঃ—

লজ্জা পেল টুক্‌লা।

"আপনার চেহারার এমন একটা কমনীয় সুষমা এসেছে যে প্রশংসা না ক'রে পারা যায়না। সত্যি মেয়েদের এই মাতৃত্বের রূপের তুলনা হয় না।

টুক্‌লার মুখের দিকে সোজা তাকাল অশোক। বলে কি? মাতৃত্বের রূপ! তার মুখে একটা আলাদা সুষমা? কিসের? আসন্ন মাতৃত্বের? আর এরই জন্য না তার শিল্পী স্বামী তার কাছে না এসে তার কল্পনাকে নষ্ট না হ'তে দেবার প্রাণপণ প্রয়াস করছে? সত্যিই অবাক হ'ল টুক্‌লা। পুরুষদের চোখে তাহলে এইরূপ সবসময়ই বীভৎস নয়। অন্ততঃ সব পুরুষের চোখে নয়। তার স্বামীর চোখে শুধু? কেন? সে শিল্পী ব'লে? তার চোখ সৌন্দর্য্য ছাড়া আর কিছু সহ্য করতে পারেনা ব'লে? কিন্তু তাহলে?

আমি যদি শিল্পী হতাম আপনার মুখের একটা ছবি এঁকে ফেলতাম।

একজন শিল্পী হ'লে এ ছবি আঁকত আর একজন শিল্পী হ'য়ে এ ছবিকে ঘৃণা করে? এ কেমন ক'রে হয়? অশোক ঠিক বলছে তো? মনগড়া কথা বলে টুক্‌লাকে ভোলাছে না তো? ও কি জেনে ফেলেছে ঠিক এই ব্যাপারেই সে স্বামীর কাছ থেকে আঘাত পেয়েছে? কি ক'রে তা হবে? তাহলে? সত্যিই কি অশোকের ভাল লাগছে! বুঝতে পারেনা টুক্‌লা।

যাক্‌গে........

অন্য কথায় চলে এল তারা। অনেক গল্প, অনেক কথা, এত কথা যে জমা হয়ে ছিল তা টুক্‌লা জানতনা। কিন্তু দিদির এই অবস্থা, তাই সে বেচারা ফিরে আসতে চায়? কার কাছে আসবে সেই ভেবে ব্যাকুল হয়?

আপনার বাবা কি ওঁকে এখনও ক্ষমা করেননি?

অশোক অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর জিজ্ঞেস করল।

কি জানি বুঝতে পারিনা। আজ তো কত বছর হ'য়ে গেল। বাবা তো নামও করেন না। অমি অবশ্য যখনই বুঝি সব খবরই দিই। কিন্তু বাবার তো ঐ দুএকটি কথা। ভাল, সুখে থাকলেই ভাল....শরীর ভাল আছে তাহলে....এমনি ছাড়া ছাড়া। সুবিনয়দার নাম অবশ্য ভুলেও করেন না।

সত্যি কথা বলতে, আপনার দিদির অবস্থা দেখবার পর, আর সুবিনয়বাবুকে ঠিকমত চেনবার পর, আর আমারও আজ নাম করতে ইচ্ছে করছেনা!

সত্যি ভাবতেও পারি না সুবিনয়দা এই রকম।

আসল কি জানেন? যুদ্ধের পর অন্য কন্টিনেন্টের মেয়েরা অনেকে প্রবাসী হয়েছে খাস লণ্ডনে। ফলে সাধারণ ইংরেজ মেয়েদের উন্নাসিকতার আঘাতে আর ব্যথা পেতে হচ্ছেনা

টুক্‌লা বিশেষ অসুস্থা, কিন্তু তাইতেই নাকি ভদ্দরনোক খবরটা নেবার জন্যে ব্যাকুল হ'য়েছেন বেশী।

কেমন লজ্জা করল টুক্‌লার। অনেকদিন বাদে অশোক এসেছে, দেখা করতেও ইচ্ছে করছে, মনের এই অবস্থায় বন্ধুর সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারলে বেঁচেও যায়, তাছাড়া অশোক দিদির খবরও বলতে পারবে; কিন্তু নিজের চেহারার জন্য লজ্জা করল টুক্‌লার। মনে পড়ল অমিতাভর কথা। তার চেহারা নাকি বীভৎস। এতদিন বাদে অশোকের সামনে এইরকম চেহারা নিয়ে দাঁড়াতে সঙ্কোচ লাগল টুক্‌লার। পরক্ষণেই মনে হ'ল, সে মা হ'তে যাচ্ছে। পৃথিবীতে পবিত্রতম ডাকের সে অধিকারিণী হবে, তার লজ্জা কেন? এ তো স্বাভাবিক? হোক না তার চেহারা একটু অন্যরকম, কিন্তু আসন্ন মাতৃত্বের গৌরবে সে চেহারা কি লজ্জার বস্তু হ'তে পারে? বীভৎসর কথা তো ভাবাও পাপ।

টুক্‌লার মনের কথাই যেন অশোক বলল কতক্ষণ পরে।

"বাঃ—

লজ্জা পেল টুক্‌লা।

"আপনার চেহারার এমন একটা কমনীয় সুষমা এসেছে যে প্রশংসা না ক'রে পারা যায়না। সত্যি মেয়েদের এই মাতৃত্বের রূপের তুলনা হয় না।

টুক্‌লার মুখের দিকে সোজা তাকাল অশোক। বলে কি? মাতৃত্বের রূপ! তার মুখে একটা আলাদা সুষমা? কিসের? আসন্ন মাতৃত্বের? আর এরই জন্য না তার শিল্পী স্বামী তার কাছে না এসে তার কল্পনাকে নষ্ট না হ'তে দেবার প্রাণপণ প্রয়াস করছে? সত্যিই অবাক হ'ল টুক্‌লা। পুরুষদের চোখে তাহলে এইরূপ সবসময়ই বীভৎস নয়। অন্ততঃ সব পুরুষের চোখে নয়। তার স্বামীর চোখে শুধু? কেন? সে শিল্পী ব'লে? তার চোখ সৌন্দর্য্য ছাড়া আর কিছু সহ্য করতে পারেনা ব'লে? কিন্তু তাহলে?

আমি যদি শিল্পী হতাম আপনার মুখের একটা ছবি এঁকে ফেলতাম।

একজন শিল্পী হ'লে এ ছবি আঁকত আর একজন শিল্পী হ'য়ে এ ছবিকে ঘৃণা করে? এ কেমন ক'রে হয়? অশোক ঠিক বলছে তো? মনগড়া কথা বলে টুক্‌লাকে ভোলাছে না তো? ও কি জেনে ফেলেছে ঠিক এই ব্যাপারেই সে স্বামীর কাছ থেকে আঘাত পেয়েছে? কি ক'রে তা হবে? তাহলে? সত্যিই কি অশোকের ভাল লাগছে! বুঝতে পারেনা টুক্‌লা।

যাক্‌গে........

অন্য কথায় চলে এল তারা। অনেক গল্প, অনেক কথা, এত কথা যে জমা হয়ে ছিল তা টুক্‌লা জানতনা। কিন্তু দিদির এই অবস্থা, তাই সে বেচারা ফিরে আসতে চায়? কার কাছে আসবে সেই ভেবে ব্যাকুল হয়?

আপনার বাবা কি ওঁকে এখনও ক্ষমা করেননি?

অশোক অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর জিজ্ঞেস করল।

কি জানি বুঝতে পারিনা। আজ তো কত বছর হ'য়ে গেল। বাবা তো নামও করেন না। অমি অবশ্য যখনই বুঝি সব খবরই দিই। কিন্তু বাবার তো ঐ দুএকটি কথা। ভাল, সুখে থাকলেই ভাল....শরীর ভাল আছে তাহলে....এমনি ছাড়া ছাড়া। সুবিনয়দার নাম অবশ্য ভুলেও করেন না।

সত্যি কথা বলতে, আপনার দিদির অবস্থা দেখবার পর, আর সুবিনয়বাবুকে ঠিকমত চেনবার পর, আর আমারও আজ নাম করতে ইচ্ছে করছেনা!

সত্যি ভাবতেও পারি না সুবিনয়দা এই রকম।

আসল কি জানেন? যুদ্ধের পর অন্য কন্টিনেন্টের মেয়েরা অনেকে প্রবাসী হয়েছে খাস লণ্ডনে। ফলে সাধারণ ইংরেজ মেয়েদের উন্নাসিকতার আঘাতে আর ব্যথা পেতে হচ্ছেনা

সুবিনয়বাবুকে। অবশ্য এই ভদ্রমহিলাও সুবিনয়বাবুকে ঠিক ভালবাসেন ব'লে আমি মনে করিনা।

পারবেই না। আমার দিদির মত ভালবাসতে আর কে পারবে জগতে?

ওর জলভরা চোখের দিকে একবার তাকাল অশোক। তারপর প্রায় ফিস ফিস করে বলল অশোক,

সত্যিই আপনাদের বোনদের মত হৃদয়ের উত্তাপ বোধহয় খুব কম মেয়েদেরই থাকে।

চম্‌কে উঠল টুক্‌লা। উত্তাপের কোন খবর পেয়েছে অশোক? সে তার স্বামীকে এত ভালবাসে বলে? না তা নয়।

আপনাদের হৃদয় এমন ভাবে গড়া যে তারা এ জগতে ঠকতেই বাধ্য।

সবাই নয়! দিদি ঠকেছে বলে···

তাই হোক। ঈশ্বর করুন আপনাকে যেন ঠকতে না হয়। আমি তাহলে···

কি বলতে চায় অশোক? ও কি জেনে ফেলেছে টুক্‌লা নিদারুণ ভাবে ঠকে গেছে? ও যে স্বামীসৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী নয় তা কি জেনে ফেলেছে অশোক? কেমন করে?

অবশ্য আপনি যে সত্যিই সুখী আপনার মুখ দেখলেই তা বোঝা যায়।

অশোকের গলার স্বর অনেক হাল্কা। বাঁচা গেল। একটা নিঃশ্বাস ফেলল টুক্‌লা। অশোক জানেনা। বুঝতে পারেনি। কেউ জানেনা, কাউকে টুক্‌লা বুঝতে দেবেনা এ পরাজয়ের কাহিনী।

হ্যাঁ তা বলতে পারেন। ওসব ঝামেলা আমার নেই। স্বামীর ভালবাসা নিয়ে আমার মাথা ঘামাতে হয়না।

ধক্‌ ক'রে উঠল টুক্‌লার বুক। অনায়াসে এমন মিথ্যে কথা বলতে শিখল কোথা থেকে টুক্‌লা? তাকে মাথা ঘামাতে হয় না?

তার চিন্তা নেই? ঝামেলা নেই? তবে? কেন তার অতগুলো বিনিদ্র রাত জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কেটে যায়? কেন তাকে বারবার জীবনের অন্য সার্থকতর পথের কথা ভাবতে হয়? কেন? কেন? জীবনে পূর্ণতর হবার জন্য তার আকাঙ্খা কেন? যদি সে স্বামীর ভালবাসাতেই পূর্ণ থাকবে।

কিন্তু এ কথার কোন উত্তর তার মনের মধ্যে থেকে পায়না টুক্‌লা।

কথাটা ব'লেই ও অশোকের দিকে তাকায় একবার। অশোক ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সে দৃষ্টিতে অস্বস্তি বোধ করে টুক্‌লা। মনের একেবারে ভেতর অবধি দেখে নিতে চায় না কি অশোক? টুক্‌লার সব মিথ্যে কি ধরা পড়ে গেছে নাকি ওর কাছে? কথা বলছেনা কেন অশোক? এ স্তব্ধতা এ নীরবতা টুক্‌লা যে সহ্য করতে পারে না। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ পর কথা বলল অশোক।....

আজ চলি! আপনার সমিতির যে কথা বললেন, তাতে আমার অকুণ্ঠ সাহায্য এবার পাবেন। অবশ্যই যদি প্রয়োজন বোধ করেন।

নিশ্চয়ই। দরকার তো সব সময়ই হবে।

সহজ হ'তে চেষ্টা করল টুক্‌লা। অশোক ওর বন্ধু। সত্যিকারের বন্ধু। বিপদের সময় যে এসে দাঁড়িয়েছে, যে দাঁড়াবে।

টুক্‌লার মেয়ে হ'ল ছমাস পরে আর তারও তিন মাস বাদে অমিতাভ এল ফিরিয়ে নিয়ে যেতে টুক্‌লাকে।

অমিতাভ যখন এল তখন মেয়েকে দুধ খাওয়াচ্ছিল টুক্‌লা। লজ্জা লাগল ভারী, দীর্ঘদিন বাদেই এই প্রথম স্বামী সন্দর্শনে, কিন্তু নিজেই অবাক হয়ে গেল, যতটা উল্লসিত হবে ভেবেছিল অমিতাভকে

দেখে, ততটা হ'লনা। এই তার স্বামী? প্রায় দীর্ঘ একবছর যে তাকে না দেখে বেশ সুস্থ আর খুসী আছে? যার জন্য দিনের পর দিন রাতের পর রাত সে তার সমস্ত অন্তর দিয়ে, কামনা দিয়ে অপেক্ষা করেছে? নিজের মনেই যেন চমকে উঠল টুকলা। সত্যিই সে ঠিক আগের মতই কামনা করেছে অমিতাভকে, কতটুকু ভেবেছে সে অমিতাভকে? প্রথম কয়মাস ছাড়া? শেষের দিকে তার চিন্তা অমিতাভকে কেন্দ্র না ক'রেই কি বেশী থাকেনি? শুধু খুকুর জন্মের পরই যার কথা সবথেকে বেশী তার মনে হ'য়েছিল সে অমিতাভ। কতবার ভেবেছে সে, এইবার আসবে অমিতাভ। তার টানে না হ'ক মেয়ের টানে, তাছাড়া সেই স্ত্রীকে দেখতে যার চেহারা বীভৎস হ'য়ে আর শিল্পী মনকে পীড়া দেবেনা। কিন্তু টুকলা আর সেই সঙ্গে সকলে অবাক হয়ে গেছে জানতে পেরে, যে অমিতাভ রাজস্থানে গেছে বেড়াতে। নাকি সকলেই অবাক হয়েছে টুকলা ছাড়া। সেকি সত্যিই জানত যে অমিতাভ আসবেনা, খুকুর জন্মসংবাদ তাকে বিশেষ কোন আনন্দের আস্বাদন এনে দেবেনা?

আজ যখন খুকুকে দেখে খুসী হয়ে অমিতাভ কাছে এগিয়ে এল তখন মতির মা তাকে বাধা দিতে রীতিমত বিরক্ত হ'ল টুকলা। এসব আদিখ্যেতার কি প্রয়োজন?

সোনাদিয়ে মেয়ের মুখ দেখবে তো জামাইবাবু?

মতির মার কথায় রাগ হ'ল টুকলার।

সোনা দিয়ে? কি দরকার সে সোনার? সোনার কি মূল্য, যদি না তা পিতৃস্নেহে মণ্ডিত থাকে? অমিতাভ কি সোনার চেয়েও দামী স্নেহ ভালবাসা অনুভব করে তার মেয়ের জন্য? নিশ্চয়ই জানে টুকলা, তা নয়। তাই সজোরে প্রতিবাদ না করে পারল না।

কি হচ্ছে মতির মা? এসব আমি ভালবাসি না।

তুমি না ভালবাসলে কি হবে বাবু। জগতের ধারা তো পালটে যাবেনি।

কতটুকু জানে মতির মা এই জগতকে? জগতের ধারা তো বদলাচ্ছে, রোজই, প্রতি মুহূর্তে।

না না। এসব···

তুমি থামতো বাবু। জামাইবাবুর কাছে আমাদের দাবী দাওয়া নেই? একে তো এল এতদিন বাদে···ধন্যবাবা বাপের প্রাণ ··মেয়ে হ'ল কবে···আর এতদিন বাদে দেখতে এলে?

অমিতাভ লজ্জিত হ'ল খানিকটা, কিন্তু বাড়ীর পুরোন ঝিএর সেন্টিমেণ্ট বোঝবার মত তার অবসর নেই।

খুব ঘুরতে হ'ল জান।

টুক্‌লার আরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বলল। মেয়েকে ততক্ষণে তার ছোট্ট খাটে শুয়ে দিয়েছে টুক্‌লা। ঠিক অমিতাভর সামনে দুধ খাওয়াতে চাইল না সে। কে জানে এই একান্ত স্বাভাবিক জিনিষটাও ওর কাছে সাংঘাতিক অস্বাভাবিক লাগতে পারে। কিন্তু অমিতাভই আপত্তি করল।

আহা! ওকে আর খাওয়াবে না?

নাঃ—ঘুমোবে এখন ও।

ঘুমোতে ঘুমোতেই খাচ্ছিল খুকু। তার তুলতুলে লাল ঠোঁট দুটি তখনও নেড়ে চলল।

খুব ঘুরে এলে বুঝি?

অমিতাভরই কথার জের টানল টুক্‌লা।

হ্যাঁ। সারা রাজস্থান, অনেক রেয়ার কালেক্‌শান্ করেছি, অনেক পট।

আগেকার আঁকা পট?

টুক্‌লা কৌতূহলী হল।

সব কিছুই বহু আগেকার আঁকা নয় তবে আন্‌সফিস্‌টিকেটেড্ আঁকা বলতে পার। এখনও অনেক শিল্পী আছে যারা···

কি থামলে কেন?

নাঃ তোমাকে বলে কি হবে ?

কেন ?

কি বুঝবে তুমি ওসব ?

কি ক'রে জানলে বুঝব' না।

এ আর জানতে হয় না। তোমাকে যেদিন বিয়ে করেছি সেদিন থেকেই ধ'রে নিয়েছি ?

সেদিন থেকেই ধরে নিয়েছে ? যেদিন বিয়ে করেছে টুক্‌লাকে সবিতাকে না পেয়ে ? বুকটায় ধাক্কা লাগল। কিন্তু আজ যেন তেমন মোচড়ান যন্ত্রণা অনুভব করল না টুক্‌লা।

মানুষ তো নিজেকে ডেভেলাপ্‌ করতে পারে।

ওরে বাবা অনেক কথা শিখেছ দেখছি। গুরুটি কে ?

কোন উত্তর দিল না টুক্‌লা। আবার সেই সব। প্রায় এক বছর বাদে প্রথম স্বামী সম্ভাষণ বটে। কিছু বদ্‌লায়নি অমিতাভ, প্রায় দীর্ঘ একবছরের অদর্শন ওকে এক ফোঁটাও কোমল করতে পারেনি। তেমনি আছে, তার সমস্ত অস্ত্র শাণিত ক'রে টুক্‌লাকে আঘাত করবার জন্য তেমনি উদ্যত হয়ে আছে। একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল টুক্‌লার।

...যাক্‌ তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নাও। আমি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।

টুক্‌লার মুখে এল বলে যে এখন যাবে না, আরও কিছুদিন থাকবে। কিন্তু অমিতাভ একেবারে না আসায়, এমন কি মেয়ে হবার পরও একবার খোঁজ খবর না নেওয়ায়, পাড়া প্রতিবেশী, বন্ধু ঝি-চাকর সকলের চোখে যে নীরব প্রশ্ন ও দেখতে পেয়েছে সেটুকু মনে ক'রে ওকথা বলতে তার আর ইচ্ছে হ'ল না। তাছাড়া মনে মনে প্রসন্নবাবুও যে উদ্বিগ্ন হ'য়েছেন তা ও বেশ বুঝতে পেরেছে। সব দিক থেকে এখানে থাকার কথা এখন ভাবা উচিত নয়। সবকিছু

স্বাভাবিক রং নেবে ও অমিতাভর সঙ্গে ওর নিজের বাড়ীতে ফিরে গেলে।

নিজের বাড়ী। হাসি পেল টুক্‌লার। নিজের বাড়ীই বটে। সে বাড়ীর গৃহিণী সেই বটে, যদিও সে বাড়ীর গৃহকর্তা মনের কোণাতেও তাকে গৃহিণী ব'লে স্বীকার করেন না। একথা কোনদিন প্রকাশ করেনি অমিতাভ। কিন্তু বহুদিনই টুক্‌লার মন একথা বুঝে নিয়েছে। তবু চেষ্টা করেছে সে বারবার। প্রথমেই তার মন মেনে নিতে চায়নি, বিদ্রোহ করেছে, তাতে নিজেই ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। ধীরে ধীরে সবই মেনে নিয়েছে, তার স্বামীগৃহে এই অদ্ভুত অবস্থাকেও, স্বামীর মনে তার এই মিথ্যে আসনলাভেও, কিন্তু মনের গভীরে চালিয়ে দিতে চেয়েছে পরাজয়ের এই গ্লানিটুকুকে। শুধু বাইরের লোককে নয়, নিজেকেও প্রবঞ্চনা করতে চেয়েছে টুক্‌লা। ও সব নিয়ে না ভাবতে চেষ্টা করেছে। অন্যকিছু, অন্যকাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে চেয়েছে সে। তবু···

কদিন থেকে খুকুর শরীর ভাল যাচ্ছে না, সারারাত কাঁদছে মোটে ঘুমুচ্ছেনা, আর সেই সঙ্গে টুক্‌লাকেও ঘুমুতে দিচ্ছেনা।

ওকে থামাও তো ?

প্রায় ধমকে উঠেছে অমিতাভ পাশের ঘর থেকে।

এই এক জঞ্জাল এসেছে। বাবাঃ রাতে এক ফোঁটা ঘুমুতে দেবেনা।

সভয়ে বুকে আঁকড়ে ধরেছে টুক্‌লা খুকুকে। জঞ্জাল ? খুকু ওদের জঞ্জাল তাহলে ? কোথায় আর তার স্বর্গ ?

লক্ষ্মী মা আমার ঘুমোও।

কোল নাড়িয়ে নাড়িয়ে খুকুকে ঘুম পাড়াতে লাগল টুক্‌লা। কিন্তু খুকুর থামবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

খুকু, সোনা মা আমার, ঘুমোও।

ওর গালের সঙ্গে গাল লাগিয়ে ফিসফিস ক'রে বলল ও খুকুকে। জানে কাল সকালে না হ'লে কি অবস্থাই হবে ; সারারাত অমিতাভ না ঘুমুতে পারলে। কিন্তু খুকুতো অমিতাভকে জানেনা, জানেনা তার মেজাজ। সে জানে মাকে কেঁদে বিরক্ত করতে, মায়ের কাছে আবদার করতে, সে মা ভুলেও বিরক্ত হবেনা, এই দেড় বছরেও যে মা একদিনও খুকুকে জঞ্জাল মনে করেনি।

চুপ চুপ খুকু ঘুমোয়। মামণি, বাবা ঘুমোতে পারছে না, বকবে তোমায়।

চলল এমনিকরে সারারাত অবুঝ খুকুকে নানা ভাবে বোঝাবার পালা।

ভোরে এসে সুবালা নিয়ে গেল খুকুকে। শান্তিতে ভোরবেলা একটু ঘুমোবার চেষ্টা করছিল টুক্‌লা, কানে এল অমিতাভর ভরা গলার আওয়াজ, মাঝে মাঝেই ভোরবেলা এমনি গলায় কথা বলে অমিতাভ। গলাটা অবশ্য পছন্দ টুকলার, কিন্তু কারণটা নয়। সাধারণতঃ রাতে পানের মাত্রা একটু বেশী হলে পরদিন ভোরে অমিতাভর গলা এমনি ধরা ধরা হয়।

নাঃ আর ঘুমের চেষ্টা করা বৃথা। উঠে পড়ল টুক্‌লা।

ব্যাপার কি? ভোরে ঘুমথেকে উঠেই এত চেঁচামেচি আরম্ভ করলে কেন?

ঘুমথেকে ওঠা মানে? রাতে তো তোমার মত ঘুমোতে পারিনি যে ভোরে বা বেলায় ওঠার প্রশ্ন উঠবে।

আমি ঘুমিয়েছি?

ন্যাচারালি। মায়ের লম্বা ঘুম না হ'লে মেয়ে এত কাঁদে?

অবাক হ'য়ে গেল টুকলা। বলে কি? সম্ভব নাকি কখনও? ঘরে এসে একবার দেখে যেতে পারল না?

কি বলছ পাগলের মত?

পাগল করে ছাড়লে আর পাগলের মত বলব না?

খেঁকিয়ে উঠল অমিতাভ। এ গুণও আগে ছিল না অমিতাভর। এবার এসে দেখতে পাচ্ছে। অসহ্য বিরক্তিতে ভরে থাকে সর্বক্ষণ অমিতাভ। রাতদিন চেঁচামিচি, কিছু পছন্দ হয়না তার। আগে তবু নীরব উপেক্ষা আর বিরক্তি। এখন তার উঁচু গলার চীৎকারে পাড়ার আর কারো জানতে বাকী থাকে না তাদের দাম্পত্য প্রেমের কতটুকু মেয়াদ।

সত্যিই এক এক সময় ভাবে টুকলা। কি ভেবে ছিল আর কি হ'ল তার জীবন। এর জন্য কোথায় তার অপরাধ? কি তার ত্রুটি? সত্যি সত্যি কি চায় সে টুকলার কাছে? মেয়ে হবার পর থেকে টুকলার নিজেরও শরীর ভাল যাচ্ছে না, কোনদিন কি

কাছে ডেকে সে কথা জিজ্ঞেস করেছে অমিতাভ? কতটুকু সম্বন্ধ তার টুকলার সঙ্গে? নেহাৎই জৈব প্রয়োজন ছাড়া? কিন্তু আর যেন সম্ভব হয় না। অথচ তার করারই বা কি আছে? তাই কিছুই না পেরে শুধু নিজেরই ওপর ঘৃণা তার বেড়ে যায়।

খুকুর আর সংসারের কাজ নিয়ে এত সময় যায় যে তারপর তাদের সমিতির কাজ করে একদণ্ড বিশ্রামের অবসর পায়না সে। সত্যি ভাবতেও পারেনি টুক্‌লা, তাদের মহিলা সমিতি এত বড় হ'য়ে উঠবে। সত্যি সত্যি তারা মেয়েদের জন্য কিছু করতে পারবে।

কত সভ্যা এখন তাদের। এ পাড়ায় ছাড়া, নমিতাদের বাড়ী, তার বাপের বাড়ীর পাড়াতেও ছুটো তাঁতের স্কুল বসেছে। নিজের বাড়ীতেই ইচ্ছে ছিল তার, কিন্তু কদিন চেষ্টা করেও সম্ভব হচ্ছে না।

অশোক তার বিরাট বাড়ীর অনেকটা অংশই ছেড়ে দিতে চায়, কিন্তু অবিবাহিত অশোকের বাড়ীতে কোন কেন্দ্র চালান টুক্‌লার পক্ষে সম্ভব হবে না। অথচ এই বাড়ীর অভাবেই শুধু দরিদ্র মেয়েদের জন্য একটা বয়স্কা শিক্ষার ক্লাশ খোলা যাচ্ছে না।

অমিতাভ পছন্দ করেনা এইসব বাইরের কাজ। অথচ ছুপুরে নিজে না ঘুমিয়ে যদি সে কারও কোন উপকারে লাগে তাহলে এতে ক্ষতিটা কি তা বুঝতে পারেনা টুক্‌লা। তাই অমিতাভের বিরক্তিটুকুকে যতদূর সম্ভব বাঁচিয়ে চলে ও নিজের মনেই কাজ করে যায়। কোথায় যেন জোর পায় ও, অমিতাভর প্রচণ্ড আপত্তিটুকুকেও আমল না দেওয়ার। আর সেই জোরেই এগিয়ে যায় সমিতির কাজ।

একটা কথা শুধু আপনাকে বলতে ইচ্ছে করে।....

অশোক সেদিন এসেই টুক্‌লার পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল।

বলে ফেলুন ইচ্ছে করলে।

যদিও সেকথাটা আপনি একবারও ভাবেন না।

কথা ? কি কথা টুক্‌লা ভাবেনা। অশোক কি টুক্‌লার মনের সবকথা জানে ? ধরা গলায় বলল টুক্‌লা।

ভূমিকা না ক'রে কথাটাই বলুন না।

আপনার শরীর ক'দিন থেকেই দেখছি ভাল যাচ্ছে না। এখন কি যথেষ্ট সময় হয়নি এদিকে দৃষ্টি দেবার ?

শরীর ভালই আছে আমার, তবে সত্যিই বড্ড রোগা হ'য়ে যাচ্ছি শুধু। দেখুন!

নিজের সাদা শীর্ণ হাতটা মেলে ধরল টুক্‌লা অশোকের সামনে। নিজেই অবাক হ'য়ে গেল যেন। অশোক না, তার নিজেরই দেখা দরকার। কি ছিল কি হ'য়েছে। স্বাস্থ্যোজ্জল, নিটোল হাত দুটির বদলে দুটি রক্তশূন্য শীর্ণ হাত কি তারই ? কোনদিন তো চোখে পড়েনি তার ?

ওর দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকাল অশোক।

আচ্ছা আপনিই বলুন, নিজের প্রতি আপনার কোন কর্তব্য নেই ?

আছে অশোকবাবু, কিন্তু সব কর্তব্যই তো আমরা করতে পারিনা।

পারা উচিত। অন্ততঃ সেটুকু মনের জোর শিক্ষিত লোকেদের থাকা দরকার।

তাহলে আপনার যা উচিত কাজ, তা করেন না কেন ?

কি বলতে চায় টুক্‌লা ? কি তার উচিত কাজ ? সে কি কোথাও তার সীমা ছাড়িয়ে গেছে ? রীতিমত ঘামতে লাগল অশোক।

হেসে উঠল টুক্‌লা।

বড্ড নার্ভাস হ'য়ে পড়েছেন অশোকবাবু। না, না, ভয় পাবার কিছু নেই। আমি আপনাকে এখনি বিয়ে করতে বলছিনা।

ওঃ বিয়ে করা উচিত। হাঁফ ছাড়ল অশোক।

আপনার বুঝি এখনও মনে হয় সকলেরই বিয়ে করা উচিত?
মাপ করবেন....আপনার কি মনে হয়না যে···

জানি অশোকবাবু কি বলতে চান। কিন্তু থাক্···আমার নিজের যা অভিজ্ঞতা যা দেখছি তাতে বোধহয় বিয়ে করার সপক্ষে কোন কথা আমার বলা সম্ভব নয়। তবু এটাই তো স্বাভাবিক। আর যা স্বাভাবিক তাই....

দেখুন! বিয়ে কখনই স্বাভাবিক নয়। আর আমার মনে হয় কারুরই বিয়ে করা উচিত নয়।....

বলেন কি? বিয়ে ক'রে কতলোক সুখী হচ্ছে। তা না হলে তো জগত অন্যরকম হয়ে যেত।

হঠাৎ নিজেরই কেমন লাগল টুক্‌লার। তার বিবাহিত জীবন এমন ব্যর্থ হবে এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র আভাষ না পেয়েও সে বিয়ের বিপক্ষেই আগে জোর গলায় তার মত জানিয়ে এসেছে। পরে অবশ্য মত বদলেছিল কিন্তু তখনও না জেনে। বিপক্ষে বা স্বপক্ষে সবই তো তার কল্পনা। কতটুকু জানত সে বিবাহিত জীবনের, কতটুকু বাস্তব বিবাহিত জীবনের আভাষ পাওয়া সম্ভব একজনের পক্ষে, যে সে জীবনে প্রবেশ করেনি? অথচ আশ্চর্য অভিমন্যুর মত প্রবেশ ক'রে আর বেরোবার পথ নেই, মরতে হবে তাকে এর ভেতরই। আইন নেই বলে নয়, নিজের মনই শত্রুতা করবে। যাকে সে ভালোবাসে, তারই প্রতীক্ষায় তাকে সারাজীবন অপেক্ষা করে থাকতে হবে। এক এক সময় অসহ্য মনে হয়। তবু আবার উঠে পড়ে সংসার চালাতে হয়। আবার যে চলা চাই, চেষ্টা করে হাসিখুসি ঝলমল্ থাকতে। সে যে মেয়ে হ'য়ে জন্মেছে। দিদিমার কথা মনে পড়ে। কত প্রতিবাদ করত সে। কিন্তু তখন কি জানত সে? সত্যিই সংসারে মেয়েদেরই মানিয়ে চলতে হবে। তার স্বামী, তাকে সে ছাড়তে পারেনা, তার থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না। রাহুর প্রেমের মত ওর হাত ছাড়ান টুক্‌লার পক্ষে অসম্ভব।

এ অত্যাচারীকে ছাড়ার কথা ভাবতেও পারেনা টুকলা। অথচ জীবনের তৃষ্ণা যেন হারিয়ে ফেলে।

সারাদিন কাজ করে সে, খুকুর কাজ, সংসারের কাজ, অমিতাভর কাজ, তাছাড়া সমিতির নানারকম কাজ তো আছেই। কিন্তু শুধু কাজেরই জন্য যদি কাজ করা যায় তার ভেতর কোন স্বার্থকতা, কোন তৃপ্তি পাওয়া সম্ভব কি করে? সমস্ত কিছুই শূন্য মনে হয়। এই বিরাট শূন্যতাবোধ, এই বিরাট ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা টুকলাকে রাত্রিদিন পীড়ন করে। অথচ কারো কাছে মনের এই গোপন অনুভূতি খুলে বলতেও পারে না। ভাবে শুধু ত্যাগের ভিতর দিয়েই বুঝি শান্তির সন্ধান পাওয়া যাবে। তাই প্রতিদিন কাজের ভেতর ডুবে থাকতে চায়। অন্যের সুখদুঃখে সমভাগী হ'য়ে নিজের দুঃখ ভুলতে চায়।

অশোক তাকে যখন বার বার তার ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়া শরীরের কথা মনে করিয়ে দেয়, তখন তার হাসি পায়। কি করবে সে? সে তো ভালোবাসার শিকার হয়েছে। সত্যিই ভালবেসেছে সে, নিপীড়িত হয়েও, প্রবল ঘৃণার মধ্য দিয়েও তার ভালবাসা আবার স্বামীকেই কেন্দ্র ক'রে ঘুরতে থাকে। কি করবে সে? এর থেকে অব্যাহতি নেই তার।

তাই আজও অশোকের এ প্রশ্নের উত্তর সে না দিয়ে অন্য কথায় নিয়ে গেল। কিন্তু অশোক আজ ছাড়বে না। দিনের পর দিন টুকলার এ স্বেচ্ছামৃত্যুকে ও যেন কোনমতেই মেনে নিতে পারছে না। অথচ কি তার অধিকার?

ভাববেন না অশোকবাবু। শরীর আমার অল্পদিনেই ভাল হয়ে যাবে। আবার ভাল শরীরও তো আমার একটা বিপদ।

কেন?

শরীর এত অসম্ভব রকমের ভাল না হ'লে হয়ত করুণা করেও কেউ বলতো 'আহা'।

প্রিয়জনকে ভালবাসতে গেলে করুণার প্রয়োজন হয়না জানবেন।...

দুচোখে গভীর স্নেহ নিয়ে বলল অশোক।

আর তাছাড়া তার জন্য একজনকে শরীর খারাপ বা অসুস্থ হতে হ'বে তারও কোন মানে হয় না।

আলগা ক'রে একটু হাসল টুক্‌লা।

না না। আমি করুণাকে ভয় পাই। কেউ যেন আমায় করুণা না করে। আমি করুণার পাত্র হ'তে ঘৃণা বোধ করি, কিন্তু মানুষের মন তো, মাঝে মাঝে কেমন মনে হয়। হৃদয়হীন লোকেরা করুণা ছাড়া আর কিই বা করতে পারে? তাদের তো হৃদয় নেই, তারা তো ভালবাসতে পারে না।...

অশোকের মনে হল—টুক্‌লা জানেনা, যে হৃদয়হীন তার জীবনকে এমন নষ্ট করেছে—সেও ভালবাসতে জানে, প্রচণ্ড তীব্র ভালবাসায় উন্মাদের মত আচরণ করতে পারে, শুধু পাত্রী ভেদে।

সবিতার সঙ্গে অমিতাভর দীর্ঘদিনের প্রেম অশোকের অজানা নয়। কিন্তু থাক, যা চাপা আছে, তাকে আলোয় এনে কাজ নেই। তাই টুক্‌লার মাঝে মাঝে এই আক্ষেপোক্তি শুনেও সে কষ্টে নিজেকে সংযত ক'রে রাখে। শুধু বড় চঞ্চল হয়ে ওঠে সে টুক্‌লার চোখে জল দেখলে। কতদিন এসে দেখেছে সে, টুক্‌লার আরক্ত মুখ-চোখ। কিন্তু কোন প্রশ্ন করেনি, শুধু সমস্ত দিনটাই তার কাছে বিস্বাদ হ'য়ে গেছে।

এবারে এসে টুক্‌লা লক্ষ্য করেছে শুধু চেঁচামিচিই নয়, অমিতাভর বাইরের জীবনও যেন অনেক বেড়ে গেছে। ও জানতে পেরেছে, অমিতাভ নিজেকে বন্দী করে রেখেছিল ক'বছর আবার

বাইরের খোলা জগতে এসে মিশছে, সভা-সমিতিতে যাচ্ছে। কিন্তু সে জগত অমিতাভর একান্ত নিজস্ব। টুক্‌লাকে তার অংশ দিতে সে নারাজ। কত ভেবেছিল টুক্‌লা, তার ভালবাসা দিয়ে সে তার শিল্পী স্বামীর প্রকৃত সহধর্মিণী হবে! কিন্তু প্রথম থেকেই যে অমিতাভ তাকে তার সীমা বুঝিয়ে দিয়েছে। রূপকথার গল্পের মত তার যেন উত্তরের ঘরে যাওয়া বারণ। সে নিষেধের বেড়া ভাঙ্গতে টুক্‌লার ইচ্ছে হয়নি। এ তার স্বভাব নয়। ভালবেসে হৃদয়ের সমস্ত পূজা নিয়ে এগিয়ে এসেছিল সে, কিন্তু দরজা বন্ধ দেখে ঠেলা দিতে তার প্রবৃত্তি হয়নি। তার থেকে অপেক্ষা করবে সে চিরদিন।

অথচ সেইখানেই ভয় পায় টুক্‌লা। নিজের মনের গভীর কোন অবধি খুঁজে দেখেছে। দিনের পর দিন তার সে ধৈর্য্য যেন কমে যাচ্ছে। অপেক্ষা করতে তার মন যেন নারাজ। মনের এই শূন্যতা তাকে পাগল ক'রে তুলেছে। নারী মনের যে প্রবল মনোবৃত্তি—নিজেকে প্রয়োজনীয় মনে করা, তা ও সচেতন মনে স্বীকার করে না। কিন্তু তার অবচেতন মনে সেই ব্যর্থতাই কাজ করে যায়, আর অবলম্বন চায়, মনের আশ্রয় চায়। যদিও এর কোনটাকেই স্বীকার করতে রাজী হয় না টুক্‌লার মন। কি করবে ভেবে পায় না টুক্‌লা। নিজের মনেই অবাক হয়ে যায় সে। তার মনে কত রকমের টানাপোড়েন, কত বিপরীত ধর্মী চিন্তার আনাগোনা। মাঝে মাঝে মাথা ঝিম্-ঝিম্ করে। কত রাতে উঠে পড়ে মাথায় মুখে জল দিয়ে এসে আবার শোয়, হয়তো সারা রাতেও ঘুম আসে না।

একমাত্র আশ্রয় তার খুকু। কিন্তু সেখানেও তার শান্তি নেই। যতদিন খুকু ছোট ছিল তার অহরহ পরিচর্যার প্রয়োজন ছিল, ততদিন অমিতাভ চেয়েও দেখেনি। কিন্তু খুকু বড় হওয়ার সঙ্গে

সঙ্গে তাকে যেন পুরো দখল ক'রে বসতে চাইল অমিতাভ। খুকু যে অমিতাভরই মেয়ে একথা হঠাৎ যেন অমিতাভ উপলব্ধি করল আর খুকুর সম্বন্ধে তার একাধিপত্য করবার প্রবল ইচ্ছা টুক্‌লাকে জানিয়ে দিতে দ্বিধা করল না।

এখানেই টুক্‌লা সব থেকে বড় আঘাত পেল? অনেক সহ্য করেছে সে, অনেক দাবী ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু খুকুর ব্যাপারে সে যেন কিছুতেই সহ্য করতে রাজী নয়। খুকু যে তারও, যদি অমিতাভ তাকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করত তাহলে এ ব্যাপারে একটা আপোষের প্রশ্ন উঠত। কিন্তু তা তো নয়। টুক্‌লা বোঝেনা সে কথা। কেন তাকে অমিতাভ এমন নির্মমভাবে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

কত রাতে দেখেছে সে, শুতে আসেনি অমিতাভ, বারান্দায় বসে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে চলেছে। মনে মনে পীড়িত হলেও তার কাছে যেতে পারেনি টুক্‌লা। একটা দুস্তর ব্যবধান যেন অমিতাভ নিজেই সৃষ্টি করে নিয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয় টুক্‌লার, হয়ত সে শিল্পীর মনের নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে পারছেনা। তার সে ক্ষমতা কোথায়? কিন্তু অমিতাভ তো কিছু বলে না, নীরবে সহ্য করছে আপন অন্তর্জ্বালা আর সেই সঙ্গে টুকলাকেও দগ্ধ করছে। তবুও এতে টুকলা যেন ততটা ব্যাথিত নয়। তাহলে কি টুক্‌লার মন ক্রমশঃ অমিতাভর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে? বুঝতে পারে না টুক্‌লা।

কিন্তু একথা বেশ জানে যতই দিন যাচ্ছে, খুকুকে সে ভালবাসছে বেশী করে। ছোট্ট মানুষটি এখন জীবনের—ওপর, মায়ের ওপর দখল নিয়ে দাঁড়িয়েছে। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সে পৃথিবীকে যেন ভোগ করতে চাইছে। জীবনকে স্পর্শ করে তার স্বাদ গ্রহণ করতে চাইছে। আর তার সঙ্গে টুক্‌লাও যেন নতুন করে পৃথিবীকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছে। তাই শরীরে না পোষালেও খুকুর

সব কাজ সে নিজে করতে চায়। তার শরীর ভাল নয়। কিন্তু খুকুর জীবন যে তার ওপরই নির্ভরশীল। রাতে খুকু ঘুমোলেও তাই তার দুচোখে ঘুম আসে না, বারবার কান পেতে শোনে খুকুর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, ঠিক পড়ছে তো। সে যেন সদা সতর্ক প্রহরীর মত খুকুকে রক্ষা করতে চায়।

কিন্তু এখানেই যেন অমিতাভ তার নীরবতা ভেঙ্গে সরব হ'য়ে ওঠে। যদিও অমিতাভ মাঝে অনেক কর্কশ কথা বলেছে, টুক্‌লাকে অজস্র দুঃখ দিয়েছে, কিন্তু খুকুর সম্বন্ধে সরবে নির্মম হতে তার এতটুকু বাধে না।

অমিতাভকে বোঝা সত্যিই দুঃসাধ্য যেন, অমিতাভও সংসারে শান্তি পাচ্ছে না, তাই সেও প্রাণপণে আঁকড়াতে চাইছে খুকুকে টুক্‌লারই মত। তাছাড়া তার 'স্বভাবের মধ্যেই যে সর্বগ্রাসা ভালবাসা আছে। খুকুর ওপর সেটাই যেন প্রকাশ পায় ভীষণভাবে।

অথচ সেদিন পর্যন্তও তো নীরব উপেক্ষায় সে মা মেয়েকে সরিয়ে রেখেছিল। আজ যেন শত বাহু মেলে তাই সে এগিয়ে এসেছে, দুর্বার গতিতে, টুক্‌লার সঙ্গে সেখানেই তার প্রধান দ্বন্দ্ব।

এতদিনের উপেক্ষা টুক্‌লা সহ্য করল, অথচ আজ সে অধীর হয়ে উঠল খুকুর ওপর তার অধিকারের জন্য। স্বামী স্ত্রীতে যেন একটা চ্যালেঞ্জের সামনে এসে দাঁড়াল।

তোমায় একটা কথা আমি বলে দিতে চাই।

সেদিন সকালেই অমিতাভ টুক্‌লাকে বলল।

কি কথা?

আমার মেয়েকে আমি আমার মনের মতন করেই গড়ে তুলতে চাই। এখানে তোমার কোন জোর আমি শুনব না।

আমার অপরাধ?

অপরাধ থাক না থাক; আমি আমার শেষ কথা তোমায় বলে দিলাম।

যদি না মানি ?

মানতে হবে, ওকে অন্যভাবে গড়ে তুলতে চাই। আর এ বিষয়ে বাধা দিতে চেষ্টা ক'র না।

অর্থাৎ !

টুক্‌লা অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস করল।

অর্থাৎ তার মায়ের আদর্শে সে তোমারই একটি দ্বিতীয় সংস্করণ হ'লে খুসী হব না। আমার আদর্শ·········

কার দ্বিতীয় সংস্করণ হ'লে খুসী হবে ? জানতে পারি তো ?

ওকে থামিয়ে দিয়ে টুক্‌লা প্রশ্ন করল।

তোমার নয় এটুকুই জেনে রাখ।

মেয়ে আমার, সুতরাং আমার মতন হ'লেই খুসী হব, তোমাকেও একথা জানিয়ে রাখলাম।

ওর স্পর্ধা দেখে অবাক হয়ে যায় অমিতাভ। এ যেন অন্য টুক্‌লা।

কোন কথা না ব'লে মেয়েকে কোলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে গেল টুক্‌লা। ওর হাত ধরে সজোরে টানল অমিতাভ।

অত তেজ ক'রে বেরিয়ে গিয়ে পার্‌সোন্যালিটি দেখাতে হবে না।

উঃ·········

টুক্‌লা চীৎকার করে উঠল।

ন্যাকাম ক'রনা। এটুকুতেই লাগে ? ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাও বোধ হয়। তোমায় সায়েস্তা······

তাই কর যে কোন উপায়ে, আর ভাল লাগে না······

টুক্‌লার চোখ জলে ভরে আসে।

হঠাৎ কেমন খারাপ্ লাগে অমিতাভর। ওকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই আগে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কতদিন টুক্‌লা ভেবেছে—ও অমিতাভর সঙ্গে অনাবশ্যক কোন কথায় যাবে না। তার জগৎ মানেই তো খুকু ও খুকুকে নিয়েই সব ভুলে থাকবে। কিন্তু অমিতাভ তো আগেকার মত অত নিস্পৃহ নেই। খুকু তো তারও মেয়ে। তাকে তারও চাই। আর স্বামীস্ত্রীর এই দ্বন্দ্ব দিনের পর দিন বেড়ে তাদের মধ্যকার ব্যবধান আরও বিস্তৃত ক'রে দেয়।

টুক্‌লার যা প্রকৃতি, তা সতেজ প্রাণবন্ত, সে পারে না এই গ্লানিময় জীবনের মধ্যে নিজেকে শেষ ক'রে দিতে। তাই এই মানসিক অবসাদ বা ক্লান্তিকে ও আমল দিতে চায় না। ও ভাবে তার শরীরের অবসাদটুকু কেটে গেলেই ও আবার সব ঠিক ক'রে নিতে পারবে। তাই যখন খুব বেশীও মন খারাপ হয় দুঃখের চিন্তার মধ্যে ডুবে না থেকেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত আনন্দের ভেতর নিজেকে প্রকাশ করতে চায়, সকলকে আনন্দ দিতে চায়। বহুদিন আগে ছোট বেলায় কৈশোরে যখন ও বিশ্বাস করত 'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে' ও নিজের সেই অটল বিশ্বাসে ভাঙন ধরাতে চায় না। তাই খুকুকে নিয়ে মেতে ওঠে। অমিতাভর সব কিছু কটু ভাষণকে, দুর্ব্যবহারকে উপেক্ষা করে ও খুকুকে নিয়েই সুখী হ'তে চায়। কিন্তু মাঝে মাঝেই ক্লান্তি অনুভব করে। টুক্‌লার বহুমুখী প্রাণশক্তি যেন শুধু ঐ খুকুকে ঘিরেই শেষ হ'তে চায় না।

ওর ক্লান্ত দেহর দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা ব্যাথায় ভরে ওঠে অশোকের। কতবার ও বলেছে টুক্‌লাকে বাইরের জগতে

আবার নিজেকে প্রসারিত ক'রে দিতে যেমনটি ও প্রথম দিয়েছিল।
কিন্তু কোন কাজেই যেন টুকলা আর উৎসাহ পায় না।

এত যত্নেও খুকুর বুকে সর্দি বসে জ্বর বাড়ল। রাতারাতি সে জ্বর বেঁকে দাঁড়াল। পাগলের মত হ'য়ে গেল টুকলা। অমিতাভ গেছে বাইরে, কোন শিল্পী সভায় যোগ দিতে। ফিরতে দুদিন লাগবে। অথচ আজ তারই অভাবটা বারবার করে অনুভব করতে লাগল টুকলা। রাতের অন্ধকারে সে যেন মনোবল হারিয়ে ফেলছে। বারবার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল···চায়না সে একান্ত নিজস্ব ক'রে খুকুকে, তার এ রাক্ষুসে মাতৃস্নেহ থেকে সে খুকুকে অব্যাহতি দেবে, শুধু তাকে সুস্থ করে দিন ঈশ্বর। নিজের ওপর বারবার রাগ হ'তে লাগল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে কান্না ঢাকবার প্রয়াস করে সে ঠোঁট থেকে রক্ত বার ক'রে ফেলল। খুকুর অসুখে সে কি করবে ভেবে পাচ্ছেনা। নিজেকেই দায়ী মনে হয় কত সময়। তার কোন অজানা পাপে খুকুর এমন হ'ল কে জানে। খুকুর অসুখে তার মনে কত কুসংস্কার দানা বাঁধতে লাগল, সে যে মনে মনে স্বামীকে যথেষ্ট ভালবাসছে না এও তার কারণ হ'তে পারে, চমকে উঠল টুকলা রুগ্ন মেয়েকে কোলে নিয়ে চিন্তা করতে করতে। সত্যিই কি তার অবচেতন মনে কোন চিন্তা স্থান পেয়েছে! যা চিন্তা করা পাপ। কি সে? হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে যায় টুকলা, নিজের মনকে তলিয়ে দেখতে আর তার সাহস হয় না।

যতক্ষণ না ভোর হ'ল পাথরের মূর্তির মত খুকুকে কোলে নিয়ে বসে রইল টুকলা। সুবালা ঘুমিয়ে পড়েছে অঘোরে মেঝের ওপরই আঁচল পেতে, কিন্তু টুকলার চোখে পলক পড়েনি। খুকুর অস্বাভাবিক লাল মুখে নিজের ঠাণ্ডা গাল চেপে ধরেছে, ওর সবটুকু উত্তাপ যন্ত্রনা নিজে নিয়ে নেবার ইচ্ছেয়, বারবার ভগবানের কাছে অসম্ভব সব প্রার্থনা জানিয়েছে।

সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন জোর পায় টুকলা। তবু ডাক্তার আসার আগে পর্য্যন্ত অদ্ভুত অস্বস্তিতে সময় কাটিয়েছে সে। নিউমোনিয়াই বটে তবে প্রথমেই ধরা পড়েছে। ঘণ্টার হিসেব করে পেনিসিলিন আর আবশ্যকীয় ওষুধ পত্রের ব্যবস্থা ডাক্তারবাবুই করে দিয়ে গেলেন। টুকলার জলভরা চোখের দিকে তাকিয়ে মায়াই হল ডাক্তার বাবুর।

অত ঘাবড়াবেন না মিসেস বোস। আগেকার দিন হ'লে অবশ্য খুবই ভয়ের ছিল, এখন পেনিসিলিনের যুগ ভয় কি? তবে খুব কষ্ট্‌লি তো।

দামী কত দামী? ভাবল টুক্‌লা। খুকুর জীবনের থেকেও বেশী কি? দামের কথা একজন মায়ের সামনে কি করে উচ্চারণ করে ডাক্তাররা? মায়ের প্রাণের মূল্যেও কি খুকুর প্রাণ পাওয়া যাবেনা?

অল্পের ওপর দিয়েই গেল। অমিতাভ যখন ফিরল তখন খুকু তার মিষ্টি হাসি দিয়েই বাবাকে অভ্যর্থনা জানাল। কিন্তু তার ক্লিষ্ট শীর্ণ দেহ অমিতাভর নজর এড়ালনা।

বাঃ মাত্র ছয়দিন ছিলাম না। এর মধ্যেই মেয়ের এ চেহারা করেছো? বলিহারি। মাকে সত্যিকারের মা হ'তে হয় বুঝলে? প্রতিবেশী সুলভ আদর দেখলে কি মার কর্তব্য পালন করা হয়?

এর কি উত্তর দেবে টুক্‌লা। তার নিজের অসুস্থ শরীরে এখনও ও মুহূর্তের বিশ্রাম নেয়নি। পরপর ছয়রাত তার দেহকে সে ছড়াতেও পারেনি, আর এই কথা? হোকগে, উপেক্ষা করে যেতে চেষ্টা করে টুক্‌লা। বলুক। ওর বলার অপেক্ষায় তো ক'রেনি টুক্‌লা। ও করেছে খুকুর জন্য, নিজের প্রাণের তাগিদে। বলুক, যত পারুক বলুক অমিতাভ, তবু সব কিছুর বিনিময়ে ও খুকুর সুস্থ জীবন চায়। সত্যিই ওর সুখ, স্বাস্থ্য শান্তি সব কিছু ও খুকুর বিনিময়ে দিতে প্রস্তুত।

ফিরে এসে অমিতাভ যেন ক্ষেপে গেল। ও শুনেছে সব সুবালার কাছে, খুকুর আধ আধ কথায়, ডাক্তারের কাছে। অবশেষে টুক্‌লার কাছেও জিজ্ঞেস ক'রে জেনেছে ও সব। তাই ও টুক্‌লার হাতে খুকুকে ছাড়তে নারাজ। ভাল করে এখনও সুস্থ হয়নি খুকু। ঘড়ি ধরে নিয়মমত তার সব ব্যবস্থা করতে হয়, এ অবস্থায় দখলীসত্ব নিয়ে মারামারি করাটা যে খুকুর পক্ষে কতটা ক্ষতিকর তা অমিতাভকে কি ক'রে বোঝাবে টুক্‌লা ?

সেরে উঠুক তখন তোমার মত খাটিও।

না ব'লে পারেনা টুক্‌লা

যাতে সেরে ওঠে সেজন্যই তো সব ভার নিতে চাই। তোমাকে যা বলি সেটুকু পালন করলেই হবে, তার বেশী আমি চাইনা।

সে আবার কি ? খুকুর কি প্রয়োজন আমি বুঝিনা ?

না-না-না—

প্রায় চীৎকার ক'রে ওঠে অমিতাভ। নিঃশব্দে সরে যায় টুক্‌লা। এই অমিতাভকে সে সত্যিই ভয় পায়।

সত্যিই কি এই অমিতাভকেই শুধু ভয় পায় ? শুধু পাগলের মত হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে বলে ? বুঝতে পারেনা টুক্‌লা। কত মানুষ তো আছে যাদের ব্যবহারের তো কোন মানে খুজে পাওয়া যায়না, যারা নিজেরাই জানেনা কখন কিরকম বিসদৃশ ব্যবহার করে অপরকে আঘাত করল বা নিজেকে ছোট করল। অমিতাভকেও তেমনি একজন ভেবে নিয়ে ক্ষমা করেনা কেন টুক্‌লা ? এমন লোকের ওপর তার করুণা না হ'য়ে ঘৃণাই আসে কেন ? বুঝতে পারে না টুক্‌লা। তার করুণা হয় না, ঘৃনা হয়, এত বড় সত্য তার নিজের কাছে তো অজানা নেই। কি করতে পারে সে ? তাই

বেরিয়ে এসে বারন্দার রেলিং এ মাথা রেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে টুক্‌লা।

এই সময়ই চিঠি এল অমিতার কাছ থেকে, ফিরে আসছে ওরা। ওরা মানে, সুবিনয়দাও। চিঠিটা পাওয়া পর্য্যন্ত টুক্‌লা ছট্‌ফট্‌ করছিল। অশোক ও কতদিন আসেনি। অসুখ করেনি তো! কথাটা মনে হওয়া মাত্রই টুকলার মনে যে বিষাদের একটি সুর বেজে উঠল তাকে কোন মতেই স্বীকার করতে চাইলনা টুক্‌লা। নিশ্চয়ই কোন কাজে আটকা পড়ে গেছে, তাছাড়া যদি অসুস্থই হয় তাহলেই বা টুক্‌লার বিচলিত হবার কি আছে? কত লোকই তো এই মুহূর্তে অসুস্থ হ'তে পারে। তখন আবার নিজেই মনকে বোঝায়। তা নয়, বন্ধু ব'লে, তার একজন শুভানুধ্যায়ী বন্ধু বলে, অশোকের মঙ্গলকামনাই ও করে। শুধু গতবার যাবার সময় ওকে একটু অসুস্থ দেখেছিল ব'লেই না আজ একথা তার মনে হচ্ছে। নিজের মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করল টুক্‌লা। তবে দিদির চিঠিটা আসার পর থেকেই ও অশোকের সঙ্গে একথা আলোচনা করবার জন্য উৎসুক হ'ল। আগে হ'লে ও নিজেই অমিতাভর কাছে যেত, কিন্তু সে সব প্রথম প্রথম, অনেক আগেকার কথা, গত কয় বছর টুক্‌লা নিঃসংশয়ে জেনে নিয়েছে যে শুধু টুক্‌লা নয়, টুক্‌লার আত্মীয় স্বজন বা পরিচিত কারও সম্বন্ধেই কোনরকম গুরুত্ব দেওয়াটা অমিতাভর পছন্দ নয়। যে পছন্দ করে না তার কাছে কোন কিছু নিয়ে কথা চালান, টুক্‌লার দ্বারা সম্ভব নয়। তাই সে সন্তর্পণে নিজেকে আর তাকে ঘিরে সব খবরই, অমিতাভর আড়ালে রেখে দিতে চেষ্টা করে।

সুবালার সঙ্গে খুকুকে বেড়াতে পাঠিয়ে ও যেন আবিস্কার করল

যে এবাড়ীতে ও সত্যিই একা। তার স্বামী, তার মেয়ে, তারই সংসার, অথচ এ সংসারে যেন সে কেউই নয়। এই স্বামী, মেয়ে, তারা কেউ যেন তার আপন নয়। কেন যে এই শূন্যতা বোধ তাকে পীড়িত করে তোলে, তা সে জানেনা। কিন্তু এটুকু স্পষ্ট বুঝতে পারে, ক্রমশঃ মেয়েকেও গ্রাস করে নিচ্ছে অমিতাভ। কাজ সেই সব করবে কিন্তু হুকুম সব অমিতাভর। তাছাড়া খুকুর জন্য প্রথমদিকের বেদনাময় ঝঞ্ঝাটের দিনগুলো কেটে গেছে, এখন চার বছরের খুকুকে নিয়ে আদর আদিখ্যেতা করতে কোন কষ্ট নেই অমিতাভর। আর অসুখ বিসুখ করলে তো টুক্‌লা আছেই।

খুকুও হ'য়েছে তেমনি। আগে মা ছাড়া কিছু জানত না। কিন্তু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেও যেন কেমন ক'রে বুঝে নিয়েছে বাবাই সব। এ বাড়ীতে বাবাই প্রধান। হয়ত খুকু পুরোটা বোঝেনা, কিন্তু টুক্‌লার মনে কোথায় একটা পরাজয়ের ব্যথা বাজে। অথচ এটি এমন কিছু অস্বাভাবিক যে নয় তা টুক্‌লা ভাল ভাবেই জানে। বাবাকে তো কত ছেলেমেয়েই মার থেকে বেশী ভালবাসে, কিন্তু সে তো স্বাভাবিক সংসারে। যেখানে স্বামী স্ত্রী সমান মর্য্যাদায় বাস করে। টুক্‌লার কি তাই? মনে পড়ল বিয়ের সময়কার কথা। কত আকাঙ্ক্ষা ছিল তার, সত্যিই সে সহধর্মিণী হবে তার স্বামীর। অথচ কতটুকু খোঁজ রাখল তার অমিতাভ। একজনকে শাস্তি দিতে, একজনকে ভুলতে গিয়ে, তার এই হঠাৎ বিয়ে করা স্ত্রীর জন্য কতটুকু স্থান তার মনে? সব জানে টুক্‌লা। বেশী ভাবতে পারে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, সে সহ্য করবেনা, সবকিছু ভেঙ্গে তছনছ করে দেবে, কোথাও মিথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই শান্তিকে সে টিকে থাকতে দেবে না। নিজেকে দিনের পর দিন অপ্রয়োজনীয় মনে করার গ্লানি থেকে সে নিজেকে মুক্তি দেবে। সে জীবনে ব্রত নেবে, খুঁজে বার করবে কোথায় তারও মূল্য আছে, সেও অপ্রয়োজনীয় নয়। তার মনে এল, অমিতাভর

কাছে না হ'লেও কারও কারও কাছে তার সুখদুঃখের দাম আছে, তার সামান্যতম ইচ্ছেটুকুও পূর্ণ করবার জন্য কোন মনের সমস্ত কামনা তীব্রবেগে ধাবিত হ'তে পারে। তারাই টুক্‌লার আপনজন, তারাই ওর আত্মীয়, আত্মার আত্মীয়। তখনই অশোকের কথা মনে না করে পারলনা টুক্‌লা।

কত বছর আগে ওদের আলাপ। মধ্যে কয় বছর ছাড়া নিয়মিতই আসে অশোক, টুক্‌লার মঙ্গল কামনায় তার সদাজাগ্রত দৃষ্টি নিয়ে সব কাজ ক'রে দেয়, তার ক্ষত-বিক্ষত মনে শান্তি দিতে চেষ্টা করে, সমবেদনায় তার মন ভরে যায় টুক্‌লার দুঃখে। সব বোঝে টুক্‌লা, সব জানে, কিন্তু না বোঝার ভান করতে হয়। চোখ বুজে সে একান্ত সত্য আলোকে অস্বীকার করে, অন্ধকারকেই জীবন বলে মেনে নিতে চায়। এছাড়া তার উপায় নেই। যাই ঘটুক তাকে এভাবেই থাকতে হবে। এছাড়া অন্য পথ কই? নেই, কোন পথ নেই।···নান্যঃ পন্থা।

এতদিন বাদে বুঝি মনে পড়ল ?

অভিমান ভরা গলায় জিজ্ঞেস করল টুকুলা অশোককে। প্রায় ছুমাস বাদে এসেছে অশোক এবার। এই ছুমাস প্রতিদিনই প্রতীক্ষা করেছে টুকুলা অশোকের। নমিতার সঙ্গেও এই কথা। কত হেসেছে সে টুকুলার আগ্রহ দেখে কিন্তু পরে বুঝেছে, টুকুলার মত মেয়ের একটা নিজস্ব জীবন না থাকায় এই শূন্যতা, যার ফলে সে একান্ত অনুগত কোন বন্ধুকে আঁকড়ে ধরতে চায়। তার নিজের সময় নেই। সে এখন পুরোপুরি ডাক্তার। তাছাড়া নানা পরিকল্পনা ঘুরছে তার মাথায়। তাকে দেখে অবাক লাগে টুকুলার। স্কুলে থাকতে ওর জন্য কত মায়া হয়েছে টুকুলার। তার মা নার্স বলে, তাদের কেউ নেই বলে। অথচ আজ নমিতাকে দেখে ওর নিজের জীবনের প্রতি আবার বিশ্বাস আসে। জীবন তো তাহলে কি শুধুই নিরাশা দিয়েই গড়া নয়। সে ছোটবেলা থেকে যে জীবনাদর্শে বিশ্বাসী ছিল, তাই তো ঠিক।

এতদিন বাদে অশোককে দেখে তাই আশার আনন্দে সমস্ত অভিমান যেন জড় হ'ল এসে।

তার এই অভিমানটুকু ভারী ভাল লাগল অশোকের। তাহলে সময়ের ব্যবধান চোখে পড়েছে টুকুলার। ওর তো ধারণা টুকুলা তাকে লক্ষ্যই করেনা। ওর এই ভাললাগাটুকু প্রকাশ না ক'রে থাকতে পারল না অশোক।

ভাগ্যিস দেরী করলাম আসতে, তাই তো আমার মূল্য কিছু বাড়িয়ে নিতে পারলাম।

দেরী না করলে বুঝি আপনার মূল্য থাকে না?

কি জানি বুঝতে পারিনা। সত্যি সত্যি রোজ এসে হয়ত আপনাদের বিরক্তিরই কারণ ঘটাতাম।

আপনারা কারা? গৌরবে বহুবচন?

টুক্‌লা হাসল।

তাছাড়া অশোকবাবু এতগুলি বছরেও কি এই সামান্য কথাটুকুও আপনি বুঝতে পারেন নি? আর আমাকে তা বিশ্বাস করতে বলেন?

কি?

টুক্‌লার আরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেল অশোক। নিজেকে বিশ্বাস নেই। টুক্‌লার জলভরা চোখ, আরক্ত মুখ ওর শিরায় শিরায় আগুন ধরিয়ে দেয়। কামনায় নয়, প্রচণ্ড একটা ভালবাসার উত্তাপে, স্নেহের আগুনে জ্বলতে থাকে সে। মনে হয় জটায়ু পাখীর মত তার বিরাট দুটো ডানা দিয়ে জগতের সব ঝড়-ঝাপটা থেকে সে টুক্‌লাকে আড়াল করে রাখবে, সব আঘাত থেকে তাকে রক্ষা করবে। আজও সে ভয় পেল। নিশ্চয়ই অমিতাভর কোন ব্যবহারে আহত হয়েছে সে। কিন্তু···না···ছাই চাপা আগুনকে উস্কে দেবার মত সাহস অশোকের নেই। সেও তো মানুষ, সর্বশক্তিমান নয়। যার জন্য অদেয় তার কিছুই নেই, দিনের পর দিন তার দুঃখ লাঞ্ছনা চোখের ওপর নিরুপায়ের মত দেখে যেতে হবে তাকে। এছাড়া তার অন্য কোন অধিকার নেই, শুধু ক্ষনিক মানসিক শান্তি দেবার চেষ্টা করা ছাড়া। তাই হোক, যেটুকু তার অধিকার সেটুক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুক সে। স্তব্ধ হ'ক তার গতি। তার সীমা সে ছাড়াবেনা কোনদিন, টুক্‌লার সর্বনাশ ডেকে আনবে না। থাকুক টুক্‌লা তার নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে। জগতের

সামনে, বিচারের কাঠগড়ায় তাকে দাঁড়াতে দিতে পারেনা অশোক।

জানেন, দিদির চিঠি এসেছে।

ওর চিন্তায় ছেদ পড়ল টুক্‌লার কথায়।

তাই নাকি? কি লিখেছেন? ফিরছেন কবে?

শীগগিরই, ওরা দুজনেই ফিরছে।

দুজনেই?

অবাক হল অশোক।

আবার একসঙ্গেই বোধহয়।

খুব সুসংবাদ সন্দেহ নেই, কিন্তু··· এলফ্রিডা?···মানে সেই ভদ্রমহিলা···ভাল সহজেই সব জিনিষের পরিসমাপ্তি হল সুখে।

দিদি আমার বড় কষ্ট পেয়েছে অশোকবাবু। আপনি জানেন না, দিদি এত ভাল। বেচারা যাকে আশ্রয় করে ঐ দূরদেশে সব ছেড়ে গেল তার কাছ থেকেই অতবড় আঘাত পেল।

অবাক হ'ল অশোক। টুক্‌লা কি নিজে তার থেকেও বেশী আঘাত পায়নি? তবুতো অমিতার মধুর স্মৃতি আছে বিবাহোত্তর প্রথম জীবনের, যদিও বাড়াবাড়ি করেছিল সুবিনয়, তবু তাঁর ক্ষণিকের মতিবিভ্রম। অমিতাও বোধহয় এখন সুখী। কিন্তু টুক্‌লা? আসার আগেই যার স্বামীর মনে আর একজন স্থায়ী আসন পেতে বসেছে; অনেক গুণ, অপূর্ব প্রাণশক্তি নিয়েও কেঁদে যার প্রতিদিন যায়, স্বামীর ভালবাসায় কোথাও যার অধিকার নেই, তাকে কি অমিতার থেকেও বেশী দুঃখী বলে লোকে করুণা করবেনা?

কিন্তু টুক্‌লা যে করুণা চায়না। ও তো স্পষ্টই বলেছে। করুণার পাত্রী হ'তে ও ঘৃনা বোধ করে। আহা, সত্যিই যদি এমনি হ'ত, অশোক ভাবে। টুক্‌লা যদি স্বামীসৌভাগ্যে গরবিনী হ'ত তাকে সত্যি-সত্যিই করুনার পাত্রী না হতে হত। লোকে না জানুক, টুক্‌লা মুখে স্বীকার না করুক; কিন্তু

সংসারের ঝি চাকরদের ও যে জানতে বাকী নেই, অমিতাভ টুক্‌লাকে কতটুকু মর্য্যাদা দেয়। তবু থাক তা চাপা, টুক্‌লা যা চায় না তা অজানাই থাকুক, সব লোকের দৃষ্টির আড়ালে। সেটি অশোকের একান্ত আপন, নিজস্ব ঐশ্বর্য্য।

একথাটা অনেকবার ভেবেছে অশোক। তবে তার মনে কোথায় একটা অপরাধ বোধ মাঝে মাঝে উঁকি দেয়। অমিতাভর ভালবাসা পেয়ে টুকলা মগ্ন থাকলে সত্যিই কি সে সুখী হ'ত? ভাবতেও নিজের ওপর রাগ ধরে অশোকের। ছিঃ ছিঃ টুক্‌লার মঙ্গলাকাঙ্খী সে। টুক্‌লার সুখে না তার সুখ! কিন্তু অমিতাভর মত একটি লোকের প্রেমে টুক্‌লা জগত সংসার ভু.ল আছে এ চিন্তা তার অসহ্য মনে হয়। অথচ অমিতাভ তো এমনিতে লোক খারাপ নয়। অতবড় নামকরা শিল্পী গুণী, টুক্‌লার প্রতি খারাপ ব্যবহার না করলে কি বলার থাকত তার? তবু···ঐ তবুটাকেই কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারেনা অশোক।

কবে আসছেন আপনার দিদিরা?

অনেকক্ষণ বাদে যেন প্রশ্ন করল অশোক।

চমক ভাঙ্গল টুক্‌লারও। ও নিজেও কি অনেক—অনেক কথা, অন্য কথা ভাবছিল? নাহলে অশোকের আগের প্রশ্নেরই খেই ধরা কথায় চম্‌কে উঠবে কেন?

....মনে নেই তো। দাঁড়ান দেখি···এই যে, ওঃ আসতে এখনও প্রায় ছমাস। ওরা সব ব্যবস্থা ক'রে ওখানকার পাট উঠিয়ে দিয়ে আসছে কিনা। বাবারে....এখনও ছমাস।

দেখতে দেখতে কেটে যাবে দেখবেন।

তা ঠিক। কবে, প্রায় দশবছর বাদে ফিরছে দিদি, অথচ চোখ বুজে আমি এখনও দিদির সেই হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়ার দিনটিকে দেখতে পাই জানেন?

তাই তো হয়।

জানেন, তখন ঐদিনে মনে হয়েছিল যে কি বিশ্রী ভাবনা ভরা দিনটি। অথচ কখনও কি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম যে কত ভাবনা, কত বিশ্রী দিন আমার জন্য সারা জীবনভোর অপেক্ষা করছে। 'রইল না মোর নানা রংএর দিনগুলি।'

শেষের কথাটি টুক্‌লা যেন আপন মনেই ফিসফিস ক'রেই বলল।

আচ্ছা আপনি গান আর একদম করেন না?

না।

কেন?

এমনি। গান আর আসেনা।

গাইলেই আসবে দেখবেন।

কি জানি, চেষ্টা করেও দেখিনি। কতদিন···

আপনার এত ভাল গলা ছিল, গানের মত এত বড় বন্ধুকে আপনার ছাড়া উচিত হয়নি।

আমাকে যে বন্ধুই ছেড়ে গেছে, কি করব' বলুন। টুক্‌লার গলা প্রায় ধরে এল।

ওর দিকে গভীর স্নেহভরা দৃষ্টিতে তাকাল অশোক।

শোন! শুনছ!

চমকে উঠল ওরা! বারান্দা থেকে কর্কশ গলায় ডাক এল অমিতাভর। কখন এসেছে ও? কোথায় ছিল এতক্ষণ?

যাই!

উঠে পড়ল টুক্‌লা।···

বসুন, পালিয়ে যাবেন না। আসছি এখনই।

পালিয়ে যাবার সাধ্য কি? মনে মনে বলল অশোক।

ওর কানে ভেসে এল অমিতাভর চড়া গলায় কতগুলো শব্দ। কথা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু কোন ব্যাপারে যে টুক্‌লাকে ধমকাচ্ছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। টুক্‌লার গলা প্রায় শোনা যাচ্ছে না।

অবশ্য অশোক এরকম ক্ষেত্রে টুক্‌লার গলা বিশেষ কোনদিনই শোনেনি।

প্রায় মিনিট কুড়ি বাদে খুকুর হাত ধরে আরক্ত মুখে ঢুকল টুক্‌লা।

আমি যাই।...

অশোক বলল। সহ্য করতে পারেনা অশোক। তাছাড়া টুক্‌লাও অপ্রস্তুত বোধ করতে পারে। যদিও বহুবার ঘটেছে তার সামনে এমনি কত ঘটনা।

বসুন না।

টুক্‌লার যেন জেদ চেপে যায়।

তাড়া আছে কোন কাজের ?

টুক্‌লার কাছে থাকার থেকে কোন বড় কাজ আছে নাকি অশোকের জীবনে ? অশোক ভাবল।

ওকে না বসিয়ে রাখলেই পার। ওঁর কাজ থাকতে পারে তো। না কি তোমার কথা শুনলেই ওঁর দিন কাটবে। তোমারও কাজ আছে তো।

বারান্দা থেকে গলা ভেসে এল অমিতাভর। দাঁড়িয়েছিল, বসে পড়ল অশোক। এর পর যাওয়ার কথা ভাবাই যায় না কিন্তু ব্যাপারটা বোধ হয় এখানেই শেষ হবার নয়, না হলে অশোককে বসতে দেখে ঘরে ঢুকে হঠাৎ খুকুর হাত ধরে টেনে নিয়ে যাবে কেন অমিতাভ ?

হঠাৎ হাতে টান পেয়ে চীৎকার করে উঠল খুকু। আর তাকে ছাড়াতে গিয়ে টুক্‌লা একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেল অমিতাভর কাছে। পাগল হ'ল নাকি ? অশোকের সামনে এ কি করছে অমিতাভ কারণটাই বা কি এমন ? অবেলায় গল্প করছে, কাজ কর্ম না করে ? কিন্তু অমিতাভ তো কৈফিয়ৎ চায় নি। তাকে যে কোন মিথ্যে কৈফিয়তে খুশী করা যাবে না। এ কথা সে জোর গলায় জানিয়েছে

টুক্লা তার কর্তব্যে শিথিল হবে কেন সেটাই অমিতাভর জিজ্ঞাস্য। তবু ভাবতেও পারেনি টুকলা অশোকের সামনে এ ভাবে অমিতাভ নিজেকে আর টুক্লাকে ছোট করবে।

উঠে দাঁড়াল টুক্লা। অশোকের সমস্ত মুখটা অসম্ভব লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু কষ্টে নিজেকে সংযত করল। শুধু যাবার আগে টুক্লার কাছে এগিয়ে এসে বলল।

আমি দুঃখিত। সত্যিই···দুঃখিত। আজ যাই।

আবেগে গলা ধরে এসেছে অশোকের। অমিতাভর কাছে বিদায় নিতে ইচ্ছেও হল না। খুকুর মাথাটা একবার নেড়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল অশোক।

রাতে তারা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে বার বার নিজের মনকে প্রশ্ন করতে লাগল টুকলা। এর শেষ কোথায়? রাতের পর রাত এমনি যাবে। অসীম আকাশের তলায় এই বিরাট পৃথিবীতে কত জায়গায় কত কি ঘটছে। কত ঘরে এমনি কত নাটক নীরবে অভিনীত হয়ে যাচ্ছে। কোথাও সুখের, কোথাও দুঃখের, কিন্তু টুক্লার এই ক্ষতবিক্ষত মনের সঙ্গে কারও তুলনা হয়? ক্লান্ত সে। অমৃতময় জীবন মন্থন করতে গিয়ে তার ভাগ্যে হলাহল উঠে এসেছে। কার দোষে? দোষ যারই থাক সে নীলকণ্ঠ নয়, এত বিষ, এত জ্বালা গ্রহণ করতে সে পারে না। জীবনে সত্যি ভালবাসা সে পেয়েছে কি? আবার ঘুরে ফিরে সেই অশোকের কথা মনে হ'ল, না নিষিদ্ধ ফলের মত ও কথা সে ভাববে না। তার কোন অধিকার নেই ও কথা ভাববার। কেন, সে যা পেয়েছে, যা তার অধিকার তাই নিয়েই পূর্ণ হ'তে পারবে না, সুখী হ'তে পারবে না?

এ কেনর উত্তর টুক্লা জানে না। টুকলা এর সমাধানের পথ

খুঁজে পাচ্ছে না। রেলিং এ মাথা ঠেকিয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগল টুকলা।

'হিমে দাঁড়িয়ে থেক না, ঠাণ্ডা লাগবে।

বিশ্বাস করতে পারছে না টুক্‌লা অমিতাভ পাশে দাঁড়িয়ে, তাকে বলছে এ কথা ? অমিতাভ ভাবছে তার ঠাণ্ডা লাগবে কি না ? নিজের চোখ কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না টুক্‌লা।

চল ঘরে চল। কত রাত করবে ?

অমিতাভর দিকে ফিরে তাকাল টুক্‌লা। তারপর জোরে কেঁদে উঠে ওরই বুকে মুখ লুকোল।

অনেক রাত অবধি শুনল টুক্‌লা। অনেক রাত অবধি, প্রায় সারা রাত···অমিতাভ আজ লজ্জিত। বিশেষ করে অশোকের সামনে তার নিজের ব্যবহারে সে নিজেই লজ্জিত। কেন সে পারে না নিজেকে ঠিক রাখতে, তার মাথায় আগুন জ্বলে যায় কেন।

একটা কথাও না ব'লে শুনে গেল টুক্‌লা। তার চিরকালের অত্যাচারী, দাম্ভিক স্বামী তার কাছে এই প্রথম নত হয়েছে। কিন্তু সে কোন উল্লাস বোধ করল না কেন ? সে কি দুঃখ বেদনার অতীত হ'য়ে গেছে ? তা কেন হবে ? তাহলে সন্ধ্যার ঐ ঘটনার পরও অত বিচলিত হবে কেন, স্বামীর অপ্রত্যাশিত আদরে অত ফুলে ফুলে কাঁদবেই বা কেন ?

আর তাও সেই স্বামীরই বুকে মাথা রেখে ?

কেঁদ না টুক্‌লা কেন কাঁদছ ?

তুমি বোঝ না কেন ?

বুঝি টুকলা। কিন্তু তোমায় বললাম তো আমি পারি না, আর পারি না,···

টুকলারই মাঝখানে যেন আশ্রয় চায় অমিতাভ; ওর মাথাটা বুকের কাছে টেনে নিল টুকলা। কান্নায় ওর বুক ভেসে যাচ্ছে। কি করবে সে, সেও তো আর পারে না। সেও তো ক্লান্ত এই টানা পোড়েনে।

তোমায় তো আমি বলেছি, টুকলা।

জানি কিন্তু বাইরের লোকের সামনে কেন?

জানি না কি হয়।···

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল অমিতাভর বুক থেকে। আর অবুঝের মত তারই বুকে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল টুকলা।

ওর মাথায় আস্তে আস্তে হাত বোলাতে লাগল অমিতাভ।

এ কি জালে সে জড়িয়ে গেল? মনে মনে ভাবল অমিতাভ। এই বক্ষলীনা বালিকা···হ্যাঁ বালিকাই তো, টুকলাকে বালিকা ছাড়া আর কিছুই তো ভাবতে পারেনা সে। একে সে সুখী করতে পারল না, কিন্তু দোষ কি শুধু তার? প্রথম প্রথম চেষ্টার সে ত্রুটী করে নি কিন্তু তার মনের কাছে কিছুতেই যেন তেমন করে স্থান দিতে পারেনি সে টুক্‌লাকে, ঐশ্বর্যময় বিরাট অতীত তাদের দুজনের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে।

আর হতাশ কি শুধু শুধু টুকলাই হয়েছে? সে কি হয়নি? বিয়ের আগে ভেবেছিল, প্রাণ চঞ্চল টুক্‌লাই তার মনের সঙ্গী হতে পারবে, ছুঁতে পারবে সেইখানে যেখানে অমিতাভর আত্মার বিচরণ, যেতে পারবে তারই সঙ্গে সেই লোকে, যেখানে তার স্বচ্ছন্দ বিহার, সবিতাকে হারিয়ে তার যে ক্ষত হয়েছে, তাতে প্রলেপ দিতে টুকলাই পারবে। কিন্তু কোথায়? তার শিশু মনে কোথায় সেই পরিণত শিল্প বোধ, সেই পরিমিতি জ্ঞান?

বৃষ্টির জল দেখলে ময়ূরের মত নেচে ওঠে টুক্‌লা। কিন্তু হায়! অমিতাভর তুলির একটা আঁচড়ের মানেও সে যদি সত্যি বুঝত। হয়ত টুকলা ভাল, কিন্তু সে অমিতাভর সঙ্গিনী নয়। আজ তার

নিজের কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই সাথী নির্বাচনে তার ভুল হয়েছে। কিম্বা জীবনেও হয়ত সে মানসসঙ্গী খুঁজে পাবে না।

তাই বা কেন? সবিতা কি তার যথার্থ মানস সঙ্গিনী ছিল না? আজ যদি টুকলার বদলে সবিতাকে পেত সে তাহলে হয়ত তার নিজের জীবনও এভাবে ব্যর্থ হ'ত না। তবু আজ টুকলাই তার স্ত্রী, বুঝি ওর একমাত্র শান্তির আশ্রয়।

টুকলার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ স্নেহে ব্যাথায় টনটন করে উঠল তার বুক। কি তার অপরাধ; স্পষ্ট তো কিছুই নয় তাকেই তো টুকলা পরম নির্ভরতায় আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে। তাই হোক আর নয়, টুকলাকেই টেনে নেবে সে নিজের জীবনে।

সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরল সে টুকলার মুখ।

কিন্তু পরদিন সকালে উঠে আবার যে কে সেই। বরং সারাদিনে তার ষ্টুডিও ঘর থেকে একবারও বেরোল না। এমনকি খুকুকে নিয়েও একবারও মাথা ঘামালনা।

বেশ আছে অমিতাভ। নিজের আশ্রয় সুদৃঢ় ক'রে, নিজের চারপাশে গণ্ডী কেটে দেওয়ার এই ক্ষমতাকে সত্যিই ঈর্ষ্যা করে টুক্‌লা।

সারা দিন কতবার ডাকতে এল, লোক পাঠাল। কিন্তু অমিতাভর বন্ধ দরজা খুলল না। বাড়াবাড়ি করতে পারেনা টুক্‌লা। চাকর বাকর ও তো আছে।

সন্ধ্যার সময় খুকুকে ঘুম পাড়িয়ে ওর কাছে সুবালাকে বসিয়ে ওর ষ্টুডিও ঘরের দিকে গেল টুক্‌লা। যা ভেবেছিল তাই। বোধহয় সারাদিনই এই চলেছে। কে জানে। বহুদিন আগের দেখা ছবির মত। ডিভানের ওপর তেমনি আধশোয়া অবস্থায় শুয়ে আছে

অমিতাভ। শুধু এতদিন বাদে হঠাৎ বহুদিনের সেই অর্দ্ধসমাপ্ত ছবিটার কবে জানি শেষ ক'রে সামনের দেয়ালে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। সারাদিন বোধহয় এটাই এঁকেছে।

থমকে দাঁড়িয়ে গেল টুক্‌লা। প্রায় সাতবছর হল। কোথায় ছিল এ ছবি এতদিন? কার ছবি? কে এ? যে কথার সন্দেহের অঙ্কুর তার মনে ছিল, আজ যেন ডালপালা বিস্তার করে সেটি টুক্‌লার সারা মনে ছড়িয়ে পড়ল। সব আবরণ যেন দূরে সরে গেল। সন্দেহ মাত্র নয়, আজ সমস্ত অস্পষ্টতা কেটে গিয়ে দিনের আলোর মত স্বচ্ছ পরিস্কার হয়ে ধরা দিল তার কাছে। কিন্তু ছবির দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখতে প্রবৃত্তি হল'না।

কি হচ্ছে তোমার?

দৃঢ়পায়ে এগিয়ে এল টুক্‌লা।

তুমি কেন এ ঘরে এলে? তোমায় না বারণ করেছি, এখানে আসতে?

হ্যাঁ করেছ কিন্তু তোমার বারণ আমি শুনবনা। তোমার ভালমন্দ আমাকেই দেখতে হবে। খাওয়া দাওয়া ছেড়ে···

বেশী ঘনিষ্ট হবার চেষ্টা ক'র না।

একটা বেলুন যেন চুপ্‌সে গেল হঠাৎ ফুটো হ'য়ে। ঘনিষ্ট হবার চেষ্টা করবে সে? তারা কি এই সাত বছরের বিবাহিত জীবনের পরও যথেষ্ট ঘনিষ্ট নয়? অত আগ্রহ, উৎসাহ, জোর, টুক্‌লার কোথায় চলে গেল। কি ভুলই করেছিল সে! কোথায় তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে এসেছিল। কিন্তু কালকের রাত? সে তো স্বপ্ন নয়। কালতো....

কাল কি যে হয়ে গেল।

ওরই মনের চিন্তা ধরে যেন কথা বলল অমিতাভ।

ওসব ব্যতিক্রম ব'লে মনে করতে পার। নিয়মের ব্যতিক্রম।··· মনে রেখ ব্যতিক্রম···আর কিছুনা।

বারবার নিজের মনেই উচ্চারণ করতে লাগল অমিতাভ।

...সত্যি বলতে তোমায় আমায় কোন সম্পর্ক নেই। বুঝলে?

কাঠের মত শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে টুক্‌লা। ভালবাসা, কোমল হওয়া ব্যতিক্রম, নিষ্ঠুর হওয়া, অত্যাচার করাটাই স্বাভাবিক? ভাল করে ওর মুখের দিকে তাকাল টুক্‌লা। ঘরে আলো নেই, জ্বালেনি অমিতাভ, পাশের বারান্দা থেকে আলো এসে অমিতাভর মুখে, তার সামনে রাখা বিরাট ছবিটিতে পড়েছে। জীবন্ত মানুষ আর ছবির মানুষের সঙ্গে হঠাৎ বিরাট একটা যোগ দেখতে পেল টুক্‌লা। রীতিমত সুদর্শন অমিতাভকে, হঠাৎ টুক্‌লার কুশ্রী কুরূপ বলে মনে হ'ল। ভাবতেও নিজের ওপর ঘৃণা হ'ল এই রূপে সে মুগ্ধ হয়েছিল একদা, এই হৃদয়হীন কুশ্রী লোকটির অন্তর স্পর্শ করার জন্য তার আকুলতা জন্মেছিল! ভালই হল। ভালই হ'ল। তার মনের কুয়াশা আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে যেন। সব যেন সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। তার তো খুশীই হওয়া উচিত। অমিতাভর সঙ্গে আর সে ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা করে নিজেকেও ক্লান্ত ক'রে তুলবে না। ছাড়া পাওয়ার আনন্দে তার মনের মধ্যে একটা হাল্কা হাওয়ার আমেজ লাগল।

নিঃশব্দে বেরিয়ে এল টুক্‌লা। সে মুক্ত, অমিতাভের প্রেম থেকে তার অব্যাহতি মিলেছে। বহু চেষ্টা করেছে সে, তাতে দিনের পর দিন নিজেই ছোট হ'য়ে গেছে, আর নয়, এবার তাকে তার অত্যাচারী নিজেই মুক্তি দিয়েছে। অমিতাভকে ভালবাসবার দায়িত্ব থেকেও সে আজ মুক্ত। কিন্তু বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার মনটা কেমন টন্‌টন্ ক'রে উঠল। অমিতাভর প্রতি ভালবাসায় নয়, তার মনে যে তারাটি একটি স্বচ্ছ স্থির দীপ্তিতে জ্বলছিল, সে তারাটির ওপর যেন কুয়াশার আবরণ পড়ে গেল। এতে তার মনের অশান্তি বাড়বে না কমবে বুঝতে পারল না টুক্‌লা। দুহাতে মুখ ঢাকল সে।

মুক্তি ..মুক্তি সারা আকাশে বাতাসে ছড়ান রয়েছে মুক্তির আমন্ত্রণ। অমিতাভ নিজে থেকেই তাকে মুক্তি দিয়েছে, বলে দিয়েছে তাদের ভেতর সত্যকারের কোন সম্পর্ক নেই। তবে? সাজান সম্পর্ক নিয়ে টুক্‌লা মাথা ঘামাবে না। তাই হোক, বিবাহিত জীবনের এই নাগপাশ থেকে মুক্তি পাক সে।

অমিতাভর জন্য আর সে ভাববে না। ওর সারা জীবন ভরে শুধু খুকুই থাক। তার খুকু তার স্বর্গের আলো।

বারবার খুকুকে দেখে আর নিজেকে একেবারে মগ্ন করে রাখে খুকুর কাজে। কত কথা তার, কত আলোচনা সবই খুকুর সঙ্গে। সেদিনের পর থেকে অশোকও আর আসে না। ওর অনুপস্থিতি প্রতিদিনই অনুভব করে টুক্‌লা। বুঝতে পারে প্রকৃতির রাজ্যে বুঝি কিছুই শূন্য থাকে না। তাই তার মনে বুঝি ভরাবার ব্যবস্থা নিজের থেকেই তৈরী হয়ে আছে। স্বীকার করতে চায় না ও। খুকুকে নিয়ে, তার কাজ নিয়ে, আরো ব্যস্ত থাকতে চায় ও। ভাবতে চেষ্টা করে কিছুই হারায়নি তার। খুকুকে নিয়েই সুখী হবে সে, জীবনের দাবীই যে তাই। আবার নতুন উৎসাহে কাজে মেতে যায় টুক্‌লা। সব কিছুতেই আনন্দের স্বাদ পায় যেন। কিন্তু মাঝে মাঝে আবার কিসের যেন একটি গোপন অনুভূতি তাকে পীড়িত করে, অথচ সেই অনুভূতিই কোন সময় তীব্র হ'য়ে তার সব যন্ত্রণা সব মনবেদনা মুছে দেয়, আবার তার বিষাদভরা মন হাল্কা মেঘে ভাসতে থাকে।

কিন্তু ধীরে ধীরে নিজের মনকে বুঝতে পেরে ভয় পায় টুকলা। ও যেন মনের এই পরিবর্তনের বিপদ বুঝতে পারে। তার এই নিষিদ্ধ প্রেমকে ঠেকাবার জন্য প্রতিরোধ খাড়া করে, যদিও শত চেষ্টাতেও সে প্রতিরোধ ক্ষীণ হয়ে যায়। তবু কিছুতেই মেনে নিতে

পারে না। এ অসম্ভব, এ অনুচিত। সংসারের কাজে, খুকুর কাজে নিজেকে তত ঢেলে দিতে চায়।

কিন্তু অমিতাভ তার মতামত জানাতে দ্বিধা বা দেরী করে না। নির্মমতার শেষ সীমায় পৌঁছে যাবে বুঝি ও তাই সেদিন সকালে উঠেই ও টুক্‌লাকে জানিয়ে দিল তার মত। খুকুর শিক্ষা দীক্ষা সম্বন্ধে ওর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার বিশদ বিবরণ টুক্‌লার কাছে দেওয়ার ও প্রয়োজন মনে করে না, এটুকুই শুধু টুক্‌লা জেনে রাখুক খুকুকে ও বড় প্রতিভাশালিনী বিদূষী ক'রে তুলতে দেয়। তাই টুক্‌লার কাছে মানুষ করার কথা ও আর ভাবতেও পারে না।

বাজপড়া গাছের মত কথাটা শুনে দাঁড়িয়ে গেল টুক্‌লা। কি চায় অমিতাভ; টুক্‌লার মৃত্যু? তাই নাহলে কখনও কল্পনাতেও আনতে পারে টুক্‌লার কাছে থেকে খুকুকে সরিয়ে নেবার কথা? এই মুহূর্তে বোধহয় নিজের মৃত্যু কামনা করা ছাড়া টুক্‌লার আর কিছু প্রার্থনীয় থাকে না। কিন্তু মরতে ও ঘৃণা বোধ করে। আত্মহত্যা করবে কেন? সব কিছুথেকে ওকে অমিতাভ জোর করে বঞ্চিত করবে বলে? ওতো কিছু চায়নি। অমিতাভর ইচ্ছে মত নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে, একেবারে তার জীবন থেকে খসিয়ে নিয়েছে নিজেকে? তবে? আরও কি চায় অমিতাভ? ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হল টুক্‌লা। নির্বিকার মুখ, বোধহয় ফাঁসীর হুকুম দিতে জজের মুখেও বোধহয় একটু রেখা পড়ে, অথচ এতবড় কথাটা নির্বিবাদে উচ্চারণ করল অমিতাভ যেন অতি সহজেই।

অত অবাক অবাক মুখ ক'র না। আজকাল সকলেই ছেলে-মেয়েকে হস্টেলে রাখে, বিশেষ করে যেখানে স্বামীস্ত্রীদের সম্পর্ক এমনি।

সে তো খুকুকে স্পর্শ করে না। তাছাড়া আমি···

হ্যাঁ হ্যাঁ তুমিই, তোমার জন্যই তো খুকুকে দূরে পাঠাতে হচ্ছে।

যাতে তোমার আদর্শের ছিটে ফোঁটাও ওর মনে কোন রং না ধরতে পারে।

কোথায় দেবে ওকে?

অনেকক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল টুক্‌লা।

বম্বেতে একটা ভাল স্কুল আছে। তাছাড়া ওখানে....

তাছাড়া ওখানে বোধহয় কোন আদর্শ নারীর তত্ত্বাবধানে থাকবে আমার মেয়ে!

শ্লেষে গলা ভ'রে এল টুক্‌লার!

যদি বলি হ্যাঁ তাই। আমার সারাজীবনটা তো নষ্ট করে দিলে, খুকুকে আমার নিজের মত ক'রে পেতে দাও।

আমি নষ্ট ক'রলাম তোমার জীবন?

গলা যেন বুজে এল টুক্‌লার।

কি ক'রে? আমি তো তোমায় যেচে বিয়ে করিনি! তুমি বিয়ে করলে কেন? অতই যদি···

চোখে জল এসে গেল টুক্‌লার।

তোমার সম্বন্ধে অন্য রকম শুনেছিলাম····

অন্য রকম শুনেছিলে? না চলে গেলে চলবে না। বল আমার কথার জবাব দাও, আমি শুনব না, বিনা দোষে এই যন্ত্রণা সহ্য করবার ক্ষমতা আমার নেই, বল বল! বলতেই হবে।

অমিতাভ ততক্ষণে নিজের ষ্টুডিও ঘরে গিয়ে দরজা দিয়েছে।

বারান্দার ওপরই বসে পড়ে কাঁদতে থাকে টুক্‌লা। কখন খুকু এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। বড় বড় জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তার ছোট হাত দিয়ে মায়ের মুখখানা তুলে ধরবার চেষ্টা করছে। ওর দিকে জলভেজা চোখে তাকাল টুক্‌লা। তারপর খুকুকে সজোরে বুকে টেনে নিয়ে আরও জোরে কাঁদতে লাগল।

খুকুকে সত্যিই যে ছাড়তে হবে তা ভাবেনি টুক্‌লা। মাকে ছাড়া খুকু বাঁচবে কি ক'রে? নিজের কথা মনে পড়ল, দিদি মা বাবার স্নেহে ঘেরা তার সুখের বাল্যকাল। আজ বাবাও নেই যে তাঁর কাছে গিয়েও দাঁড়াবে। যদিও ইদানীং বাবার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কও ছিল না। কিন্তু তবু বেঁচে ছিলেন। বাবা বলে একবার দাঁড়াতে তো পারত। এখন কোথায় তার আশ্রয়? দিদিদের আসাও পিছিয়ে গেছে। আগামী শীতের আগে আসতে পারবে না ব'লে জানিয়েছে। কিন্তু খুকুর শূন্যতা কি কেউই ভরাতে পারবে? আর কেউ না জানুক, টুক্‌লা জানে এ শুধু কদিনের জন্য খুকুকে বোর্ডিংএ দেওয়া নয়, জন্মের মতই টুক্‌লার কাছ থেকে পর ক'রে দেওয়া। সকলেই বলবে, মেয়ে বোর্ডিংএ গেছে তাতে এত দুঃখ করবার কি আছে? বাবার বা মায়ের পছন্দ অনুযায়ী কত ছেলেমেয়েই তো ছোট বেলা থেকে বোর্ডিংএ মানুষ হয়। কিন্তু টুক্‌লা জানে অত সহজ নয়। অনেক গভীর অর্থ আছে এর ভেতরে।

খুকুর কান্না সর্বক্ষণ ওর কানে বাজছে। অমিতাভই নিয়ে গেছে তাকে। ফিরতে তার মাস খানেক লাগবে। তার পর টুক্‌লার যা ইচ্ছে করতে পারে। অমিতাভ তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না, প্রচণ্ড একটা প্রতিহিংসার আগুনে যেন জ্বলে যায় টুক্‌লা। নিজেরই উপর রাগ হয়। আগে হলে এত সহজে কি পারত অমিতাভ তার কাছে খুকুকে সরিয়ে নিতে? বাঘিনীর মত দাঁড়াত সে। কিন্তু এখন সাত

বছরের বন্দী অত্যাচারিত জীবনে অভ্যস্ত টুক্লা কবে তার সেই জোর-টুকুও হারিয়ে ফেলেছে। অমিতাভকে ও ভালবাসে না, ঘৃণাও বোধ হয় তত করে না, যত ভয় পায়। সত্যিই ভয় পায় ও অমিতাভকে। তাছাড়া নিজের মনের কথা তো আর অগোচর নেই। নিজের মনেই শঙ্কিত হয়ে থাকে সে। তার এ দুর্বলতা কেউ না জানুক সে তো জানে। নিজের মনের কাছে এই সততা বোধ তাকে পীড়ন করে। সে লজ্জিত নয় যে তার স্বামীকে সে ভালবাসে না, কিন্তু সেটা যে সমাজের চোখে অনুচিত, খুকুর মা যে তার বাবা ছাড়া আর কাউকেই ভালবাসতে পারে না, জন্মজন্মান্তরের এই সংস্কার তাকে ক্রমশঃ ভীত করে দিচ্ছে। যুক্তি তর্ক দিয়ে নিজেকে সাহস দিতে চেষ্টা করে সে। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী সে জোর চলে যেতে মুহূর্ত ও দেরী হয় না। নিজেকে সত্যিই অসহায় বোধ করে টুক্লা।

খুকুকে নিয়ে চলে যাবার তিনদিন পরেই নমিতা এসে হাজির হঠাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে। অবাক হয়ে গেল নমিতা। এই টুক্লা নাকি? সাজগোজ না করুক বেশভূষার আর ঘরকন্নার পারিপাট্য ও সৌখীনতা সম্বন্ধে বেশ সজাগ টুক্লা বরাবর। আজ তার এ কি চেহারা? মাম্লায় হেরে একদিনে সর্বস্বান্ত হ'লেও বুঝি লোকের চেহারা এমন হয় না। নমিতাকে দেখে ওর আরক্ত জলে ভেজা মুখ দুহাতে ঢেকে ফেলল টুক্লা।

সমস্ত শুনল নমিতা। অবশ্যই যা কোনদিনও বলেনি আজও সে কথা বলল না। স্বামীর কাছে ও কতটা উপেক্ষণীয় সেকথা সে উচ্চারণ করতে পারল না। তার আত্মসম্মানে বাধল। কিন্তু নমিতা চালাক মেয়ে, অনেক দেখেছে সে; তার বুঝে নিতে দেরী হ'ল না, বিবাহিত জীবনে পূর্ণতা এলে টুক্লার মতো মেয়ে বাইরে মনের আশ্রয় খুঁজতে যাবে না। কিন্তু প্রকাশ করল না তার মনোভয়, শুধু

নানা যুক্তি তর্ক দিয়ে ঘটনার স্বাভাবিকত্ব সম্পর্কে বোঝাতে চেষ্টা করল। যাতে টুক্‌লা মনের জোর পায়।

কিন্তু আমার বুক যে ভেঙ্গে যাচ্ছে নমিতা। খুকুকে ছাড়া আমার জীবন যে ভাবতেও পারি না।

ঠিকই, প্রথম প্রথম অমন একটু মনেই হবে। কিন্তু মেয়েকে বোর্ডিংএ পাঠিয়ে কোন মা তার জীবনের সব কিছু শেষ হ'ল ভেবে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে?···না টুক্‌লা, এ হ'তে পারে না?

আমি জানি পারে না। কিন্তু আমি যে কোন কাজে উৎসাহ পাচ্ছি না।

কাজে নেমে যা, নিজেকে সারাক্ষণ কাজে ডুবিয়ে রাখ, দেখবি কোন দুঃখই আর তোকে স্পর্শ করতে পারবে না।

হয় না রে, মনের ভেতর শান্তি না থাকলে বাইরে থেকে কাজ দিয়ে কতটুকু সে অশান্তি চাপা দেওয়া যায়?

তাই তো বলছি, কাজে আর বাইরের জীবনে তোর সময় কেটে গেলে, শান্তি অশান্তির কথা চিন্তা করে নিজেকে অসুস্থ করার সময়ই পাবি না তুই।

অর্থাৎ মনের মৃত্যু বলতে চাস। জোর করে মনের সবকটা দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুধু কাজ ক'রে নিজেকে ভোলাতে চাইলে মানুষ হিসেবে বোধ হয় আর আমি বেঁচে থাকব না। একটা কাজের যন্ত্র হ'য়ে যাব নমিতা।

উদাস চোখে তাকিয়ে বলল টুক্‌লা।

যদি বলি সময় সময় প্রয়োজনবোধে মানুষকে খানিকটা যন্ত্র হ'তেই হয়, যতদিন না মনের স্বাভাবিক সুস্থভাব ফিরে না আসে।

চেষ্টা তো করেছিলাম। জানিস! খুকু যাবার পর আমি আফিসে....

জানি! সে খবর পেয়েছি। ওরকম করলে তো হবে না। তাছাড়া উপার্জন না করেও তো কাজ করা যায়।

তাই হোক ঠিক ক'রে ফেলে টুক্‌লা। মরতে যখন সে পারবে না, বাঁচতে যখন তাকে হবেই তখন তো বিলাপ ক'রে আর দুঃখ নিয়ে বিলাস করে বসে থাকলে তার চলবে না। তাকে উঠে দাঁড়াতে হবে। তার জন্য যদি এই জীবনেরই প্রয়োজন হ'য়ে থাকে, তাহলে তাকেই টুক্‌লা স্বীকার ক'রে নেবে। যে রোগের যা চিকিৎসা।

উৎসাহ নিয়ে সব কথা শুনল টুক্‌লা নমিতার। তাদের সমিতির যে সব মেয়েরা নিজেরা কিছু রোজগার করতে চায়; নিরক্ষরতা সেখানে প্রধান অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তাই একটি বয়স্কা শিক্ষার ক্লাশ খোলার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নমিতাদের পাড়ার জন্য ভাবে না নমিতা কিন্তু এ পাড়ায়। ঐই পেয়ারাবাগান বস্তির গোটা মানুষই যে নিরক্ষর। বেশীর ভাগ ছেলেরা কারখানায় কাজ করে, মেয়েরা করে কাছে পিঠের বাড়ীতে ঠিকে ঝি-এর কাজ। তাদের জন্য একটা ক্লাশের ব্যবস্থা না করলেই নয়। নমিতা ঘুরে দেখেছে ওরা উৎসাহী খুব। সমিতির সাধনা আর অনিমার ওপর মেয়ে জোগাড়ের ভার, তাছাড়া ওরা বাধ্য করবে সমিতির সব মেয়েদেরই অন্ততঃ কিছুটা লেখাপড়া শিখতে। শক্ত পায়ে দাঁড়াতে গেলে মাটী শক্ত চাই, সেই ভিজে মাটীকে শক্ত করবে একমাত্র শিক্ষা আর যোগ্যতা।

সব জানে টুক্‌লা। এসব কথা তার কাছে নতুন নয়। কিন্তু তার সমস্যা তো তার স্বামী। তাকে ঠেকাবে কি ক'রে! সব কথা খুলে বলবে কি নমিতাকে? কিন্তু তারপরে কোন অধিকারে সে এই ঘরেই গৃহিণীর আসনে বসে থাকবে? তার নিজের আত্মসম্মানটুকু অন্ততঃ বাইরেও বজায় থাক। অথচ স্বামী, বিশেষ ক'রে অমিতাভর মত লোকের অমতে কোন কাজ করা কি সম্ভব? কিন্তু তার যে ডাক পড়েছে? কি করবে সে? নিজের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ নিয়ে মগ্ন থাকলেই কি চলবে তার? মনে পড়ল তার অশোকের কথা। দিনের পর দিন যার কাছে থেকে শুনেছে টুক্‌লার ভেতরও শক্তি

আছে, শক্তি আছে মহৎ কিছু করবার, এমনি ভাবে নিজেকে অপচয় করবার জন্য সে জন্মায়নি। তার ওপর অশোকের অনেক বিশ্বাস।

নমিতাও যেন এই কথারই পুনরাবৃত্তি করল। তার ওপরই সকলের বিশ্বাস। চিরকাল টুক্‌লা ভাল সংগঠিকা। আর আজ প্রয়োজনের সময় সে পিছিয়ে যাবে ?

না টুক্‌লা পিছিয়ে যাবে না। এতগুলি লোকের বিশ্বাস তার ওপর। সে চেষ্টা করবে, পারবে এতগুলি নীচুতলার মানুষকে খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে সাহায্য করতে। উন্মুখ হয়ে ওঠে তার মন। কথা দেয় নমিতাকে।

মন শক্ত ক'রে, সব যোগাড় ব্যবস্থা করতে পনের ষোল দিন লেগে গেল। অন্ততঃ প্রথম দিন যাতে ভালভাবে একটু উৎসবের মধ্যে দিয়ে কেন্দ্রের উদ্বোধন হয় টুক্‌লা তাই চেয়েছিল। তাহলে একটু আনন্দের স্পর্শ লাগে যেন। আনন্দের ভেতর দিয়ে ছাড়া কোন কাজ টুক্‌লা ভাবতে পারে না। মনে ক'রে হাসি পেল তার, এজন্য বিকাশ তাকে কতদিন ক্ষেপিয়েছে 'ফাংশন ম্যানিয়া' ব'লে। কোথায় সব চলে গেল তারা, নিজের নিজের কর্মময় জগতে।

কিন্তু একটি জীবনমরণ সমস্যার রোগীকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় নমিতা মোটে আসতে পারল না। ফলে উৎসবের পরিকল্পনাটা একদম বাদই দিল টুক্‌লা। শুধু বুধবার দুপুরবেলা মেয়েদের সব আসতে বলল তার বাড়ীতে। ক্লাশ আরম্ভ হবে।

বাইরের ঘরের পাশেই যে ঘরটা এতদিন শুধু একটা তক্তাপোশ আর দুখানা চেয়ার নিয়ে অবহেলায় পড়ে ছিল, সেখানাকেই ধোয়া মোছা করিয়ে জাতে তুলতে চেষ্টা করল টুক্‌লা। খুকুর সঙ্গে সঙ্গে সুবালাকেও বিদায় দিয়েছে টুক্‌লা। তাই ঠাকুর চাকর মেশান

যে লোকটি আছে তারই দিবানিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে সব ব্যবস্থা করল টুক্‌লা।

অমিতাভর কোন চিঠি পায়নি টুক্‌লা। আশাও করেনি কোন। কিন্তু কবে আসবে, কখন আসবে জানতে পারলে খুশী হ'ত।

বেলা তিনটেয় সব আসবার কথা, আড়াইটের আগেই প্রায় সবাই এসে গেল। সাধনাই তাদের নিয়ে এল। ঘরের সামনে দিয়ে যে খোলা বারান্দা তাদের সারা বাড়ীটিকে শাড়ীর পাড়ের মত ঘিরে রেখেছে, সেখানেই বসে পড়ল তারা। কিছু না হোক একটু উদ্বোধন অনুষ্ঠান করবেই টুক্‌লা তাই দরজায় ফুলের মালা দিয়ে বন্ধ রেখেছে। বস্তির কোন মেয়ে অর্থাৎ ছাত্রীকে দিয়ে সে মালা ছিঁড়িয়ে তবে ঢুকতে দেবে অন্য সব ছাত্রীদের।

খুব খুশী হ'ল টুক্‌লা এত মেয়ে প্রথম দিনেই এসেছে ব'লে।

জান টুক্‌লাদি! দুজন আসতে পারল না অথচ তাদের এত আসবার ইচ্ছে ছিল। একজনের অবশ্য ছেলের অসুখ, অন্যজনের স্বামী আসতে দিল না।

ময়নার সোয়ামিটা ষণ্ডামার্কা গো!

অন্য একটি মেয়ে মন্তব্য করল।

আমার ঘরের লোকের তো কতই ইচ্ছে। সে তো আসতে দিতে আপত্তি করেনি, তবে হ্যাঁ ছেলে রাখতে পারবেনি, আগে থেকেই বলে দিয়েছে। তাইতো ছেলেটাকেও টেনে নে আসতে হ'লো।

তা হোক, তাতে কিছু হয়নি। তবু তোমরা হাল ছেড় না। একদিন ওরা বুঝবেই।

কিন্তু টুক্‌লা ওকথা কি ক'রে বলতে পারল? নিজের অভিজ্ঞতা থেকে? দীর্ঘ সাত বছরেও কি তার স্বামী তাকে বুঝেছে? তবু···

তোমরা দাঁড়াও একটু। সাধনা, তুমি কাউকে বল শাঁখটা বাজাবে যখন মালা ছেঁড়া হবে। আপনি এগিয়ে আসুন। আপনিই সমিতির দরজা খুলবেন।

দলের মধ্যে সবচেয়ে বৃদ্ধাকে সম্বোধন ক'রে বলল টুক্‌লা।

বৃদ্ধা, মণ্টুর মা ফোকলা দাঁতে একগাল হাসল।

তোমরা সব বড় বড় নোক থাকতে আমি করবো এ কাজ মা?

আপনিই তো সব থেকে বড় আমাদের মধ্যে, আসুন।

হাসল টুক্‌লা। হাসলে ভারী সুন্দর দেখায় টুক্‌লাদিকে, ভাবল সাধনা। টুক্‌লাদির মনের ছবি যেন মুখে ফুটে ওঠে। টুক্‌লাদির এক মহাভক্ত সাধনা।

ফুলের মালা ছেঁড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শাঁখ বাজাল নির্মলা। আর দলবেঁধে হুড়মুড় করে ঢুকল সব মেয়েরা তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে।

ঘর ভরে গেল। এত মেয়ে হবে ভেবেছিল কে? প্রথম দিন ব'লেই বোধহয় উৎসাহ বেশী, ভাবল টুক্‌লা।

আমরা বেশীক্ষণ বসতে পারবনি আজ!

ওপাশ থেকে রেবতী জবাব দিল।

আমরা তো তোমাদের মত স্বাধীন নই গো দিদিমণি। আমার সোয়ামী তো এসতেই দিতে চায়নি। কত কষ্টে যে এয়েছি।

স্বাধীনই বটে। ভাবল টুক্‌লা। কতটুকু জানে ওরা দিদিমণির জীবন।

খিলখিল ক'রে হেসে উঠল রেবতী।

হু হু বাবাঃ আমার যেমন তেমন সোয়ামী নয়। একটু এদিক ওদিক হলেই গেছি। দেরী করলে আজ আর পিঠের হাড় কখানা আস্ত রাখবেনি।

অবাক হ'য়ে গেল টুক্‌লা! এত বড় কথাটা ত নিঃসঙ্কোচে, হেসে বলে দিল রেবতী! এজন্য লজ্জা বোধ হ'ল না! তাকিয়ে দেখল সবাইয়ের দিকে। কারও মুখে কোন ভাবান্তর নেই। এ ঘটনা তাদের কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক। না হ'লেই বোধহয় আশ্চর্য হ'ত তারা।

যাক্ শোন।···

গম্ভীর হয়ে আরম্ভ করে টুক্‌লা। তাদের লেখাপড়া শেখার ও এই কেন্দ্রটি খোলার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নীতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতাও

দিয়ে ফেলে। তারপর তাদের কাছে ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল জীবনের ছবি তুলে ধরে। অনেকের চোখ মুখের ভাব বদলে যায়। কারও মুখে অবিশ্বাস।

অত কথা জানিনে বাবু। আমাদের কপালে কি আর সুখ ঐশ্বর্য আছে তাহলে আর এমন ভাবে জন্মো নেব কেন। তাই পরকালটা সুখে থাকে যেন এই চাই। তুমি আমায় এমন লেখাপড়া শেখাও যাতে অন্ততঃ রামায়ণ মহাভারতটা পড়তে পারি।

মণ্টুর মা ধীরে ধীরে বলে কথাগুলো। অনেক দেখেছে সে এই পৃথিবীর। নিত্য আশায় উদ্ভাসিত হবার বয়স তার চলে গেছে, এখন ধীরভাবে মেনে নিয়েছে সে এই বর্তমান জীবনকে। কিন্তু মৃত্যুর পরে? তখনও কি এই জীবনের পুনরাবৃত্তি? তাই লেখাপড়া শিখে সে ধর্ম পাঠ করে তার পরকালের রাস্তা পরিষ্কার করতে চায়। ইহকালের চিন্তায় কাজ নেই তার।

ব্যথায় ভরে যায় টুক্‌লার বুক। দুচোখে প্রগাঢ় সমবেদনা নিয়ে সে বলে।

পারবেন বৈকি মণ্টুর মা। পারবেন নিশ্চয়ই।

আমায় আর আপনি বল না দিদিমণি। লজ্জা লাগে।

আচ্ছা তুমিই বলব। সকলে সমান আমরা।

উৎসাহটা একটু বেশীই যেন টুক্‌লার।

সাধনা আমরা ভাই ক্লাশটিকে দুটি ভাগ করে নেব। পড়া আর সেলাই এই সব। যখন একদল পড়া শিখবে, অন্যদল সেলাই বা অন্য হাতের কাজ, আর অন্য সময়ে এর বদল হবে। কি বল?

হ্যাঁ হ্যাঁ তাই ভাল।

সাধনা সম্মতি জানায়।

ঘরে বড় গোলমাল হচ্ছে। কারও ছেলে কাঁদছে, কারও নিজেরই গলা সপ্তমে চড়িয়ে কথা বলার অভ্যাস, তাই লেখাপড়ার ক্লাশটি অন্য ঘরে করার চিন্তা টুক্‌লার মাথায় এল।

শোন তোমরা, যাদের নাম আমি ডাকছি তারা এস আমার সঙ্গে, ওঘরে আমাদের পড়ার ক্লাশ হবে।

খুকুও নেই, সারা বাড়ী ফাঁকা। ওদের নিয়ে একেবারে শোবার ঘরের লাগোয়া ঢাকা বারান্দায় এনে বসাল টুকলা।

হ্যাঁগা দিদি—তোমাদের অন্দরে একেবারে এনে ফেললে আমাদের, তা তোমার কত্তা কিছু বলবেনি?

না না! এতো ভালো কাজ বলবেন কেন উনি? শোন তোমাদের....

বাইরে কলিং বেল বেজে উঠল।

সাধনা গিয়ে দরজা খুলে দিল।

ট্যাক্সী থেকে নেমে ভাড়া দিচ্ছে অমিতাভ। একটু অপ্রস্তুতে পড়লেও নিজেকে সামলে নিল সাধনা। গাড়ীর শব্দ, দরজা খোলার শব্দে কাঠের মত হ'য়ে গেল টুকলা।

দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে সাধনা পরিহাসের সুরে হেসে বলল।

আজ আপনার বাড়ী চড়াও করেছি সব। সব ঘরই বেদখল।

হুঁ।

গম্ভীরভাবে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকল অমিতাভ।

যতীন গেল কোথায়?

চীৎকার করে উঠল অমিতাভ।

ট্যাক্সী থেকে মালগুলো নামাতে পারে না?

দ্রুতপায়ে এগিয়ে এল টুকলা।

ও সবে এই শুয়েছে। সারা দুপুর···

তা হলে মালগুলো আমি নিজেই নামাই···

তা কেন? আমি ডেকে দিচ্ছি। তুমি সুস্থির হ'য়ে ব'স গিয়ে শোবার ঘরে।

শোবার ঘরে যেতে গিয়ে থমকে গেল অমিতাভ। ব্যাপার

কি ? দিনকুড়ি ও ছিল না এর মধ্যে কি কাণ্ড ক'রে বসেছে টুক্‌লা ? তাকে না জানিয়ে সমস্ত বস্তির মেয়েদের বাড়ী ভাড়া দিয়ে বসেছে নাকি ?

এদিকে শোন।

গম্ভীর বাজের মত গলায় ডাকল অমিতাভ। যতীনকে উঠিয়ে টুক্‌লা মেয়েদের একটু বসতে বলল। আবার ডাক এলো।

কি ? শুনছ ?

যাচ্ছি।

যাচ্ছি নয়, এখনি এসো।

শোবার ঘর থেকে অমিতাভর ক্রুদ্ধ গলার আওয়াজ আসে।

তোমরা ব'সো ভাই, আমি আসছি।

ঘরে ঢুকতে গিয়ে একটু দাঁড়ায় টুক্‌লা। দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা চেপে ধরে। তারপর সোজা ঘরের মাঝখানে গিয়ে হাজির হয়।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় চীৎকার করে ওঠে অমিতাভ।

ব্যাপার কি ? একটু বাইরে গেছি অমনি একেবারে স্বাধীন ? একেবারে বাড়ীর ভেতর ?

আস্তে বল, আস্তে তোমার পায়ে পড়ি।

কিসের আস্তে ? ভয়টা কাকে ? তোমাকে না ঐ সব ছোট লোক বস্তির মেয়েদের নাকি ?....

দোহাই তোমার ! আমি তো ভাবিনি তুমি আজ ফিরে আসবে, তাহলে···

তা তো ভাববেই না। একেবারেই ফিরব না ভেবেছিলে বোধ হয়। তাতেই বোধ করি সুবিধে হত।

তুমি বস, আমি তোমার চায়ের ব্যবস্থা দেখি।

টুক্‌লা ক্লেদাক্ত আবহাওয়াকে আর বাড়াতে চাইল না।

তোমার হাতে চা খেতে আমার প্রবৃত্তি নেই।

কেন ?

সে উত্তর আমি দেব না। তবে জেনে রেখ এই সব আমি সহ্য করবো না। এ সব যে কার মর্‍্যাল-সার্পোটে হচ্ছে তা আমার তো অজানা নেই।

অমিতাভর নির্লজতায় অবাক হয়ে গেল টুকুলা। এখনইকি ও ফিরে আসছে না বম্বে থেকে তার সবিতার সঙ্গে মহানন্দে প্রায় এক মাস কাটিয়ে? কি বলবে সে? শুধু অসহ্য ঘৃণায় তার মুখ থেকে বেরোল—ছিঃ—

ছিঃ কিসের? ঐ সব ছোটলোক বস্তির মেয়েদের এ বাড়ীতে কেন ঢুকিয়েছ বল? কার হুকুমে?

—হুকুম আবার কিসের? নিজের সংসারে দুটো ভাল কাজ ইচ্ছেমত করতে পারব না?

ভাল কাজ? ইচ্ছে মত? কতগুলো ছোটলোকের হট্টগোল ভাল কাজ? এটা ভদ্রলোকের বাড়ী নয়?

এখন তোমাকে দেখে তা মনে হচ্ছে না!

চাপা অথচ জোর গলায় বলল টুকুলা।

কি বললে?

যা বললাম তা তো স্পষ্টই শুনতে পেলে!

ও! আমাকে ভদ্রলোক মনে হয় না। তা জানতে পারি তোমার আদর্শ ভদ্রলোক কে?

ভদ্রলোক সকলেই!

কেবল আমি ছাড়া, না?

তাই!

বাঃ সুন্দর! নিজের বাড়ীতে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম পাব না; সমাজ-সেবার নামকরে ঘুরে বেড়ান আর বাড়ীতে রাজ্যের হট্টগোল আনাই বুঝি একমাত্র কাজ তোমার?

সে তুমি বুঝবে কি করে?

আমি বুঝব না মানে? শোন তোমায় বলে দিচ্ছি সত্যিই তোমার

এ সমস্ত আমি বুঝি না, কিন্তু আমার স্ত্রী আমার মতেই চলবে।

স্ত্রী হিসেবে কতটুকু মর্য্যাদা তুমি দাও ?

যতটুকু তোমার প্রাপ্য তাই দিই।

তার প্রাপ্য এই ? অস্থির লাগে টুক্‌লার। কিন্তু বাইরে সব মেয়েরা বসে, বাজে কথায় মাথা ঘামালে চলবে না। বেরিয়ে যেতে গেল টুকলা।

শোন। এখনি ঐ মেয়েগুলোকে বিদেয় করে দাও।

তা সম্ভব নয়।

কেন ? ক্রমশঃ বাড়ীটা একটা সরাইখানা করে তুলবে নাকি ?

লোকজন আসাকে সরাইখানা বলে না।

কি বলে না বলে তা আমি জানি।

যেন গর্জন করে উঠল অমিতাভ।

ওসব চলবে না, এখানে। আমার বাড়ীতে আমার কথাই সব ; যাও।

নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে এল টুকলা।

ওরা সব শুনেছে বোধ হয়। পাশের ঘরই তো। ওদের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারে না টুকলা। কি বলবে ওদের ও ! বাড়ীতে ডেকে এনে অপমান।

টুক্‌লাদি, আজকের মত আমরা যাই। সাধনা ওর অপ্রস্তুত অবস্থা বাঁচাবার চেষ্টা করল।

আবার পরে হবে এখন। আমি এসে তোমার সঙ্গে কথা বলে পরে সব ঠিক করে যাব। আজকের মত যাই আচ্ছা।...

ওদের বিদায় দিয়ে শূন্য দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল টুকলা বারান্দায়। আজকের মত নয়, তার থেকে বেশী আর কে জানে যে চিরদিনের মতই বাড়ীতে এ সব শেষ হয়ে গেল। দরজা যেন খুলি খুলি করেও খুলল না।

পাশাপাশি বাস করেও সমুদ্রের ব্যবধান। খুব জব্দ করেছে অমিতাভ টুক্‌লাকে। অমিতাভর কি ক্ষতি করেছিল টুক্‌লা তা সে জানে না, কিন্তু পৃথিবীতে এর থেকে বড় শাস্তি আর কেউ কাউকে দিতে পারে ব'লে টুক্‌লার জানা নেই।

একটি ফুল ফুটেছিল, তাকে তোলবার কি দরকার ছিল? নাকি সেই ফুল তুলে এনে তার পাপড়িগুলোকে ছিঁড়ে কুটি কুটি ক'রে হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়াতেই সুখ? কিছুই বুঝতে পারে না টুক্‌লা। মনের দিক থেকে ও সম্পূর্ণ নির্বাসন দিয়েছে অমিতাভকে থাকবে সে তার নিজের জীবন নিয়ে। আগে যে মুক্তির কথা ভেবে সে উল্লসিত হয়েছিল আজ সে মনোভাব আর নেই। কোন কিছুতেই আর যেন সে উদ্বেলিত হবে না। ভালবাসা পাবার বা ভালবাসার তার কোন অধিকার নেই, এই সহজ সত্যটি সে মেনে নিয়েছে তার হৃদয় শান্ত হয়েছে, একটি স্থির প্রশান্তি এসেছে তার জীবনে।

চিঠি পাচ্ছে খুকুর আঁকা-বাঁকা অক্ষরে। ভাল আছে সে। কি খেয়ালে অমিতাভ এটুকু থেকে তাকে বঞ্চিত করেনি। শুধু এটুকুর জন্যই সে কৃতজ্ঞ অমিতাভর কাছে।

সারা কোলকাতায় প্রচণ্ড আলোড়ন চলেছে। একটি বিক্ষুব্ধতায় সারা জীবন চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। টুক্‌লাদেরও বিরাম নেই সভা-

সমিতি, সংগঠনী কাজ, সবকিছুর মাঝে ব্যস্ত রাখছে টুকুলা নিজেকে। তার কর্মক্ষেত্রের পরিধি থেকে গেছে। আস্তে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে সে বৃহত্তর জনসমাজের মাঝখানে।

সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছে। শরীরটাও তেমন ভাল নেই টুকুলার কিন্তু আজ তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া করে বেরোতে হবেই টুকলাকে, উপায় নেই। আজ মেয়েরা মিছিল করে যাবে ডালহৌসী স্কোয়ার। তাদের সমিতির ওপর ভার এ অঞ্চলের সব মহিলা কর্মীদের জড় করে বিরাট শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাবার। কদিন খাটুনি গেছে অনেক, আজ সকাল থেকেই জ্বর ভাব। অমিতাভর ব্যঙ্গ বিদ্রুপকে উপেক্ষা করেই কাজ করে চলে টুকুলা, আজও তো তার ব্যতিক্রম হবে না জানত। ঐ ব্যাপারের পর থেকে অমিতাভ একদম গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে।

অনেক বেলা অবধি শুয়ে রইল টুকুলা তার নিজের ঘরে। অমিতাভ খুব বেলা অবধিই ঘুমোয়, কিন্তু টুকুলা দিনের আলো ফুটলে আর ঘুমাতে পারে না, উঠে পড়ে। নিজের কাজকর্ম করে কিছু ক্ষণ পড়াশুনা করে, কোনকোন দিন দুপুর না হলে সন্ধ্যাতে সে পড়ে। তার তো দুটিই এখন অবলম্বন। পড়া আর কাজ। গতকাল রবীন্দ্রনাথের গোরা পড়তে পড়তে ও মনে কত জোর পেল। গোরা ওর কাছে ধর্মগ্রন্থের মত। আর টলষ্টয়ের 'ওয়ার এ্যণ্ড পীস' বারবার পড়েও আশমেটে না। কতদিন আগে লেখা তবু জীবনের সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে এ কাহিনী ওর কাছে কোনদিনই পুরান হয় না। সেও জানে জীবনকে। ভালবাসাই দেবতাকে ভালবাসা ....লাইফ ইজ গড।

সকাল বেলায় অলসভাবে বিছানায় শুয়ে ছিল আর এইসব কথা ভাবছিল। একবছর হল প্রায় খুকু তার কাছে নেই। কত সুন্দর

না জানি হয়েছে সে, কত পাকা পাকা কথা শিখেছে বোধ হয়। আগে কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল খুকু ছাড়া তার জীবন? কিন্তু কই সে তো ঠিক বেঁচে আছে, খুকু ছাড়াও তো তার জীবন তেমনি চলে যাচ্ছে। খুকুর অভাব শত সহস্র খুকুর ভেতর মেটাবার জন্য সে চেষ্টা করছে। কিন্তু তার তৃষ্ণা মিটছে কি?

অমিতাভর জন্য মায়া হল তার, কি অদ্ভুত প্রকৃতি তার। নিজেও সুখী হলনা টুক্লাকেও হতে দিল না। কি করে সে একা একা দিন গুলো কাটায়, মাঝে মাঝে বোধ হয় বম্বে ঘুরে আসে, কিন্তু তাতেই কি তার সব তৃষ্ণা মিটে যায়? জীবনের কাছে তার চাহিদা এত অল্প? কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে যায় অমিতাভ শিল্পী, প্রতিভাবান। সে তো এ জগতে থেকেও অমৃতময় জগতের সন্ধান পেতে পারে তার শিল্পের মাধ্যমে। তাই দানবের মত ব্যবহার করেও সে শান্তি খুঁজে পায় ষ্টুডিও ঘরে, হত্যার পরও যেন তার সৃষ্টির আনন্দে স্নান করে সে স্নিগ্ধ শুচি হতে পারে। কিন্তু টুক্লার সে পথ কই? ও যদি এমন একটা কিছু নিয়ে সব ভুলে থাকতে পারত! যদি গানের অভ্যাস রাখত তার ভেতর দিয়েও সে অমৃতলোকের আস্বাদন ক্ষণিকের জন্যও পেতে পারত।

আবার মনে হল নাই বা হল সে শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ বা সাহিত্যিক। মানুষের কল্যাণে যে কাজ সে করছে, তাও কি তাকে আত্মার অমরত্ব দেবে না? এতগুলি লোকের ভালবাসা কি কিছুই নয়? তা হলে তাদের সুখ দুঃখ, তাদের হাসি কান্না, তাদের ভালবাসার উত্তাপ কি করে টুক্লাকে ভরিয়ে রাখছে? চোখে জল এসে গেল টুক্লার, এই পৃথিবী এত সুন্দর, মানুষ এত ভাল, মানুষের উপর, পৃথিবীর আনন্দের গানে কোনদিন সে বিশ্বাস হারাবে না, মাঝে মাঝে অবসাদ তো আসবেই। যেমন দিনের পর রাত্রি। তাই বলে দিনতো মিথ্যা হয়ে যায় না। জীবনই সত্য, আবার সে মনে মনে বলল, লাভ ইওর লাইফ...লাইফ ইজ গড।

পাশ ফিরে শুল টুকলা, একটা পাখী এসে তার ঘরের চারদিকে ঘুরছে আর শব্দ করছে। টুকলার মনে পড়ল, সেই ছেলেবেলার চড়াইটার কথা। কত হাসাহাসি করেছে ওরা দুই বোনে, ওই চড়াইকে নিয়ে। কোথায় কত দূরে আজ দিদি কত দূরে চলে এসেছে সে, সেইসব জীবন থেকে।

ভোর রাত থেকে বৃষ্টি পড়ছে। ভারী ভাল লাগে টুকলার এমনি ঝরঝর শব্দ শুনতে। এখন শুয়ে শুয়ে বৃষ্টির শব্দ শোনা ওর বিলাস। আগে হলে অবশ্য উঠে পড়ে জল ধরত, গান গেয়ে উঠত, কিন্তু এখন আর বৃষ্টি ওকে মাতাল করে তোলে না। বিয়ের পর থেকেই অমিতাভর রুক্ষতায় সে নির্ঝরের কল্লোল স্তব্ধ হয়ে গেছে। এখন শুধু উপভোগ করে শুয়ে শুয়ে। ঝর্‌ঝর্‌ শব্দ আর ঝর্‌ঝর শব্দ 'আজি ঝরঝর মুখর বাদল দিনে'। কতদিন গান গায়নি সে, আর বোধহয় গাইবেও না কোনদিন!

উঠে পড়ল টুকলা। না আর দেরী করা চলবে না। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে একটু আগেই যেতে হবে অমলাদির বাড়ী। আজকের এই আন্দোলনে প্রত্যেক জায়গা থেকে এত জনসমর্থন পাওয়া গেছে যে, আন্দোলনের সফলতা সম্বন্ধে ওদের কারও সন্দেহই নেই। অমলাদি ভার নিয়েছেন শিক্ষিকা ফ্রন্টের। তাই ওঁর সঙ্গে দেখা করে মেয়েদের মিছিল বার করতে হবে। নমিতা আর তার মা আসবেন নার্সদের মিছিল নিয়ে, যারা সরকারী কাজ করেন তারা ছাড়া বেশীর ভাগ মেয়েই যোগ দিচ্ছেন এতে! প্রচুর সমর্থন পাওয়া গেছে।

দুপুর থেকে বৃষ্টিটা এত জোরে এল যে রীতিমত খারাপ লাগল টুকলার। সকলেই কিছু পুরো উৎসাহ নিয়ে আসছে না, কিন্তু এই সুযোগে তারা না আসবার একটা অছিলা পাবে। অথচ অমলাদির

বাড়ী পৌঁছে রীতিমত অবাক হ'য়ে গেল সে। নিজের ওপর লজ্জা হ'ল এদের আন্তরিকতায় সন্দেহ করেছিল ব'লে।

মিছিল এগিয়ে চলল।

আগে আগে টুকলা আর অমলাদিরা। নানারকম শ্লোগান আর ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত। রাস্তার দুধারে লোক দাঁড়িয়ে মেয়েদের এই মিছিল দেখছে। কেউ কেউ সমর্থন করে সমবেদনা প্রকাশ করছে। আবার ব্যঙ্গোক্তি করতে কেউ কেউ ছাড়ছে না। কিন্তু মেয়েদের ভ্রূক্ষেপ নেই, তারা এগিয়ে চলেছে, তাদের দাবীটুকু প্রতিষ্ঠার জন্য।

"আমাদের দাবী মানতে হবে"

"মহিলা সমিতি জিন্দাবাদ।"

কত রকমের শ্লোগান। কত রকমের ফেষ্টুন আর ব্যানার।

সমস্ত আবেদনের গোড়াতেই ঐ এক কথা তাদের ছেলেমেদের মুখে অন্ন দেবার জন্য দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা হ'ক।

চৌরঙ্গী পেরিয়ে মিছিল চলল এগিয়ে। এসপ্ল্যানেডের কাছে এসে আর এগোতে পারছে না। চারিদিক থেকে তখন মেয়েরা এগিয়ে আসছেন অনেকগুলো নদীর মত। কালো ছাতায় চারিদিক ঢেকে গেছে। তবু মিছিলের বিরাম নেই। আসছে তো আসছেই।

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে বর্ষাতি আর টুপি মাথায় পুলিশ বাহিনী। ব্যস আর নয়। নির্দেশ এল। আর এগোন চলবে না। এর পরের এলাকায় একশ চুয়াল্লিশ ধারা জারী হয়ে গেছে।

কয়েকজন এগিয়ে গেল। টুকলা আর অমলাদি সব থেকে আগে। টুকলার মনে পড়ল বহুবছর আগেকার সেই মিছিলের কথা, আর এখন?

আমাদের পথ ছাড়ুন, আমরা যাবই।

মাপ করবেন, আমাদের ওপর হুকুম নেই।

কিন্তু আমরা তো যাবই আমাদের ঠেকাবে কে ?

আমরা চেষ্টা করবো।

হঠাৎ কি হ'ল। সব নিস্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিল হঠাৎ ছত্রভঙ্গ হ'য়ে সেই জনতা আর মেয়েদের মিছিল এগিয়ে আসতে লাগল সামনে।

টুকলা আর অন্য দলনেত্রীরা প্রমাদ গণলেন। কে তাদের এ নির্দেশ দিল ? এ কি করছে তারা উন্মাদের মত। নিরস্ত্র জনতার রক্ষা ভার এখন কে নেবে ?

সামনে রাখা বড় বড় ড্রামগুলো ঠেলে ওদিকে চলে যেতে চাইল মেয়েরা। ওপাশে সারি সারি কালো পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে রয়েছে। হঠাৎ শোনা গেল পটাপট শব্দ।

সরে যাও সব লাঠি চার্জ হচ্ছে ?

লাঠি চার্জ ?

হ্যাঁ, আর টিয়ার-গ্যাসও বোধ হয়।

একজন লোক আহত হয়ে পড়েছে। দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ধরল টুকলা। চীৎকার করে উঠল—

কি করছ তোমরা পাগলের মত ?

কে শোনে কার কথা। লাঠি চার্জের শব্দ। প্রতিপক্ষের জনতার থেকে ইঁট ছোড়া আর টিয়ার-গ্যাসে এক মুহূর্তে যেন একটি রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে গেল সেই জায়গাটা।

আপনি আমার কাঁধে ভর দিন।

লোকটিকে ধরে তুলতে সাহায্য করল টুকলা। ওর অসহ্য কষ্ট হচ্ছে টিয়ার-গ্যাসে। মাথায় খুব জোর লাঠির চোট লেগেছে।

ওকে ছেড়ে দাও টুকলাদি। ওকে চেন ?

না, কেন ?

ওকে জান না! স্পাই। ওই তো সব খবর দেয়।

স্পাই! তা এখানে কি করতে?

মা! জল! আমায় একটু জল দিন। আমায় দয়া করুন—

প্রচুর মমতা দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল টুকলা।

জানি না সাধনা স্পাই কিনা। কিন্তু এখন এ আহত। আহতর জাতি বিচার বা গুণাগুণ বিচার নেই। তুমি আমায় সাহায্য কর। একে একটু পাশে নিয়ে যাওয়া দরকার।

কিন্তু টুকলাদি···

থাক সাধনা, দেরী ক'র না। বড্ড বেশী রক্ত পড়ছে। এখুনি একে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। এত বৃষ্টিতে কাকে যে পাই, যা গণ্ডগোল।

বৃষ্টি বলে বাঁচোয়া, টিয়ার-গ্যাস অতটা কাজ করতে পারছে না। তাছাড়া লাঠি চার্জ অবশ্য ফাঁকায়ও হচ্ছে খানিকটা।

দুজনে মিলে আহত লোকটিকে পাশে কার্জন পার্কে সরাতে সরাতে সাধনা বলল।

অন্ধকার রাত্রি, তখনও ধোঁয়া চীৎকার আর হট্টগোল মিলিয়ে এক অদ্ভুত অবস্থা হয়েছে জায়গাটার।

অনেককে এ্যারেষ্ট ক'রে গাড়ীতে পুরছে।

জানি। সাধনা বলল।

এই ছেলেটির জন্য আটকা পড়ে গেলাম, অথচ অমলাদিদের যে কি হ'ল তা জানি না। তুমি একটু দাঁড়াও তো সাধনা আমি এগিয়ে দেখি।

না টুকলাদি আমার বড় ভয় করছে, তাছাড়া লোকটি যে কিরকম করছে।

ভয় কিরে পাগলা। আচ্ছা দাঁড়া দেখি যদি কোন গাড়ী ধরতে পারি। একে একটা হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হবে।

সারা কাপড়ে রক্তমাখা ভেজা উদ্‌ভ্রান্ত টুক্‌লাকে এখানে দেখে অশোকও কম অবাক হয়নি। . ওদের গাড়ী সব ঘুরিয়ে দিচ্ছে তাই গাড়ী ব্যাক করতে গিয়ে বিদ্যুতের আলোতে হঠাৎ টুক্‌লাকে আবিষ্কার করল যেন অশোক।

আপনি এখানে? কি ব্যাপার? এ অবস্থা....

পরে বলছি শীগিরই গাড়ীটা ওদিকে ঘুরিয়ে আসুন, এদিকে গাড়ী দাঁড়াতে দিচ্ছে না। একটি লোক···

ওর শেষ কথা শুনতে পেল না অশোক। গাড়ী ঘুরিয়ে এপাশে এসে সন্তর্পণে আহত লোকটিকে তুলল গাড়ীতে। বৃষ্টির জলে, ওদের ভেজা জামা কাপড়ে আর রক্তে সিট মাখামাখি হ'য়ে গেল। সাধনাকে সামনে বসতে ব'লে ওর মাথাটা কোলে নিয়ে পেছনের সিটে বসে পড়ল টুক্‌লা।

ওকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে আবার যখন ওরা এসে গাড়ীতে উঠল তখন টুক্‌লার অবস্থাটা আচ্ছন্নের মত। অশোক ধরে না ফেললে পড়েই যেত বোধ হয়।

সামনের সিটেই ধরে ওকে বসিয়ে দিল অশোক। সিটে মাথা এলিয়ে দিয়ে নির্জীবের মত পড়ে রইল টুক্‌লা। জ্ঞান আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না। আর তার পাশে নীরবে বসে গাড়ী চালাতে লাগল অশোক। তার অসম্ভব ইচ্ছে করছিল এ প্রিয় দেহ থেকে যত্নে ভালবাসায় সব শ্রান্তি মুছিয়ে দেয়, কিন্তু কোনটাই সম্ভব নয়, তাই ওর দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে গাড়ী চালাতে লাগল অশোক। ওর গলাটা আবেগে বন্ধ হ'য়ে আসছে।

সাধনাকে তার নির্দেশ মত জায়গায় নামিয়ে দিয়ে টুক্‌লাদের বাড়ীর পথ ধরল অশোক। আবার সেই লেকের পাশ দিয়ে গাড়ী ছুটছে। এবার ওর মুখের দিকে একবার পূর্ণ উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকাল অশোক।

শুনছেন।

সাড়া নেই কোন।

এই! শুনছেন।

টুক্‌লার নড়বার বা সাড়া দেবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

এই! কি হ'ল তোমার।

প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠল অশোক। বুঝতে বাকী নেই, অচেতন টুক্‌লার দেহ একহাতে জড়িয়ে নিজের কাছে টেনে নিল তারপর অন্যহাতে ষ্টিয়ারিং ধরে গাড়ীর গতি বাড়িয়ে দিল অশোক।

তার দুচোখ বেয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। হায় ঈশ্বর, কত কষ্টে কত সংযমের পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এতদিন কাটাল সে। আজ এ কি পরীক্ষায় তাকে ফেললে! যে প্রিয় দেহ অচেতন অবস্থায় তার কাছে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করে আছে, তার ওপর তার কোন অধিকারই নেই, কোনদিনই হয়ত হবে না। কিন্তু···তার সমস্ত হৃদয়টা মুচড়ে দুমড়ে যেতে লাগল। শক্তি দাও ঈশ্বর। নিজের মনের গোপন বাসনা দিয়ে তার অতি প্রিয়জনের জীবনে কোন অশান্তি না আসে। তার থেকে থাক সে গোপন চিরদিন। কোনদিন জানবে না কেউ। কিন্তু আজ যেন আর পারছে না সে। ওকে ভাল করে জড়িয়ে নিজের আরও কাছে টেনে নিল অশোক। সোজা নিজেদের বাড়ীতেই নিয়ে যাবে। সেবার এ অধিকারটুকু, হোক না সে ক্ষণস্থায়ী, সে হারাবে না। সেই অধিকারবোধই যেন টুক্‌লার সমস্ত সম্ভ্রম রক্ষার দায়িত্ব নিজের ওপর নিল।

টুক্‌লার অচেতন দেহ নিজেই বহন করে নিয়ে এল তার শোবার ঘরে। প্রশস্ত নিজের স্প্রীং দেওয়া খাটের ওপর তাকে শুইয়ে দিল।

হরিয়া, জল্‌দি পানি লাও। ঠাণ্ডা পানি।

রেফ্রিজারেটর খুলে ঠাণ্ডা জল বার করে দিল তার বেহারী চাকর হরিয়া। একাই থাকে সে। তাই অন্য স্ত্রীলোক না থাকায় ও টুক্‌লার ঘাড়ে, কানে ঠাণ্ডা জলের হাত বুলিয়ে দিয়ে মুখে জলের ঝাপটা দিল। কাপড় চোপড় একটু আলগা করে দেবার প্রয়োজন, কিন্তু একটু সঙ্কোচ বোধ করল। তারপর মুহূর্ত দেরী না করে ওর জামা কাপড় আলগা ক'রে দিল! মনে মনে বলল, কোন ভয় নেই তোমার, আমার হাতে তোমার সব সম্মানের ভার, আমি তুলে নিলাম, নিশ্চিন্ত থাক তুমি।—

একটু পরেই চোখ খুলল টুক্‌লা। ভাবতে চেষ্টা করল সে কোথায়। উঠতেও চেষ্টা করল।

কেমন আছ এখন ?

গভীর স্নেহে জিজ্ঞাসা করল অশোক!

তুমি!....

সমস্ত চোখ জলে ভরে এল টুক্‌লার। তারপরই গভীর নির্ভরতায় অশোককে জড়িয়ে ধরল।

ওর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে আস্তে আস্তে বলতে লাগল অশোক।

"হ্যাঁ আমি, আর কেউ নয়। আমি তোমার···বুঝলে····কোন ভয় নেই....আমি···"···

ভগবানকে ধন্যবাদ···ভাবল টুক্‌লা তারপর অশোকের হাতটা টেনে নিয়ে গালের ওপর ধরল।

কতক্ষণ কেটেছে তার ঠিক নেই। তাদের সব ব্যবধান, ঔচিত্য-বোধের অনুভূতি বুঝি দূর হয়ে গেছে। শুধু দুটি হৃদয় গভীর আবেগে সম্মিলিত হয়ে একটি স্থির দীপশিখার মত জ্বলতে লাগল।

বাড়ীর দরজায় ওকে নামিয়ে নিয়ে আবার গাড়ীতে স্টার্ট দিল অশোক।

নামবে না ?

খুব আস্তে জিজ্ঞেস করল টুকুলা।

ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল অশোক। চোখটা একবার বুজে, উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে বলল।

নাঃ, আজ নয়।

আচ্ছা !

গিয়ে রেষ্ট নাও। বুঝলে ?

হ্যাঁ...

খুব ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে ঢুকল টুকুলা। অমিতাভ তখনও ফেরেনি। বাঁচা গেছে। এই মুহূর্তে যে মধুর আবেশে তার সারা মনটি ভরে আছে, সে সুরটুকুই আজ আরও কিছুক্ষণ বাজতে থাক। ভালই হয়েছে অমিতাভ নেই। আবার সেই কঠিনতার সঙ্গে যুদ্ধ, আবার সেই ক্লান্তিকর কথা কাটাকাটি।

অসম্ভব মধুরতায় ভরে গেছে সারা মন। পূর্ণতার আস্বাদ পেয়েছে যেন টুকুলা। নিজের মনেই অনেকদিন বাদে গানের সুর গুণগুণ করে উঠল। মনে পড়ল 'নবীন মেঘের সুর লেগেছে' গানখানি। তখন অশোক ভাবতেও পারেনি যে টুকুলার মনে সুর লাগাবে। মধুর পৃথিবী, মধুর সে ভালবাসা, সে ভালবাসা পেয়েছে, ধন্য সে আজ।

মনে পড়ল অনেকদিন আগেকার রাত। বিকাশকে ভালবাসে বলে যখন সে মনে করত। এখন মনে হয় ছেলেমানুষি। সব ছেলেমানুষি। এমন কি স্বামীকেও বোধহয় সে সত্যি ভালবাসেনি। আবার নিজের মনেই উত্তর পেতে চাইল! স্বামীকে সে ভালবেসে ছিল, কিন্তু ফুলকে দলিত করার মত তার সমস্ত ভালবাসা, দুপায়ে মাড়িয়ে দিতে চেয়েছে অমিতাভ। নিষ্ঠুরের মত তার সমস্ত হৃদয়কে ভেঙ্গে দিয়েছে সে, কোনদিনই ভালবাসেনি তাকে।

সংসারের সমস্ত কাজ কর্তব্য, সমাজ সেবা, তাই কিছুতে পূর্ণতা দিতে পারেনি টুকলাকে। হ্যাঁ বারবার মনে করল টুক্লা, সমাজের দৃষ্টিতে তার এ ভালবাসা অন্যায়। এ ভালবাসা গ্রহণ করাও তার অন্যায় কিন্তু সেও মানুষ, যন্ত্র নয়। সে ভালবাসতে চায়। ভালবাসা পেতে চায়। বারবার উচ্চারণ করতে লাগল টুকলা আই নিড টু বি লাভড্—আই নিড টু বি লাভড্।

রাতে বিছানায় শুয়ে কিছুতেই ঘুমাতে পারল না সে। অজস্র চিন্তা ভাবনা অমিতাভর কথা, খুকুর মুখ, সব তাকে পাগল করে দিল। দাঁত দিয়ে শাড়ীর আঁচলটা কাটতে লাগল। অজস্র কান্নায় তার বালিশ ভেসে যেতে লাগল।

এ কান্নার জন্ম শুধু দুঃখে নয়, অসহায় মনের নয় এর সঙ্গে মেশান রইল তার চরম আনন্দ, চরম তৃপ্তির মধুরতাও। এক অজানা আতঙ্ক, এক অদ্ভুত ভয়, এক অনির্বচনীয় আনন্দে মেশা এ কান্না। তার বুকটা মুচড়ে দুমড়ে ভেঙ্গে গেলেও সে শান্তি পেত। সে পারে না, আর সে পারে না। একি হোল তার! সে ভালবাসে, অশোক তাকে ভালবাসে। কি সুখ এ চিন্তায়, কি অনাস্বাদিত তৃপ্তি এ কল্পনায়, কি যন্ত্রণা আর ভয়, এ সম্ভাবনায়। ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল টুক্লা, বার বার মনে হতে লাগল, হাল ভাঙ্গা

নৌকার মত অনির্দিষ্টভাবে ঘোরা বুঝি তার শেষ হোল, সে আশ্রয় পেয়েছে, সে ভালবাসা পেয়েছে, পরম নির্ভরতার সঙ্গে সে ভালবাসা, সে আশ্রয়কে সে অন্তরে গ্রহণ করল।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে ভোরের দিকে। ঘুম থেকে উঠে দেখল রোদে ঘর ভ'রে গেছে।

বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই যেন বাস্তবতার কাছে সংসারের অসংখ্য দাবী নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। অমিতাভর সব ব্যবস্থা করে, সংসারের সব আয়োজন করে, সে মেসিন নিয়ে বসল পেয়ারা বাগান বস্তির ছেলেদের জামাগুলো সেলাই করে দেবার জন্য।

কলিং বেল বেজে উঠল।

যতীন দেখতো কে? বাবুকে ডাকছেন বোধ হয়।

না মা তোমাকেই খুঁজছেন এক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা।

যতীন ফিরে এসে বলল।

আমাকে?

হ্যাঁ—

কারা আবার? কাজের সময়....

সত্যিই বিরক্ত করলাম নাকি রে?

হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল বিকাশ আর শান্তি!

তোরা?

বিশ্বাস করতে পারছে না টুক্‌লা। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল শান্তিকে। মিলনের আনন্দে দুজনের চোখই জলে ভরে গেছে।

কি অসম্ভব সুন্দর হয়েছিস তুই শান্তি।

ওকে বার বার হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করল টুক্‌লা।

ছাড়রে! তুই সেই পাগলই আছিস।

সমবয়সী বন্ধুকেও স্নেহ করল যেন শান্তি। বিকাশ একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি ক'রে হাসল টুক্‌লা।

টুক্‌লার শীর্ণ মুখে সে হাসিতে ব্যথা পেল বিকাশ। তবে কি?…

বস ভাই তোমরা। আমি আসছি এখনই।

বুঝেছি কিছু খাবার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছিস। খুব গিন্নী হয়েছিস না?

শান্তি ওর হাত ধরে থামাল।

বা রে! আমার বাড়ীতে তোমরা প্রথম এলে, অভ্যর্থনা করব না? দাঁড়াও আসছি এখনই।

যতীনকে খাবার আনতে পাঠিয়ে ঘরে ফিরে এল টুক্‌লা।

তারপর! বল সব গল্প। উঃ কতদিন বাদে দেখা। একেবারে চলে এলে নাকি?

না না, ওকে রাখতে এলাম।

বিকাশ বলল শান্তির দিকে তাকিয়ে। তার সপ্রেম দৃষ্টি টুক্‌লার নজর এড়াল না। বিকাশদা শান্তিকে সত্যিই ভালবাসে মিছামিছি সে…থাক সে সব!

কেন রে?

শান্তির দিকে তাকিয়ে দুষ্টু হাসি হাসল টুকলা।

লজ্জা পেল শান্তি।

এতদিন বাদে?

টুক্‌লাই প্রশ্ন করল আবার।

না দুটো আগে নষ্ট··

ওঃ

তাই জন্যই তো এবার কলকাতায় চলে এলাম। ভারী ভয় হয়েছে রে।

ভয় কি? দেখবি ঠিক এবার ভালভাবে সব হয়ে যাবে।

খুব পাকা গিন্নীর মত কথা শিখেছিস।

তা গিন্নী হ'ব অথচ গিন্নীর মত কথা বলব না?

হাসল শান্তিরা।

তোকে দেখলে কিন্তু কিছু বিশেষ বোঝা যায় না।

ওদের কথাবার্তার থেকে সরে গিয়ে একটা ছবি দেখতে লাগল বিকাশ।

বাঃ

কি বাঃ?

টুক্‌লা জিজ্ঞেস করল।

ভদ্রলোকের চেহারা তো ভারী সুন্দর।

সেটার প্রতিবাদ করব না।

ইউ আর ফরচুনেট···

এসে চেয়ারে বসল বিকাশ।

খেতে খেতে হাসি গল্পে আবার যেন আগেকার দিনগুলো ফিরে পেল ওরা। নিজের নিঃসঙ্গতা, দুঃখ, নতুন পাওয়া মধুর আনন্দ কিছুই প্রকাশ করল না টুক্‌লা। প্রায় দুঘণ্টা গল্প করে এটুকুই তারা জানল টুক্‌লাও খুব সুখী হয়েছে অমিতাভকে বিয়ে করে, তাদেরই মত।

এতে তারাও সুখী হয়ে ফিরত। কিন্তু হঠাৎ অমিতাভ বাইরে ফিরে ওদের দিকে না তাকিয়ে ভেতরে চলে যাবার উপক্রম করতেই লজ্জায় যেন বিবর্ণ হয়ে গেল টুক্‌লা।

শোন!

ওকে ফিরে ডাকল টুক্‌লা।

কি?

তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। আমার স্বামী—আমার বন্ধু শান্তি বিকাশ। অকৃত্রিম হাসিতে মুখ ভরিয়ে ওকে নমস্কার করল ওরা। উত্তরে গম্ভীর মুখে একটি দায়সারা নমস্কার করে ঘরে ঢুকে গেল অমিতাভ।

পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল টুক্‌লা। হঠাৎ যেন তার ফাঁকি ধরা পড়ে গেছে।

কল্পনা আর কথার জালে যে প্রাসাদ সে এইমাত্র তৈরী করে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল, একটা দমকা ঝড়ে যেন মুহূর্তে তা খান খান হয়ে ভেঙ্গে গেল।

খুব খেয়ালী বুঝি ?

বিকাশই চেষ্টা করল আবহাওয়াকে সহজ করতে।

হ্যাঁ···

আচ্ছা আজ আমরা যাই।

উঠে দাঁড়াল ওরা।

বাঃ এখনি যাবে ?

যেন না বললে নয় তেমন একটা নিস্পৃহ গলায় বলল টুক্‌লা। গলার জোর পাচ্ছে না যে সে।

হ্যাঁ ভাই যাই। অনেকক্ষণ তো বসলাম। শান্তি তো থাকলই। আবার দেখা হবে তোমাদের।

বিকাশের সত্যিই খারাপ লাগছিল টুক্‌লার করুণ মুখ।

তুমি কবে যাচ্ছ ?

বিকাশের দিকে তাকাল টুক্‌লা। কোথায় চলে গেছে কিছুক্ষণ আগের মুখের সেই দীপ্তি।

পরশু। আচ্ছা, চলি ভাই।

ওরা চলে যেতে সেখানেই বসে পড়ল টুক্‌লা।

কি নিদারুণ অপমান করল অমিতাভ টুক্‌লাকে। চেঁচিয়ে নয়, চীৎকার করে নয়, নীরব উপেক্ষায়। এই তো তার স্বভাব, যখন যেমন ইচ্ছে, নিদারুণ অপমানে টুক্‌লাকে পীড়িত করাই যেন তার আনন্দ।

কিন্তু আজ যেন আর তার সহ্য হল না। চিরদিন এ ভাবে সহ্য করা কি সম্ভব ? আর সে পারে না, ঝি চাকর, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়

স্বজন কার সামনে নয়? সকলের সামনে এ কি জীবন দিনের পর দিন! সোজা চলে এল অমিতাভর ঘরে।

আজ তুমি যা করলে আমাকে!

ঠিকই করেছি, বড় বাড়াবাড়ি স্বুরু করেছ।—চীৎকার করে উঠল অমিতাভ।

বাড়াবাড়ি?

অবাক হয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বলল টুকলা।

নিশ্চয়ই, সব সময় স্ফূর্তি ··

আবার চীৎকার করল অমিতাভ।

চুপ কর, দয়া করে আমায় রেহাই দাও। প্লিজ।

মিনতি করল ও অমিতাভকে।

কিসের দয়া? কতবার বলেছি না রাজ্যের লোক বাড়ীতে জোটাবে না, এটা কি পেয়েছ?

বাঃ বন্ধুবান্ধব আসবে না?

না, সব সময় নয়।

টুক্‌লার মনে পড়ল আর একদিনের কথা, সেই মেয়েদের স্কুল করতে গিয়ে অমিতাভর কাছে লাঞ্ছনা, টুক্‌লাকে আঘাত করতেও দ্বিধা করেনি অমিতাভ।

ওরা তো চলে গেছে। বেঁচেছ তুমি, চেঁচামিচি ক'র না।

কারণ ঘটাও কেন? জানতো আমি এসব পছন্দ করিনি। আসলে তা তো নয়। তোমার মতলব আমি বুঝি না....

নিজের মনে একটা অপরাধ বোধ যেন টুক্‌লাকে হঠাৎ ঘিরে ধরল।

কথা বাড়তে দিল না টুক্‌লা। কিন্তু অপমানে তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইল। তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করে শোবার ঘরে চলে গেল সে।

কি যেন হয়ে গেল। ও কি অন্তর্যামী নাকি! মনে মনে ভাবল টুক্‌লা, জানে সে তার কাছে যা পরম সত্য, নির্মল পবিত্র, সমাজের চোখে তাই কলুষ, কালিমা লিপ্ত। সে যে খুকুর মা, হোক না সে খুকু তার বাপেরই মেয়ে শুধু, সে যে অমিতাভর স্ত্রী। হোক না অবহেলিত, যাকে কোনদিনও অমিতাভ ভালবাসেনি, স্ত্রীর মর্য্যাদা দেয়নি, তবু সমাজ বাঁচাতে, শৃঙ্খলা বাঁচাতে, নিষ্ঠা বাঁচাতে, সে ভাবেই তাকে থাকতে হবে। তার অধিকার নেই নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজাগ হবার। সে শুধু অমিতাভর লোক দেখান স্ত্রী, খুকুর মা, কিন্তু তার নিজের জীবন? সে চাপা থাক্ ঔচিত্যের স্তূপে। তবু নিজের মনেও বোধহয় সংস্কারের ছাপ থেকে যায়, তা না হলে সে এর জন্য নিজেকেই দায়ী করবে কেন? এটাই বোধহয় স্বাভাবিক টুক্‌লার মনে হয়, তা না হলে কত মেয়েই তো এমন মিথ্যে সংসারে দিন কাটাচ্ছে, কই কেউ তো বিদ্রোহ করছে না? হয়ত তাই, জীবনে একবার ঘটে গেলে, আর তার সংশোধন নেই। পাশার দানের মত খেলে ফেলা হ'লে আর ফেরৎ নেই। তবু কোথায় একটা আশার আলো তার মনে বারবার রেখাপাত ক'রে যায়। সে নতুন ক'রে বাঁচতে চায়, সকলকে বাঁচাতে চায়।

কয়েকদিন ধরেই ব্যস্ত রইল টুক্‌লা। নমিতার স্বভাবই এই নিজেও রেষ্ট্ নেবে না, অন্যকেও দেবে না। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে ছাড়বে না। কিন্তু তার ফলে সত্যিই ওদের পাড়ার মেয়েদের সমিতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে।

বুধবার, যেদিন ওদের সমিতির দ্বারোদ্‌ঘাটন হ'ল সেদিন আবালবৃদ্ধবনিতার মুখের যে হাসিটুকু দিয়ে তারা সম্বর্ধিত হ'ল

সেটুকুই তাদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। নিজের সঞ্চিত পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে অশোক তাদের সমিতির অর্থ ভাণ্ডার উন্মুক্ত করল। যদিও দাতার নাম তারা জানল না। কিন্তু নতুন প্রেরণায় অশোকও যেন মেতে গেছে। নিপীড়িত অত্যাচারিত লোকদের পাশে তারা দাঁড়াবে। সাধ্যমত নিজেদের সব কিছু তাদের বিলিয়ে দেবে তারা এদের জন্য। সমাজ সেবার কাজে।

সে সমাজ কেবল বাধা নিষেধ দিয়ে ঘেরা নয়, সে সমাজ কেবল পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করেই ক্ষান্ত হয় না, সে সমাজে সহৃদয় মানুষ অন্যের কথা ভেবে স্বার্থ ত্যাগে প্রস্তুত থাকে, সকলের স্থান হয় সেখানে। তাই তো যত অবহেলিত মেয়েদের নিয়ে সমিতি আর এই আশ্রম খুলল।

বুধবার সকাল থেকেই চলে গিয়েছিল টুকলা। অশোক অফিস সেরে চারটের মধ্যে হাজির। কাজের ফাঁকে ফাঁকে, বক্তৃতার মাঝে মাঝে টুকলার দৃষ্টি পড়ে অশোকের দিকে, সে দৃষ্টিতে পরম নির্ভরতা, চরম আশ্বাস। জীবনের নতুন উন্মাদনায় সে সারাদিন ধরে পরিশ্রম করে সম্মেলন সফল করল। ভাবতেও পারেনি, এত লোক সাড়া দেবে তাদের ডাকে। ঈশ্বর তোমায় ধন্যবাদ, মনে মনে টুকলা প্রণাম জানাল। সব দিক থেকে পূর্ণতার আস্বাদন দিচ্ছ প্রভু। ধন্যবাদ তোমায়।···

সন্ধ্যাবেলায় বৃষ্টি এল। সভাও প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। কত শিশু আর মেয়েদের গাড়ীতে করে পৌঁছে দিয়ে এল অশোক। একটি বাচ্চা তো ভয়ে কেঁদেই ফেলল।

পয়সা নি যে ?

পয়সা লাগবে না, ওঠো বাবা তোমরা !

সস্নেহে ডাকল টুকলা।

বেঁচে থাক মা। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

মুগ্ধ হ'য়ে দেখছে অশোক পরিতৃপ্তিতে ভরা টুকলার এ মুখ।

এই !

কি ?

এবার কিন্তু তোমায় যেতে হবে। রাত হয়েছে মন্দ না।

হ্যাঁ যাব। তুমি শুধু এই বিমলাদের ব্যাচ্‌টিকে পৌঁছে দিয়ে এস।

যাচ্ছি, তুমি কিন্তু ভিজো না লক্ষ্মীটি।

না, ভিজব না। ভেতরে যাচ্ছি। কিন্তু ভিজে গেছি বেশ। জানতো আমার ভিজতে ভাল লাগে।

জানি, কিন্তু আজ নয়, তোমার শরীর···

কিছু হবে না, যাও ওরা অপেক্ষা করছে।

নতুন জীবন, নতুন কাজ। কাজে সে এত আনন্দ তা কে জানত। জগতে এত মাধুর্য ? জগতে এত সুখ ? শুধু ভালবাসার জন্য ? শুধু ভালবেসে আর ভালবাসা পেয়ে ? বার বার ভাবল টুকলা, তারপর মনে হোল শুধু তাই নয়। অশোকের ভালবাসায় সে সারা বিশ্বকে আবার নতুন করে ভালবেসেছে। যা ছিল তার কাছে কর্তব্য, জীবনের দুঃখ এড়ানর স্থল, তাই তার কাছে আজ পরম সত্য, জীবন চরম সুখের আশ্রয়। মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই ! ....সত্যিই তাই চায়। পালিয়ে নয়, সংসারকে ভয় পেয়ে নয়। সংসারের মুখোমুখি দাঁড়াবে সে। আজ সে একা নয়, বিচ্ছিন্ন একক জীবনের নিঃসঙ্গতা আর তাকে ক্লান্তি দেবে না। কাজের ক্ষেত্রে তারা পাশাপাশি দাঁড়াবে।

মনে পড়ল কদিন ধরে কি দানবীয় কাণ্ডই করছে অমিতাভ। টুকলা স্বীকার করেছে। হ্যাঁ সত্যকে সে অস্বীকার করেনি, অশোককে সে ভালবেসেছে। আর সে স্বীকারোক্তির ফল স্বরূপ বারবার আঘাত করেছে অমিতাভ তাকে। ঘৃণায় বারবার পদাঘাত করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। অথচ কেন ? এর জন্য কি দায়ী টুকলা একা ? অমিতাভর কোন অবদান কি নেই ? দিনের পর দিন

অবহেলায়, অবিচারে কটুবাক্যে মরুভূমির মত তৃষ্ণার্ত ক'রে রাখেনি কি তাকে অমিতাভ? কিন্তু কোন কথা বলেনি টুক্‌লা। নীরবে সহ্য করেছে সে। হয়ত অপরাধ সে করেছে স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষকে ভালবেসে, কিন্তু নিজের কাছে সে সত্য। এটাই বড় কথা। অমিতাভকে লুকিয়ে সে করছে না, সে স্বীকার করেছে অমিতাভ তাকে কোনদিনও ভালবাসেনি, সবিতাকেই সে এখনও ভালবাসে, কিন্তু সেও আশ্রয় চায়, সেও ভালবাসা পেয়ে বাঁচতে চায়। জানে সমাজ আজ তাকেই দোষী করবে, কলঙ্কের পশরা তারই মাথায় তুলে দেবে, মা হয়ে, একজনের স্ত্রী হয়ে সে অন্যকে ভালবেসেছে দেখে, কিন্তু তবু তার কাছে মিথ্যার স্থান নেই। সত্যকে সে প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত নয়। তবে খুকুর কথা ভেবে এই ভাবেই সে থাকতে রাজী। অমিতাভ যত অত্যাচারই করুক সে প্রতিবাদ করবে না। কাজের ক্ষেত্রে সে পাশে পাবে অশোককে, সেটুকুই তার সম্বল, তার সান্ত্বনা।

পরক্ষণেই মনে পড়ল তার সেই ভীষণ রাত্রের কথা।...

দুদিন আগেই বলেছে সে অমিতাভকে তার মনের এই পরিবর্তনের কথা। যথারীতি তর্জন গর্জন সবই চলছিল। যতটুকু সম্ভব নীরবে সহ্য করছিল টুক্‌লা। কিন্তু রাতে হঠাৎ যেন কি হ'ল। এত ঝগড়া-ঝাটির পরও পরম নির্ভরতায় টুক্‌লা তার শোবার ঘরে গিয়ে শুয়েছে, অথচ সেদিন অমিতাভকে যেন প্রথম তার ভীষণ ভয় হ'ল।

রাত কত হবে মনে নেই, তার ভেজান দরজা খুলে যাবার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল টুক্‌লার।

কে!...

আমি।

কেন?

হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে বেডকভারটাকে গায়ের ওপর টেনে নিল টুক্‌লা।

কেন আবার। তোমার কাছে…

নাঃ অসম্ভব…

ভাবতেও টুক্‌লার যেন কেমন ঘৃণা বোধ হ'ল। আগে এর থেকে প্রার্থনীয় তার কাছে আর কি ছিল? পরম নির্ভরতায় স্বামীর বক্ষলগ্না হয়ে নিশ্চিন্ত থাকা?

কিন্তু আজ নয়, আজ বোধহয় অমিতাভর থেকে পর আর তার কেউ নয়। তাই কথাটা শোনামাত্র সারা গা তার শিউরে উঠল। ততক্ষণে অমিতাভ তার পাশে চলে এসেছে।

নাঃ—

প্রবল তীব্রতায় ওকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইল টুক্‌লা।

পাগলাম ক'র না, তুমি আমার স্ত্রী—

না আর নই।—

উন্মাদ নাকি তুমি? শোন....

ওকে জড়িয়ে ধরল প্রবলভাবে অমিতাভ।

না, কোন মতেই না। আজ আর তোমার কোন অধিকার নেই।....

চিরদিনই আছে,—চিরদিনই থাকবে,…

অমিতাভ যেন উন্মাদ হয়ে গেছে। তার সমস্ত চোখে মুখে এক অস্থির আবেগ, তার সমস্ত ক্ষুধা যেন বিরাট একটা হাঁ ক'রে টুক্‌লাকে গ্রাস করতে চাইল।

সমস্ত শরীর কাঁপছে টুক্‌লার। নিজের বিয়ে করা স্বামীকে এত ভয় করতে পারে একথা কবে ভাবতে পেরেছে টুক্‌লা?

সরে যাও তুমি।....

হাঁকাতে থাকে টুক্‌লা; কোথা থেকে গায়ে জোর পায় কে জানে। প্রবল ধাক্কায় ঝটকা মেরে সরিয়ে দেয় অমিতাভকে।

তোমায় শেষ ক'রে দেব একেবারে রাক্ষুসী···

ওর গলা বুঝি টিপে ধরতে যায় অমিতাভ। ওর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয় টুক্‌লা, তারপর দ্রুত পায়ে পাশের ঘরে চলে গিয়ে দরজা বন্ধ করে, ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল টুক্‌লা।

অনেকক্ষণ ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করে থাকল ধাক্কাধাক্কির জন্য। কিন্তু নাঃ, কোন শব্দ নেই।

প্রবলভাবে কাঁদতে লাগল টুক্‌লা। কি অসহায় বোধ করছে সে নিজেরই স্বামীর কাছে, একথা সে আগে ভাবেনি কেন? বহু আগেই তো এটা ঘটতে পারত, কান্নায় বুক ভেসে যেতে লাগল টুক্‌লার।

অমিতাভকে সে চেনে। আজ তাকে টুক্‌লা মন থেকে বিসর্জন দিলেও তার প্রতি এ বিশ্বাস তার যাবে না যে অমিতাভ টুক্‌লার দেহের প্রতি অধিকার নিয়ে কোন মাতামাতি করে না। টুক্‌লার দেহ বোধহয় তাকে কোনদিনও টানেনি। বিশেষ ক'রে খুকু জন্মাবার পর থেকে। অথচ আজ কি পাগলাম পেয়ে বসল অমিতাভকে? এ কোন্ অমিতাভ?

তবে কি টুক্‌লা ভালবেসেছে বলে? আজ অন্যের ভালবাসায় কি অমিতাভ টুক্‌লাকেও গ্রহণীয় মনে করল? বহুদিন আগেই তো বলে দিয়েছে, তার সঙ্গে টুক্‌লার কোন সম্বন্ধ নেই, আর পালন ও করেছে তা, অথচ আজ? যখন সে নিঃশেষে জেনেছে টুক্‌লা আর তাকে ভালবাসে না, তখনই কি সে টুক্‌লার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করল?

ভেবে পায় না টুক্‌লা। সমস্ত বুকটা দুমড়ে মুচড়ে যাবে বুঝি। জানে হয়ত কিছুই নয়, অমিতাভ যা বলেছে, এও একটা ব্যতিক্রম, কিন্তু তবু....

সারারাত স্নানঘরের ঠাণ্ডা ঘরের কোণায় পড়ে কাঁদল টুক্‌লা।

তারপর হঠাৎ নিরুদ্দেশ হ'ল অমিতাভ। কোথায় কে জানে। সে রাত্রের পর আর দেখা হয়নি টুকলার সঙ্গে। ফিরেছে মাত্র পরশুদিন; আগেকার সেই দর্পিত ভাব নিয়ে। তবে কি একটা মনের মধ্যে যেন সংকল্প করে নিয়েছে।

টুকলা বুঝতে পেরেছে তা। কিন্তু আজ আর অমিতাভকে সে যেন নিজেও ভয় পায় না। সম্পূর্ণ উপেক্ষা দিয়ে অমিতাভর এই মনোভাবকে সে মেনে নিয়েছে।

কতক্ষণ বসে ছিল খেয়াল নেই। বৃষ্টিতে তার কাপড় ভিজে গেছে। আবার বাড়ীতে গিয়ে আরম্ভ হবে সেই নোংরামি। ভাবলেও আতঙ্ক হয়। তবু যেতে হবে কেননা আইন মতে সেটাই তার আশ্রয়, তার ঘর। অবাক লাগে, যে ঘরে তার কোন মর্যাদা নেই, যে ঘরে তার খুকুও নেই, তাদেরই জন্য তাকে সেই ঘর আশ্রয় করেই থাকতে হবে। এ ছাড়া গতি নেই, এটাই উচিত।

ওরা যখন ফিরল তখন রাত নটা বেজে গেছে।

সারাটা পথ ক্লান্ত টুকলা নিজেকে গাড়ীর নরম কুশানে ছেড়ে দিয়ে চুপ করে চোখ বুজে ভেবেছে। ভেবেছে আর ভেবেছে। কে জানত এত সুখ, এত আনন্দ, সফলতার এত ঐশ্বর্য তার জন্য ভবিষ্যতের গর্ভে জমা হয়ে আছে।

রাত হয়ে গেছে তবু বাইরের ঘরের দরজা খোলা, আর আলো জ্বলছে।

পায়চারি করছিল অমিতাভ, অন্যদিন হ'লে ভাবতেই পারত না টুকলা অশোককে সঙ্গে নিয়ে এত রাত্রে বাড়ী ফেরবার কথা।

যা ভেবেছিল তাই। বাঘের মত গর্জে উঠল অমিতাভ।

কোথায় যাওয়া হয়েছিল শুনি? ফিরলে কেন? না ফিরলেই তো পারতে এই হোটেলে।

ওর কথার উত্তর কোন প্রবৃত্তি হ'ল না টুকলার। সে ক্লান্ত, তাছাড়া সার্থকতার মধুরতায় তার মন ভ'রে আছে। অশোকের দিকে একবার তাকিয়ে ও বাড়ীর ভেতর চলে যেতে চাইল।

কোথায় যাচ্ছ?

ওর পথ আটকাল অমিতাভ।

বাঃ ভেতরে যাব না? পথ ছাড়!

কিসের পথ ছাড়ব? অভিসার থেকে কোন্ মুখে ফিরে এলে?

মুখ বিকৃত করে বলল অমিতাভ।

উনি খুব ক্লান্ত।

অশোক এগিয়ে এল।

তা তো জানি। ক্লান্তি বিনোদনের জন্যই বোধহয় আপনার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে রাত নটায় ফেরা হল।

অমিতাভবাবু! আজ ওদের নতুন আশ্রমের···

কথা শেষ হল না অশোকের। মুখ ভেংচে উঠল অমিতাভ।

ওঃ দেশের সেবা, সমাজ সেবায় রাত নটা পর্যন্ত পরপুরুষের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছিল বুঝি, তা তো জানি না।

খুব ষ্ট্রেন গেছে ওঁর আজ, তাই এখন ওর পরিপূর্ণ বিশ্রাম করাই ভাল।

এত? আশ্চর্য তো। আপনি ভুলে যাচ্ছেন অশোকবাবু! স্বামী আমিই, আপনি নন। আপনার পক্ষে এতটা সোহাগ না দেখানই বোধহয় ভাল।

অসুস্থ মানুষকে সমবেদনা জানবার অধিকার বোধহয় সব

মানুষেরই আছে, এবং তা কর্তব্য। সেখানে সম্পর্কের প্রশ্ন ওঠে না।

না বলে পারে না অশোক, টুক্‌লা আবার এগিয়ে যেতে চায়।

না যেতে পাবে না ভেতরে।

ওকে প্রায় ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দেয় অমিতাভ। পতনোন্মুখ টুক্‌লার দেহকে ধরে ফেলে অশোক। তার দুচোখ জ্বলতে থাকে।

আপনি সীমা ছাড়াচ্ছেন, অমিতাভবাবু।

বাঃ ভারী মজা তো? নিজের স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহারের সীমা রেখাও কি আপনি টানবেন নাকি?

দরকার হ'লে তাও করতে হয়। তবে এজন্য আমি দুঃখিত।

বেশী নভেলি ঢং করবেন না অশোকবাবু।...বাঃ ভারী মানিয়েছে যুগল মূর্তি!

তাড়াতাড়ি টুকলাকে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল অশোক। ওর হাতটা ধরে ফেলল টুকলা।

না তুমি যেওনা।

অমিতাভর বিস্ফারিত চোখের সামনে আবার টুক্‌লা বলল।

তুমি এখন যেতে পারবে না।...

অশোকের হাতটা টেনে নিয়ে তার মধ্যে মুখ রাখল টুক্‌লা।

অসম্ভব।

গর্জে উঠল অমিতাভ।

আমারই বাড়ীতে বসে তোমাদের এ লীলাখেলা আমি চলতে দিতে রাজী নই। সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে।

সে কথা আপনিই ভুলে গেছেন অমিতাভবাবু।

চুপ করুন। স্পর্ধার সীমা ছাড়াবেন না। আমার বাড়ী থেকে এখনি বেরিয়ে যান আপনি। আর পারেন তো আপনার গুণমুগ্ধ সঙ্গিনীটিকেও নিয়ে যান। আমি এ সব সহ্য করব না...

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চাইল অমিতাভ, টুক্‌লা ডাকল ওকে।

শোন! তাই হবে, এ পুতুলের সংসারে আমার স্থান.আর আমি চাই না। সত্য প্রকাশিত হোক।

অশোকের দুই হাতে নিজের ক্লান্ত জলে ভেজা মুখখানা চেপে ধরল টুক্‌লা। অমিতাভ বেরিয়ে গেল।

বেতস পাতার মত টুকলার বেপথুমানা দেহকে আস্তে আস্তে সস্নেহে নিজের কাছে টেনে নিল অশোক।

শহর ছাড়িয়ে যেতে হয়। পীচঢালা রাস্তা থেকে গ্রামের একেবারে মধ্যে চলে গেছে এঁকেবেঁকে যে সুরকি দেওয়া লাল গ্রামপথ, সেটাই একমাত্র যাতায়াতের রাস্তা।

অনেকগুলো ছোট ছোট একসার বাড়ী পেরিয়ে যে বিরাট তিন-তলা বড় বাড়ীটা গ্রামের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, সেটাই নারী সেবাশ্রম ভবন।

প্রায় দেড়শর মত দুর্ভাগিনী মেয়েদের স্থান হয়েছে এখানে। তা ছাড়া এর সঙ্গে সংলগ্ন একটি অনাথাশ্রম। যার নাম শিশুমন্দির সেটিতেও শিশুর সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ। এতবড় প্রতিষ্ঠান একদিনেই গড়ে ওঠেনি। যখন প্রথম সুরু হয় তখন তো দুতিনটি চালাঘরই সম্বল ছিল এদের। তারপর ধীরে ধীরে গত দশবৎসরে বেড়ে উঠল এই প্রতিষ্ঠান, পাঁচ ছ'টি দুস্থ মেয়ে নিয়ে যে প্রতিষ্ঠানের সুরু, আজ দেড়শ মেয়ের পুনর্জন্মের ভেতর দিয়ে তার আনন্দ কল্লোল শোনা যাচ্ছে। সমাজে যে সব মেয়ে স্বামী পরিত্যক্তা বা দেশবিভাগের শীকার হয়ে জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে ছিল তাদেরই জন্য দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে আশ্রয় দিয়েছে এই "নারী সেবাশ্রম"। আজ আর শুধু এর প্রতিষ্ঠাত্রী বা গ্রামের লোকের সাহায্যে চলা প্রতিষ্ঠান নয়। সরকার স্বীকার করেছেন একে আর অর্থ সাহায্য করে একে উন্নততর করবার পথে সাহায্য করছেন। তাছাড়া অশোকের উপার্জ্জিত অর্থ তো সবই এতে ব্যয় হয়।

ওপাশের লালরংয়ের একতলা বাড়ীতেই নারী সেবাশ্রমের ডিরেকটর বা সকলের 'মা' টুকলা। সকলেই তাকে 'পার্বতী মা' বলে ডাকে।

ধ্বংসের দরজা থেকে ফিরে আসা মানুষগুলোর হর্ষধ্বনি আর আন্তরিক আশীর্বাদ টুকলাকে নতুন জীবন দিয়েছে। নিজের জীবনের অন্য অর্থ খুঁজে পেয়েছে সে। সৃষ্টির আনন্দে আজ তার মানুষের ওপর, জীবনের ওপর বিশ্বাস আরও জোরাল হয়েছে। এই নারী সেবাশ্রম আর শিশু মন্দির নিয়ে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত যে বিরাট কাজের মধ্যে পড়ে আছে টুকলা তার মধ্যে অন্য চিন্তার অবকাশ কোথায়? ও মেনে নিয়েছে এই পৃথিবীকে সুখ দুঃখ সমেত। সে জানে মানুষকে এগিয়ে যেতে হবেই, তার জন্য যা মূল্য লাগে তাও দিতে হয়। নিজের পথ বেছে নিতে গেলে হয়ত কোনসময় মূল্য বেশীই দিতে হয়। কিন্তু ঈশ্বর তো অকৃপণ নন। একদিকের ক্ষতি তিনি অন্যদিক দিয়ে পূরণ করবার চেষ্টা করেন, তাই অশোকের এ কাজে সাহায্যকে সে দেবতার দান বলেই গ্রহণ করেছে। একাজ তো তাদের দুজনেরই।

কদিন আগে অমিতাভর দীর্ঘ এক চিঠি এসেছে। অবাক হয়ে গেছে সে চিঠি পড়ে। মানুষের মন কি বিচিত্র। চলে আসার পর, সংসার ভেঙ্গে দেওয়ার পরও যে মানুষটা একটুও টলেনি, আজ সবিতার মৃত্যুর পর নিজের মেয়েকে কাছে পেয়েও সে শূন্যতায় ভরে গেছে, আর সে কথা সে লিখেছে টুকলারই কাছে, যাকে সে কোনদিন মানুষ ব'লেই গণ্য করেনি। অবশ্য এ চিঠিতে উল্লেখ ছিল অমিতাভর আরেক চিঠির, যাতে নাকি সে ক্ষমা চেয়ে অনেক কথা লিখেছিল টুকলাকে, কিন্তু সে চিঠি হাতে ওর পৌঁছয়নি। ক্ষত বিক্ষত হৃদয় নিয়ে টুকলা তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে দেশ থেকে দেশান্তরে। আর তার চিরদিনের বন্ধু, অশোক এ অবস্থাকেই মেনে নিয়ে তারই বিন্দুমাত্র সুখের জন্য নিজেকে সজাগ রেখেছে সর্বক্ষণ।

নিজের মনকে তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করল টুকলা। জীবন সায়াহ্নে আর কি করতে পারে সে। জীবন যখন শুরু হয়, যখন সারা জীবনটাই সামনে বিস্তৃত থাকে তখন ভুলভ্রান্তি কিছু হ'লে বোধ হয় সেটুকু শোধরাবারও সময় পাওয়া যায়, কিন্তু পেছনে ফিরে যাওয়া তো মানুষের সম্ভব নয়। তূণ থেকে তীর ছুঁড়ে দিলে আর তা ফিরে আসে না। তাই জীবন যত শেষের দিকে এগিয়ে যায়, ততই লাভ ক্ষতিকে মেনে নিয়েই চলতে হয়। এজন্য আপসোস করে কোন লাভ নেই।

অমিতাভর চিঠির প্রতি ছত্রে অন্য সুর। সে এখন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী, দেশ বিদেশে তার নাম। তাতেই সে পূর্ণ। কিন্তু আজ যখন এদেশের মায়া কাটিয়ে সব কিছু ত্যাগ ক'রে সে বিদেশ চলে যাচ্ছে হয়তো চিরদিনের মত, তখন নাকি তার খুকুর মায়ের কথাই বারবার মনে পড়ছে। হয়তো সে ভুল করেছিল কিন্তু ভুল শোধরাবার পথ কি এখনও খোলা আছে? পাতার পর পাতা লিখে গেছে সে কেমন ক'রে তার অহং বোধ, আমিত্বের গর্ব তাকে কোনদিনের জন্যও সুখী হ'তে দেয়নি। সে চিরকাল একাকিত্বের দুর্বহ বোঝা সহ্য করেছে।

সবিতার জন্যেও যে ওর ভালবাসা তাও ভয়ঙ্কর। উৎপীড়নেরই নামান্তর। অন্ততঃ সবিতা তাই মনে করেছিল। সবিতাকে সে তার প্রখর বুদ্ধি, সংবেদনশীল মন সব কিছুর জন্য প্রায় পুজো করার মত ক'রেই ভাল বেসেছিল। কিন্তু তাও নিজের মতো করে। সে তাই চেয়েছিল, তার নিজের মতো করে গড়ে নিয়ে ভালবেসে তবে সুখী হ'তে, দু দেহে একই মন হবে। তার ভিন্ন প্রকাশ হবে কেন? কিন্তু কয়েক বৎসর পরই সবিতার মধ্যে গভীর ক্লান্তি এসেছিল, যার ফলে নিজের মধ্যে সেই প্রেমকে বাঁচানর জন্যই সবিতা বম্বেতে কাজ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সে খবরও পেয়েছিল অমিতাভ, টুকলাকে বিয়ে করার পর। আগে ও অন্য

রকম শুনেছিল, তাই অর্থলোভে সবিতা অন্যকে বিবাহ করছে জেনে উন্মাদ হ'য়ে গিয়েছিল।

কিন্তু তার শোধ কি অমিতাভ নিজের জীবন দিয়েই দেয়নি? ভুল বুঝে যে অবিচার সে সবিতার ওপর করেছিল, তার ফলে সে আবার নিরপরাধ টুক্‌লাকেই শাস্তি দিল।

তাই সবিতার ক্ষতিপূরণ করতে গিয়ে মেয়েকে তার কাছেই রেখেছিল আর স্বার্থান্ধ হয়ে টুক্‌লাকে বঞ্চিত করেছিল। এর জন্য সে অনুতপ্ত। কিন্তু জীবনে দেরী বা অসম্ভব ব'লে নাকি কিছুই নেই, তাই যদি টুক্‌লা মনে করে .....

একটা অট্টহাসি করতে ইচ্ছে হ'ল টুক্‌লার, জীবনের রঙ্গমঞ্চে ভারী সুন্দর একটা মজার নাটক অভিনীত হ'য়ে গেল। ভুল ভুল। হাসি পেল তার। অমিতাভ সারা জীবন ভুল করেছে আর ভুলের মাশুল জুগিয়েছে টুক্‌লা। আজ সে নিজেকে স্বাভাবিক জীবন থেকে সরিয়ে এনে বৃহত্তর কাজে দিয়েছে বটে, কিন্তু তার ফলে তার দেহ ভেঙ্গে পড়েছে ভীষণ ভাবে, অথচ তার নিজের জীবনও সার্থক হ'তে পারত। কোন কিছুই গ্রহণ করতে পারেনি সে। কার জন্য তার এই ত্রিশঙ্কুর মত অবস্থা? আজ সে এসেছে জানতে এখনও সময় আছে কি না। সে ভুল শোধরাবার সুযোগ পাবে কি না!...

পার্বতী মা!

চিন্তায় ছেদ পড়ল।

লতিকাকে তাহলে সব গুছিয়ে দি!

মনে পড়ল টুক্‌লার, কাল এই আশ্রম থেকেই একটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, একটি বাস্তুহারা ছেলের সঙ্গে। আজ তারা যাবে। কত শেকড় ছেঁড়া মেয়ের জীবনে স্থিতি এনে দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে টুক্‌লা। কিন্তু...

হ্যাঁ দাও। ওরা যাবে কখন?

বলছে তো আধঘণ্টার ভেতরই। অবশ্যই আপনার কাছে তো আসবে যাবার আগে।

কেঁদে ফেলল মেয়েটা যাবার আগে। এখানে তো তার কোন আপনজন ছিল না, অধিকার ছিল না। আজ তার নিজের সুখের ঘর হ'তে যাচ্ছে, নিজের সংসারে সে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, তারই সঙ্গে, যে সব জেনে শুনেও ভালবাসায় স্নিগ্ধতায় তাকে গ্রহণ করছে, অথচ এই দুদিনের আস্তানাটুকু ছাড়তেও ওর চোখে জল। টুকলার চোখও সজল হয়ে এল। ও জানে এরা কত ভালবাসে তাকে। হবেই তো, ওরা যে সবাই ওরই মেয়ে। এদের সবাইয়ের মাঝখানেই তো খুকুকে পেয়েছে ও।

টেলিগ্রাম!

পিয়নের হাত থেকে খামটা নিয়ে পড়লেন হেড ক্লার্ক বিপিনবাবু।

আপনার নামে তার।

ঐ হয়তো কেউ আসবে আবার।

সই করে খামটা খুলতে খুলতে বলল টুকলা।

বিশ্বাস করতে পারছে না।

নিজেকে ঠিক রাখতেও পারবে না। নিজের ঘরে তাড়াতাড়ি চলে এল ওদের কাছে বিদায় নিয়ে।

খুকু আসছে, পরশু।

মায়ের কাছে আসছে? তার খুকু? অসম্ভব উত্তেজিত হ'য়ে পড়ল টুকলা। মা ব'লে স্বীকার করে তবে? এরই জন্য কি সে এতদিন অপেক্ষা করেছিল? মেয়ের কাছে এই স্বীকৃতি?

মনে করেছিল তার সব বন্ধন বুঝি খসে গেছে, আঁকড়ে ধরবার মত বোধ হয় কিছুই আর নেই। আর যে মাটীতে ভর ক'রে সে

দাঁড়িয়ে আছে তা তো চিরকালের সত্য। অশোকের একান্ত প্রেমের মূল্য সে দিতে পারেনি এই ব্যবহারিক জীবনে, কিন্তু অশোকের থেকে কে বেশী ভাল ক'রে জানে ঐ ভালবাসার ওপরই জোর দিয়ে আবার বেঁচে উঠেছে টুক্‌লা। তাই হোক, তাতেই তৃপ্তি অশোকের। এর বেশী সে চায় না। অপেক্ষা করবে সে, টুক্‌লা সে কথা জানে।

নিয়তির কি পরিহাস! আজ সব কিছু থেকে মুক্ত করে যখন নিজেকে সে প্রায় ভুলে যেতে বসেছে তখনই আবার ডাক পড়ল তার জীবনের আনন্দ-যজ্ঞে।

অস্থির হয়ে উঠল টুক্‌লা। খুকু আসছে, খুকু, তারই নিজের দেহজ সন্তান। কেমন সে; সেই পাঁচ বছরের খুকুকে নিজের বুক থেকে ছিঁড়ে নিয়ে বিদায় দিতে হ'য়েছিল, আজও সে ক্ষত তেমনি আছে। আর দশ বছর বাদে একটি কিশোরী আসবে তার কাছে যে তারই মেয়ে, অথচ যাকে সে এতটুকু জানে না। টুক্‌লার সেই চিরদিনের অদেখা প্রতিদ্বন্দ্বিনীর ছায়ায় যে মানুষ হয়েছে। তবু সে টুক্‌লারই মেয়ে, তারই সেই খুকু।

খুকুকে নিয়ে গাড়ী যখন এসে পৌঁছল তখন প্রায় দিন শেষ হয়ে এসেছে। গোধূলির আলো গ্রামের গাছপালা পথঘাট সব গলানো সোনার ম্লান আভায় রাঙিয়ে দিচ্ছে। হেমন্তের সুন্দর আসন্ন সন্ধ্যা। মাকড়সার জালের মত চারিদিকে কুয়াশার একটা জাল যেন বিছিয়ে আছে! বেলাশেষের এই শ্রান্ত আলোর মতই ক্লান্ত টুক্‌লা। সমস্ত আকাশ বাতাসে যে স্তব্ধতা যে প্রশান্তি ছেয়ে রয়েছে, নেমে আসা সন্ধ্যার যে রূপ আস্তে আস্তে ফুটে উঠেছে, সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে তা যেন টুক্‌লা অনুভব করতে চাইল। সব কিছুর শান্তি, সব বেদনার অবসান।

বাগানে ইজিচেয়ারে বসেছিল টুক্‌লা। একটা কাশ্মীরী শাল

তার পা থেকে ঢাকা। মাথা হেলিয়ে মেয়ের জন্য অপেক্ষায় ক্লান্ত ভঙ্গীতে বসে ছিল টুক্‌লা। বুকের ভেতরটা তোলপাড় হচ্ছে। কিন্তু নিজেকে শান্ত রাখবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে।

কত দেরী করছে ওরা। কতক্ষণ লাগে আসতে দমদম থেকে? কতদিন থাকবে কিছুই লেখেনি। টেলিগ্রামের কাটা কাটা খবর। যদিও মেয়ের জন্য ঘর সাজিয়ে সব আয়োজনই ক'রে রেখেছে টুক্‌লা।

গেটের কাছে গাড়ী আসার শব্দ হ'ল। বুকটা আবার তোলপাড় করছে উত্তেজনায়।

আস্তে আস্তে তার সামনে এসে দাঁড়াল খুকু। তার মেয়ে শর্মিলা।

উঠে কাছে এগিয়ে গেল টুক্‌লা। ছুচোখ দিয়ে স্নেহধারায় সে বুঝি স্নান করিয়ে দেবে মেয়েকে। কিন্তু খুকু কি তাকে লজ্জা করছে? তা না হলে প্রণাম ক'রে অমন আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে কেন? তার মা যে সামনে? তার মা! ওকি বুঝতে পারছে না? তারা যে মা আর মেয়ে! গা কাঁপছে টুক্‌লার, অসুস্থ শরীরে উত্তেজনা এলেই অমনি হয় তার। দুহাত বাড়িয়ে খুকুকে কাছে টেনে নিতে চাইল।

চুপ ক'রে কাঠের মত দাঁড়িয়ে আছে খুকু।··· সঙ্কোচ করছে কেন? কি চায় ও? ভাবল টুক্‌লা।

'মা'

মুহূর্তে দুটি দেহ আলিঙ্গনাবদ্ধ হ'ল। দুজনের চোখের জল মিশে গেল। কিন্তু প্রথম মিলনের আবেগ চলে যেতেই আবার যেন খুকু কেমন স্বতন্ত্র করে নিল নিজেকে। এই তার মা, এত সুন্দর? এত কোমল? অথচ···

ওর চোখের ভাষা যেন পড়তে পারল টুকলা। কি ভাবছে মেয়ে? গ্রহণ করতে পারছে না মনে মনে? কেন, শুধু দশ বছর দেখেনি ব'লে? কিন্তু ওর দেহ থেকেই তো জন্ম খুকুর, তাছাড়া প্রথম পাঁচ বছর? সব ভুলে গেছে নাকি?

ওর দিকে আড়চোখে তাকাতে তাকাতে দুধ মিষ্টি সাজাতে লাগল টুকলা টেবিলে। খুকু বুঝতে পারছে, মা যেন পারছে না, শরীর বোধ হয় ভাল নেই, কিন্তু প্রথম দিনেই উঠে হাত থেকে কাজ কেড়ে নিয়ে সাহায্য করতে সঙ্কোচ লাগছে। কাঠের মত খাবার টেবিলে বসে আছে।

কত কথা বলবে ভেবেছিল খুকু মাকে, বলতে পারছে না কেন?

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সব বুঝতে পারছে টুকলা। কিন্তু তার স্বাতন্ত্র্য বোধ তাকে যেন সতর্ক করে দিল। সে কোন প্রশ্ন না করে মেয়ের পাশের চেয়ারে বসে তাকে খেতে বলল।

আমি তো ভাল করে খেয়ে এসেছি।

তা হোক। খাও।

ওকি বেড়াতে এসেছ নাকি কারও প্রতিবেশীর বাড়ীতে? নিজের মার কাছে এসেছ না?

জানলা দিয়ে দূর দিগন্তের দিকে তাকাল টুকলা। তার ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে খুকু জিজ্ঞেস করল।;

তোমার কি কোন অসুখ করেছে মা?

জল এসে গেল টুকলার এ স্নেহসম্ভাষণে।

না মা, আমার শরীরই এমনি। সন্ধ্যায় রোজ একটু জ্বর আসে কিনা।

কই কিছু শুনিনি তো? ডাক্তার দেখাও না কেন?

কি শুনেছ? কতটুকু শুনেছ তুমি তোমার মায়ের সম্বন্ধে?

ভাবল টুকলা। তোমাদের জগতে তোমার মায়ের স্থান ছিল কি?

ডাক্তার দেখিয়েছি। এ অসুখ সারবার নয়।

তা আবার হয় না কি? সব অসুখ সারে।

মৃত্যুকে স্বীকার করে না খুকুর নতুন জীবন। উদ্ধত সে প্রাণশক্তি।

তাহলে কি লোকে মারা যেত রে!

ম্লান হাসি হাসল টুকলা।

অনেক রোগ আছে যা সারে না কোনদিনও, তাছাড়া আমার মায়েরও···

কি তোমার মায়ের?

কিছুই চেনে না, জানে না তার আত্মীয়দের খুকু।

মায়েরও এইভাবে শেষ হয়েছিল। এমনি রোজ জ্বর হ'ত। আসলে এ অসুখের মজাই এই।

আমি ওসব বিশ্বাস করি না।

বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ল খুকু।

আসলে তোমার চিকিৎসা আর দেখা শোনা দরকার

তুই এসে গেছিস, এবার আমার ভাবনে তুই।

কিন্তু····

কি?

সন্দেহে জিজ্ঞেস করল টুকলা।

আমি তো তোমার কাছে থাকতে পারব না

আস্তে আস্তে বলল খুকু।

কেন?

বাঃ জান না?

না?

আমি তো বাবার সঙ্গে যাচ্ছি?

বাবার সঙ্গে? কোথায়?

বাবা তো রোম যাচ্ছে? "আমিও তো যাব। ওখানেই লেখাপড়া শিখব। তাছাড়া আঁকা শিখব। বাবার খুব ইচ্ছে আমি ভাল ক'রে আঁকা শিখি।

বাবার ইচ্ছে?

নিজের মনেই বলল টুকলা। ও: তোমাদের দুজনের জীবন ঠিকই আছে? সেখানে টুক্‌লার স্থান কোথায়? কেন লোভীর মত আশা করেছিল টুক্‌লা যে এবার তার সকল প্রতীক্ষার শেষ হ'ল। সে কে? বাবা আর মেয়ের মাঝখানে কোনদিন সে ছিলও না আজও নেই। তবে?...

এই 'তবে'-টাই সারারাত টুক্‌লাকে ঘুমোতে দিল না।

ঘুমন্ত খুকুর মুখের দিকে তাকিয়ে সারারাত বসে রইল টুক্‌লা। দেখতেও ওর বাবার মত হয়েছে। তেমনি সুন্দর আর দর্পিত তার মুখের গঠন।

নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে খুকু। আর তার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে বসে আছে টুক্‌লা। ঠিক যেমন ক'রে থেকেছে খুকুর ছোটবেলায় কত রাত, কত অসুখে এমনি রুগ্ন খুকুকে কোলে ক'রে বিনিদ্র রাত কাটিয়েছে, তখন কোথায় ছিল তার বাবা? কোথায় ছিল এত পিতৃস্নেহ! আজ সত্যিই হিংসে হ'ল ওর অমিতাভকে। অদ্ভুত ভাগ্য তার, সারাজীবন জিতে গেল সে। সব কিছু পাবার, ভোগ করবার অধিকার নিয়েই জন্মেছিল যেন ও। খুকুর কাছেই শুনেছে ও বাবার চিঠির উত্তর না দেওয়াতে মায়ের কাছে ওকে পাঠাবে কি না তাও দ্বিধা করছিল অমিতাভ। কিন্তু খুকুই নাকি জেদ করেছে; মাকে অন্ততঃ একবার দেখবার জন্য। বারবার একটা প্রশ্ন ওর মুখে এসে গেলেও জিজ্ঞেস করতে পারেনি টুক্‌লা, সবিতার কথা। ওর কাছেই খুকু মানুষ হয়েছে, সুতরাং জানতে পারত সে

সব। কিন্তু দরকার নেই। আজ তার জীবনে অমিতাভ বা সবিতার কোন স্থান নেই। সে সব অতীত, তার কাছে মৃত।

কিন্তু খুকু? এই দিনটির অপেক্ষাতেই তো সে এতদিন বসেছিল। তার খুকু আবার তার কাছে ফিরে আসবে। অথচ কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের এতটুকু মিল হ'ল না। পরিত্যক্ত সে। বাবাকে নিয়ে মেয়ের যে জীবন ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে, সেখানে মায়ের স্থান নেই। টুক্‌লা সেখানে বাহুল্য মাত্র।

রাত নেমে এসেছে। অপূর্ব স্নিগ্ধ রাত। কুয়াশার জাল ঘেরা বাতাসে পূর্ণ চাঁদের আলো পড়ে মায়াময় এক ছবির সৃষ্টি করেছে। জানলার কাছে সরে এসে বাইরে তাকিয়ে রইল টুকলা।

মনে করেছিল ভুলে গেছে, অতীতের কোন কথাই তাকে বুঝি আর নাড়া দিতে পারবে না। কিন্তু যেন শরৎকালের ভোরে শিউলি গাছ নাড়া পেয়ে, সমস্ত রাত ধরে সঞ্চিত তার শিশিরটুকু ঝরিয়ে দিতে চাইল। আজ ঘুমন্ত খুকু তার কাছে অতীতের অনেক দিন সামনে এনে ধরেছে। বহুদিনের তুচ্ছ ঘটনা, অনেক দিনের সুখদুঃখের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। মনে পড়ল কতবার ভেবেছে সে আত্মহত্যা করবে, জীবনের শেষ ক'রে দেবে, কিন্তু জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি, ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা, তাকে সে পাগলাম থেকে বাঁচিয়েছে। আজও তার মাথায় যেন কি হচ্ছে। এলোমেলো সব চিন্তা জট্ পাকিয়ে যাচ্ছে। কোনদিন কি পেয়েছে, কি পায়নি তা নিয়ে হিসেব মেলাতে বসেনি তার মন, কিন্তু আজ জীবন সায়াহ্নে এসে সে বুঝেছে যে, আপনজনের কাছে সে বাহুল্য। তার কোন মূল্য নেই, তার হৃদয়াবেগের, তার সুখ-দুঃখের, তার জীবনের কোন মূল্য নেই এদের কাছে, অথচ এরই জন্য....

আজ যেন তার সব প্রশ্নের উত্তর সে খুঁজে পেয়েছে।

পরদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরই খুকুকে চলে যেতে হ'ল।

মা সাবধানে থেকো। শরীরের যত্ন কোর।

বার বার করে বলতে লাগল খুকু।

হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল টুকলা। নিদারুণ অভিমানে ভেবেছিল অন্ততঃ খুকুর সামনে স্নেহের দাবী নিয়ে চোখের জল ফেলবে না। তার উপেক্ষিত মাতৃত্বের বেদনা সে নীরবে বহন করবে। কিন্তু পারল না, কত শক্ত হয়ে নিজের মনকে বুঝিয়ে নিজেকে ঠিক রেখেছিল সে। কিন্তু কোথা থেকে কি হয়ে গেল। খুকুকে বিদায় দিতে গিয়ে, হয়ত চিরদিনের মতই বিদায় দিতে গিয়ে, খুকুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল সে, এতদিন তো ভুলে ছিল। খুকুর সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে তার অতৃপ্ত মাতৃত্ব নিয়ে কাজের মধ্যে সে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিল। খুকু যেন তার পক্ষে নিষিদ্ধ ফল।

কিন্তু এতদিন বাদে আবার আস্বাদন পেয়ে, তারই দেহজ অতি প্রিয় খুকুকে কাছে পেয়ে মাতৃত্বের রসে [illegible] সে অস্থির হয়ে উঠল। আবেগে তার গলা আটকে আসতে চাইল। তার খুকু, তার নিজের খুকু। সেই ছোট খুকু আজ এতবড় হয়েছে, তাকে সে যেন ছাড়তে পারে না, কিছুতেই না।

অথচ আশ্চর্য শান্ত ভাবেই বিদায় নিল খুকু।

কেঁদ না মা, হঠাৎ মিছিমিছি কাঁদছ কেন?

মিছিমিছি! ভাবল টুকলা। জানে সে তার বাবা তাকে স্বতন্ত্র পরিবেশে মানুষ ক'রে, মা মেয়ের সহজ সম্বন্ধ গড়ে উঠতে বাধা দিয়েছেন, কিন্তু তবু সে তো তারই মেয়ে।

খুকু মা যাসনি।

কি বল মা! কত দেশ দেখব, কত বেড়াব, কত কি শিখব! বাবা বলেছেন কত বড় শিল্পী হতে হবে আমাকে, তা জান?

জানে তা টুক্‌লা, ভাল ভাবেই জানে। খুকুর সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। মায়ের সঙ্গে তার জীবন কতটুকু জড়ান? কারণ যতই থাক, মার কাছ থেকে সে কতটুকু পেয়েছে, জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত বাবাকেই সে জানে, ভালবাসে, তাই আজ বাবার সঙ্গেই, সুখী, তার জীবনের রঙীন কল্পনাতেই সে সুখী, তার সামনে যে নতুন জীবনের দরজা খোলা।

শান্তভাবে বিদায় নিলেও খুকুর মনের আলোড়নের ঢেউ সে বুঝতে পারে। কিন্তু তবু সে কতটুকু। টুক্‌লা মা হলেও আজ খুকুর কাছে হয়ত নিষ্প্রয়োজনীয়।

ওদের গাড়ী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই পথের ওপরেই বসে পড়ল টুক্‌লা। ভেঙ্গে পড়ল অজস্র কান্নায়। ক্লান্ত সে, আর পারে না।

বলিষ্ঠ হাতে কে তাকে তুলে ধরল। অশোক। এখনি এসেছে সে বম্বে থেকে, জরুরী খবর নিয়ে। তিন মাসের জন্য তাকে যেতে হবে বিদেশে, তাছাড়া যে খবর তাকে শান্তি দিয়েছে, হয়তো একটু স্বার্থপরের মতই সে শান্তি পেয়েছে, কিন্তু তার কাছে এর থেকে কাম্য আর কি হ'তে পারে?

মুক্তি দিয়েছে অমিতাভ টুক্‌লাকে, আইনমতেই। সে বুঝে নিয়েছে যে নতুন করে সে জীবনকে আর বাঁধতে পারবে না, ভাঙ্গা আরশি আর তেমনটি জোড়া লাগে না, আর আশ্চর্য অশোককেই সে জানিয়েছে সে কথা এক লম্বা চিঠিতে। হয়ত অমিতাভ আজ সত্যিই সুখী দেখতে চায় টুক্‌লাকে।

বিস্ফারিত চোখে সব শুনল টুক্‌লা। আজ সে মুক্ত, প্রকৃত

অর্থে মুক্ত, অমিতাভ তাকে পরিপূর্ণ মুক্তি দিয়েছে, শেষে দয়াই করেছে টুক্‌লাকে। আর অমিতাভর ওপর কোন অধিকারই নেই. অথচ এটুকুই তো সে চেয়েছিল।

আমাকে কালই যে যেতে হবে।

কাল এত তাড়াতাড়ি ?

যেন মৃতের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল কথাগুলো।

কি করবো আমায় যে যেতেই হবে। তুমি, তুমি···

অশোকের বুকের ভেতরটা তোলপাড় হতে লাগল।

তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি, সে বিদায় যে কি আমার পক্ষে ··

রোরুদ্যমানা টুক্‌লার দু হাত নিজের মুখে চেপে ধরল অশোক। এর বেশী তো সে কোনদিনও টুক্‌লার কাছ থেকে পাবে না। এর বেশী সে আশা করেনি।

আমাকে তোমার সঙ্গে নাও। একা রেখে যেও না।

নিজেকে যেন এতদিন বাদে সম্পূর্ণ সমর্পণ করল টুক্‌লা।

আনন্দ ও আবেগে চোখ দুটি জলে ভরে এল অশোকের। টুক্‌লার মাথাটা বুকে চেপে ধরল। দুহাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল টুক্‌লা পরম নির্ভরতায়।

শালটা দিয়ে টুক্‌লাকে সস্নেহে জড়িয়ে আস্তে আস্তে ঘরের দিকে এগিয়ে চলল তারা।

দীর্ঘ সতের বছর এই দিনটিরই বুঝি প্রতীক্ষা করেছে অশোক।